উপহার

.... কে

উপহার দিলাম।

উপহারদাতাঃ ....

তারিখঃ ....

স্বত্বাধিকারী–

নাম : ....

গ্রাম/মহল্লা : ....

থানা : ....

জেলা : ....

www.maktabatulabrar.com

সতর্কীকরণ

প্রতারণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
"মাকতাবাতুল আবরার"–এর সব গ্রন্থ
যাচাই-বাছাই করে ক্রয় করুন।

নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

রচনা
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
লেখক, আহকামে যিন্দেগী, ফাযায়েলে যিন্দেগী,
ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, ইসলামী মনোবিজ্ঞান,
ফিকহুন নিছা, বয়ান ও খুতবা প্রভৃতি

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪
www.facebook/maktabatulabrar.com
www.maktabatulabrar.com

www.maktabatulabrar.com

নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

রচনা
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১৬ ইংরেজি, যিলকদ ১৪৩৭ হিজরী

সর্বস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার, ঢাকা
ফোন : ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

www.maktabatulabrar.com
maktabatulabrar@gmail.com
www.facebook/maktabatulabrar.com

মূল্য: ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

Nafs o Shaitaner Shathe Mukabela
(Encounter with Nafs & Shaitan)
Written by Maolana Md. Hemayet uddin in bengali
Published by Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু **পৃষ্ঠা নং**

অবতরণিকা.. ১১

প্রথম অধ্যায়

নফ্ছ, শয়তান ও তাদের ওয়াছওয়াছা প্রসঙ্গে প্রাথমিক কিছু কথা
নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা করার গুরুত্ব ১৭
নফ্ছে আম্মারাহ থেকে মুক্ত নয় কেউ ১৮
মনের আবেগ-অনুভূতি যতটুকু বান্দার ইখতিয়ারে ১৮
কলব, নফ্ছ ও রূহ সম্বন্ধে কিছু কথা ২০
ইবলীছ শয়তানের পরিচয় ২৩
আউযু বিল্লাহ ইত্যাদি পড়লে শয়তান কীভাবে ভেগে যায়? ২৫
শয়তানের মনের কথা বোঝে কী করে? ২৭
শয়তান এত ভাষা বোঝে কী করে? ২৯
শয়তান মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কীভাবে কেটে পড়ে? .. ৩২
শয়তানের কমন ওয়াছওয়াছা ও তা থেকে বাঁচার উপায় ৩৪

শয়তানের নিত্য কৌশল

কৌশল নং ১: ভাল কাজকে মন্দ ও মন্দ কাজকে ভাল করে দেখানো .. ৩৭
কৌশল নং ২: আগামীর চক্করে ফেলে দেয়া ৩৯
কৌশল নং ৩: ইল্‌ম থেকে দূরে রাখা ৪১
উলামায়ে কেরাম সম্বন্ধে কিছু লোকের অভিযোগ ৪২
কৌশল নং ৪: রিয়া ও হুব্বে জাহ-এর চেতনা এনে দেয়া ৪৪
রিয়া দূর করার পদ্ধতি ৪৫
হুব্বে জাহ্ (প্রশংসা ও যশ-প্রীতি) দূর করার পদ্ধতি ৪৬
কৌশল নং ৫: ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়া ৪৬
কৌশল নং ৬: পরহেযগারির চেতনা উস্কে দেয়া ৪৭
ওয়াছওয়াছার রোগের ব্যাপারে সাবধান! ৫০
কৌশল নং ৭: ভাল হওয়া সম্ভব নয়- এই ধারণা দেয়া ৫৩
কৌশল নং ৮: অহংকার বা আত্মগর্ব উস্কে দেয়া ৫৬
তাকাব্বুর বা অহংকারের ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার উপায় .. ৫৭

www.maktabatulabrar.com

উজব বা আত্মগর্ব থেকে বাঁচার উপায় ৫৮
কৌশল নং ৯: বারংবার একই বিষয়ে ওয়াছওয়াছা দেয়া ৬০
কৌশল নং ১০: ইবাদত শুরু করলে তাড়াহুড়োর মনোভাব এনে দেয়া .. ৬০
কৌশল নং ১১: যেকোনো মূল্যে ধন-সম্পদ বৃদ্ধির ওয়াছওয়াছা ৬১
শয়তানের কিছু বিরল কৌশল ৬২
বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্টাইলে ধোঁকা প্রদান প্রসঙ্গে ৬৪
বিভিন্ন শ্রেণীর আলেমকে বিভিন্নভাবে ওয়াছওয়াছা
ওয়ায়েজদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ৭০
ইমাম ও খতীবদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ৭৪
পীর সাহেবদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ৭৬
মুসান্নিফ বা লেখকদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ৭৭
"নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা" বইটি
লেখার সময় ওয়াছওয়াছা ৮০
মুদাররিস বা শিক্ষকদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ৮৮
বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে ওয়াছওয়াছা
মুরীদদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ৯৩
ছাত্রদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ৯৭
স্বামীদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ১০০
স্ত্রীদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ১০২
ব্যবসায়ীদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ১০৪
রাজা-বাদশাদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয় ১০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমান-আকীদা বিষয়ক ওয়াছওয়াছা প্রসঙ্গ

আল্লাহ আছেন তার প্রমাণ প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা ১১৩
মানুষ কেন তার ব্রেন দিয়ে আল্লাহকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম নয়? ... ১১৭
তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা ১২৬
একাধিক খোদা থাকলে কী অসুবিধা? ১২৯
ছবি, প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন রকম স্মৃতিস্তম্ভ প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা ১৩০
জান্নাত, জাহান্নাম ও কবর আযাব প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা ১৩৮
জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব আসলেই আছে কি? ১৪০

জান্নাতে এত জায়গা কোথায়? ১৪০

নবী, মুজিযা এবং কাশ্‌ফ ও কারামত প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

নবীর কাছে বাস্তবেই ওহী আসত কি? ১৪১

আধুনিক যুগে নবী আসেন না কেন? ১৪২

নবী রসূলদের মুজেযা কি ভুয়া? ১৪৩

বুযুর্গদের কাশ্‌ফ ও ইলহাম কি ভুয়া? ১৪৪

এখন বুযুর্গদের কারামত দেখা যায় না কেন? ১৪৪

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব নিয়ে ওয়াছওয়াছা ১৪৫

ফেরেশতা দেখার কয়েকটা ঘটনা ১৪৭

জিনদের অস্তিত্ব নিয়ে ওয়াছওয়াছা ১৫১

জিন দেখার কয়েকটা ঘটনা ১৫১

জিন টের পাওয়ার কয়েকটা ঘটনা.. ১৫৫

তাকদীর প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা ১৫৬

দ্বীন-ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ওয়াছাওয়াছা

ইসলাম ধর্ম সঠিক হলে এর অনুসারীদের সংখ্যা বেশি হয় না কেন? .. ১৬০

ধর্ম-কর্ম সঠিক হলে উন্নত মানের লোকেরা কেন ধর্মে আসে না? ১৬১

বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল ১৬২

বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করেন কৈ? ১৬৩

যুদ্ধে সাহায্যের জন্য এখন ফেরেশতারা আসে না কেন? ১৬৪

ধর্মের নামে আলেমরা গরীবদেরকে শোষণ করে ১৬৫

ধর্মের নামে আলেমরা পোপতন্ত্র কায়েম করেছে ১৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত-বন্দেগী বিষয়ক ওয়াছওয়াছা

ইবাদত না করানোর জন্য বিভিন্ন রকম ওয়াছওয়াছা ১৭৩

এখন বয়স্কাল, এখনই কি ইবাদতের সময় হয়েছে? ১৭৩

ধর্ম-কর্ম করতে গেলে জীবনে কোন রোমান্স থাকে না ১৭৪

ধর্ম-কর্ম হল অন্ধ বিশ্বাস ১৭৫

ইবাদতের পদ্ধতি নিয়ে ওয়াছওয়াছা **১৭৫**

একটু ওঠা-বসা করা ইত্যাদি– এর পেছনে কী যুক্তি আছে ১৭৬

রোযায় তথা না খেয়ে থাকা ইবাদত হবে কেন ১৭৭

আল্লাহ কি বায়তুল্লার মধ্যে থাকেন যে, ওখানে ঘুরতে হবে? ১৭৭

হজ্জ তো হচ্ছে একটা মেলা ১৭৮

হজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া হয়, এটাও তো মূর্তি পূজার মতই ... ১৭৯

নামায পাঁচ ওয়াক্ত কেন? ১৮০

মাগরিব, ইশা ও ফজরের কেরাত সশব্দে আর জোহর আসরের কেরাত আস্তে পড়া হয় কেন? ১৮০

ইবাদতের ছওয়াব ও ফায়দা প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা ১৮১

ইবাদতের ইখ্‌লাস সম্বন্ধে ওয়াছওয়াছা ১৮৩

নামাযের মধ্যে শয়তানের সঙ্গে বাহাছ না করা চাই ১৮৫

দুআ বিষয়ক ওয়াছওয়াছা

দুআর মধ্যে কান্নাকাটির বিষয়ে ওয়াছওয়াছা ১৮৫

দুআ কবূল না হওয়ার ওয়াছওয়াছা ১৮৮

বিপদ-আপদ বিষয়ক দুআ দুরূদের ফায়দা নিয়ে ওয়াছওয়াছা ১৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

দাড়ি, টুপি ও ইসলামী লেবাসের ব্যাপারে ওয়াছওয়াছা

দাড়ি রাখলে, টুপি পরলে, ইসলামী লেবাস-পোশাক পরিধান করলে, জীবনের অনেক রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত হতে হয় ১৯৩

দাড়ি রাখা বিবিরা পছন্দ করে না, বিবিদের ভালবাসা পাওয়া যায় না.. ১৯৪

দাড়ি রাখলে, টুপি পরলে, ইসলামী লেবাস-পোশাক পরিধান করলে অনেকে হুজুর বলে টিটকারি দিবে ১৯৪

দাড়ি রাখা তো আর ফরয ওয়াজেব নয়, এটা সুন্নাত, এটাকে এত গুরুত্ব দেয়ার কী দরকার? ১৯৫

এখনও এসব ধর্মকর্ম করার বয়স হয়নি, বয়স হলে এগুলো করবে .. ১৯৬

দাড়ি, টুপি, ইসলামী লেবাস সমাজের বহু লোক পছন্দ করে না ১৯৬

পর্দার ব্যাপারে ওয়াছওয়াছা

পর্দা প্রথা সেকেলে প্রথা, পর্দা ব্যবস্থা সেকেলে ব্যবস্থা, আধুনিক যুগে এটা চলতে পারে না ১৯৭

পর্দা ব্যবস্থা নারী সমাজকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় ১৯৭

পর্দা প্রথা জাতিকে পিছিয়ে দেয়, পর্দা উন্নতির অন্তরায় ১৯৮

www.maktabatulabrar.com

পর্দা মেনে চলতে গেলে যে দম আঁটকে মরে যেতে হবে! ১৯৮
পর্দা করা আসলে খুব কঠিন, পর্দা মেনে চলা সম্ভব নয় ১৯৯
পর্দা মেনে চলতে গেলে জীবনের আনন্দ-ফূর্তি সব শেষ হয়ে যাবে .. ১৯৯
পর্দা মেনে চলতে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় ১৯৯
পর্দা করলে লাভ কী? ১৯৯
পর্দা হল মনের ব্যাপার; মন ঠিক থাকলে সব ঠিক ২০১
পর্দার বিষয়টাকে আমাদের হুজুররাই বেশি কড়া করে ফেলেছে ২০১

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক-চরিত্র বিষয়ে ওয়াছওয়াছা

বদ নজর ও যেনা প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা ২০৫
যেনার ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের পন্থা ২০৭
বদ নজরের ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের পন্থা ২০৮
অবৈধ প্রেম করার ওয়াছওয়াছা ২০৯
হস্তমৈথুন করার ওয়াছওয়াছা ২১০
নেশার ওয়াছওয়াছা ২১১
নেশার ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের পন্থা ২১২
প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে ওয়াছওয়াছা ২১৩
রাগ দমনের পন্থাসমূহ ২১৫
মানুষের সাহায্য বা উপকারে এগিয়ে না যাওয়ার ওয়াছওয়াছা ২১৫
আখলাক-চরিত্র বিষয়ক আরও বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াছওয়াছা ২১৭
বুখ্ল বা কৃপণতার ওয়াছওয়াছা ২১৭
এশ্রাফে নফ্ছের ওয়াছওয়াছা ২১৮
বুগ্য (বিদ্বেষ/মনোমালিন্য) ও স্বভাব সংকোচনের ওয়াছওয়াছা ২১৮
হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা)-এর ওয়াছওয়াছা ২১৯
বদগোমানী বা কু-ধারণার ওয়াছওয়াছা ২২০
অপব্যয়ের ওয়াছওয়াছা ২২১
অমিতব্যয়ের ওয়াছওয়াছা ২২১
গীবত (অপরের দোষ চর্চা)-এর ওয়াছওয়াছা ২২২
চোগলখোরী (কোটনাগিরি)-এর ওয়াছওয়াছা ২২৪
তোষামোদ বা চাটুকারিতার ওয়াছওয়াছা ২২৪

রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার ওয়াছওয়াছা ২২৫
রুক্ষ কথা বলার ওয়াছওয়াছা ২২৬
মিথ্যা বলার ওয়াছওয়াছা ২২৭
বেশি কথা বলার ওয়াছওয়াছা ২২৭
গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলার ওয়াছওয়াছা ২২৮

পরিশিষ্ট

(ইবলীছ শয়তান ও তার বিশেষ কিছু প্রসঙ্গ)

স্বয়ং নিজের ব্যাপারে ইবলীছের ইবলীছী ২২৯
শয়তানের প্রশ্ন: আসলে ইবলীছ শয়তান বলে কেউ আছে কি? .. ২২৯
মানুষের সঙ্গে ইবলীছের সাক্ষাতের কয়েকটা ঘটনা ২৩১
শয়তানের প্রশ্ন: শয়তানকে বানানো হল কেন? ২৩৫
ইবলীছের কী দোষ আল্লাহই তো তাকে এমন বানিয়েছেন ... ২৩৬
ইবলীছ কি ভাল হতে পারে না? ২৩৭
মানুষের চাটুকারিতা করতে ইবলীছের অহংকারে লাগে না? ২৩৮
ইবলীছের সিংহাসন সাগরে কেন? ২৩৯

www.maktabatulabrar.com

অবতরণিকা

মানুষের কৃলব তথা মন/অন্তর/হৃদয় অনেক কথা বলে। কৃলব বা মনে জাগ্রত হয় অনেক ধরনের চিন্তা- ভাবনা। সেসব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ভাল-মন্দ সব ধরনের চিন্তা- ভাবনার সমাবেশ থাকে। ভাল চিন্তার পাশাপাশি জাগ্রত হয় মন্দ চিন্তা, আবার মন্দ চিন্তার পাশাপাশি জাগ্রত হয় ভাল চিন্তা। ভাল আর মন্দ– এ দুটোর মধ্যে বাঁধে সংঘর্ষ বা মোকাবেলা অর্থাৎ, বাহাছ-বিতর্ক। সেই মোকাবেলা তথা বাহাছ-বিতর্কে কখনও ভাল চিন্তার পক্ষ বিজয়ী হয় আবার কখনও বিজয়ী হয় মন্দ চিন্তার পক্ষ। যে পক্ষ তথা যে চিন্তা বিজয়ী হয় শেষ তক মানুষ সে চিন্তা অনুসারেই সংশ্লিষ্ট কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হয়। এই ধরুন মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করার মত একটা ভাল চিন্তা মনে জাগ্রত হল, অমনি না যাওয়ার চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল। দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হল যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে বাহাছ-বিতর্ক ও দলীল-প্রমাণ পেশ করার পালা। দু'পক্ষের তরফ থেকেই পেশ হতে থাকল যুক্তি-তর্ক ও দলীল-প্রমাণ। এক পক্ষ মসজিদে যাওয়ার গুরুত্ব, ফযীলত ইত্যাদি উপস্থাপন করে মসজিদে যাওয়ার অনুকূলে দলীল দাঁড় করাতে থাকল, অপর পক্ষ যাওয়ার প্রতিকূলে অর্থাৎ না যাওয়ার পক্ষে নানা রকম ওজর-আপত্তি ও অসুবিধার দিকগুলো তুলে ধরে মসজিদে না গিয়ে ঘরেই নামায সেরে নেওয়ার জন্য দলীল দাঁড় করাতে সচেষ্ট হল। অবশেষে এ বাহাছ-বিতর্কে তথা এই মোকাবেলায় যে পক্ষ বিজয়ী হল, সে অনুযায়ীই মসজিদে যাওয়া বা না যাওয়ার কর্মটি সম্পাদিত হল। মসজিদে যাওয়ার অনুকূল পক্ষ বিজয়ী হলে মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা হয়ে উঠল, আর না যাওয়ার পক্ষ বিজয়ী হলে মসজিদে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। এরূপ বাহাছ-বিতর্ক বা মোকাবেলা শুধু নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া বা না যাওয়ার এ একটা বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের ঈমানী চিন্তা-চেতনা থেকে শুরু

www.maktabatulabrar.com

করে প্রত্যেকটি আমল এবং প্রত্যেকটা ভাল বা মন্দ চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেই মনের মধ্যে চলে থাকে এরূপ বাহাছ-বিতর্ক তথা মোকাবেলার পালা। নফ্‌ছের সঙ্গে বাহাছ-মোকাবেলা চলে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্ত। আমরা ভেবেও দেখি না প্রতিদিন কতবার কতভাবে মনের মধ্যে চলে থাকে এরূপ বাহাছ-বিতর্ক এবং কতবার কোন্ পক্ষ হয় বিজয়ী কিংবা পরাজিত।

মনের মধ্যে চলমান এরূপ বাহাছ ও মোকাবেলার মধ্যে নেতিবাচক পক্ষ নিয়ে থাকে নফ্‌ছে আম্মারাহ তথা কু-প্রবৃত্তি। আর নফ্‌ছে আম্মারাহ বা কু-প্রবৃত্তির সহযোগী হল শয়তান। শয়তানের পক্ষ থেকে সে পায় সমর্থন ও মদদ। আর ইতিবাচক পক্ষ নেয় ফিতরতে সালীমা তথা সু-স্বভাব বা সু-প্রবৃত্তি। আর ফিতরতে সালীমা বা সু-স্বভাবের সহযোগী হল ফেরেশতা। ফেরেশতার পক্ষ থেকে সে পায় সমর্থন ও মদদ। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে রয়েছে এরূপ সমর্থনকারী ও মদদকারী শয়তান ও ফেরেশতা। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ». (رواه أحمد برقم ٣٦٤٨ ومسلم برقم ٢٨١٤ واللفظ لأحمد)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে নিযুক্ত রাখা হয়েছে তার সহযোগী জিন (তথা শয়তান) ও সহযোগী ফেরেশতা। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

যখনই মনের মধ্যকার আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, অনুমান ও সংবেদন ইত্যাদির কোনটা চিন্তা ও ইচ্ছায় রূপ নিয়ে কোন দিকে অগ্রসর হতে চায় এবং মনরূপ ইঞ্জিন তার গাড়ি নিয়ে তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার মনস্থ করে, তখনই ফিতরতে সালীমা ও নফ্‌ছ– এই দুই ড্রাইভারের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় কে তখন গাড়িকে চালিয়ে নিবে। শুরু

হয় দুই ড্রাইভারের মধ্যে যুক্তি-তর্ক ও দলীল-প্রমাণ দিয়ে চালকের আসনে সমাসীন হওয়ার মত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার মোকাবেলা তথা বাহাছ বা বিতর্ক-প্রতিযোগিতা। যে ড্রাইভার সেই যুক্তি-তর্ক ও দলীল-প্রমাণে তথা সেই বাহাছে বিজয়ী হয়, সে-ই তখন এই গাড়ির ড্রাইভারের আসনে সমাসীন হয় এবং গাড়িকে নিয়ে চলে তার পছন্দের গন্তব্যের দিকে। আর জড়দেহ সেই ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অনুসরণ করে চলে। তাই ভাল চিন্তা-চেতনাকে চূড়ান্ত ইতিবাচক গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে শয়তান বা নফ্‌ছে আম্মারার সঙ্গে মোকাবেলা করে করে ফিতরতে সালীমা তথা সু-স্বভাবকে বিজয়ী হতে হয় প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্ত। সে জন্য জানতে হয় নফ্‌ছে আম্মারার সঙ্গে মোকাবেলা করার পদ্ধতি অর্থাৎ, নফ্‌ছে আম্মারাকে বাহাছে পরাস্ত করার মত যুক্তি-তর্ক ও কৌশলাদি। "নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা" শিরোনামে এরূপ প্রতীকী বাহাছসমূহের বিবরণ ও তাতে বিজয়ী হওয়ার মত কৌশলাদি নিয়েই আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এটাই হল নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা।

তীর তলোয়ার দিয়ে নফ্‌ছ ও শয়তানের সঙ্গে মোকাবেলা হয় না, গোলা বারুদ ও বন্দুক কামান দিয়েও না। নফ্‌ছ ও শয়তানের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয় বাহাছ করে অর্থাৎ, নফ্‌ছ ও শয়তানের উপস্থাপিত যুক্তিকে খণ্ডন করে এবং তার বিপরীত যুক্তিকে প্রবল করে দেখিয়ে।

এ পুস্তকে নফ্‌ছ ও শয়তানের উপস্থাপিত যুক্তিকে খণ্ডন এবং তার বিপরীত যুক্তিকে প্রবল করে দেখানোর মত তথ্য, উপাত্ত ও কৌশলাদি সন্নিবেশিত করার চেষ্টা গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা করে বিজয়ী হওয়ার তাওফীক দান করুন। মনের মধ্যে নেক কাজের প্রতিকূলে আর পাপ কাজের অনুকূলে জেগে ওঠা সমুদয় ওয়াছওয়াছা মোকাবেলা করে দ্বীনের সঠিক অবস্থানে টিকে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.maktabatulabrar.com

"নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা"– এ শিরোনামে অদ্যাবধি কেউ কিছু লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে এর কাছাকাছি শিরোনামে অনেকের অনেক লেখা রয়েছে। সুফিয়ায়ে কেরামের লেখায়ও এ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত এসেছে পর্যাপ্ত। নফ্‌ছের বিভিন্ন মন্দ চিন্তা ও নেতিবাচক ইচ্ছাকে প্রতিহত করার কৌশলাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দিক-নির্দেশনা পেশ করেছেন তাঁরা। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুফিয়ায়ে কেরাম প্রদত্ত সেসব দিক-নির্দেশনা, বিভিন্ন মনীষীর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও আমার নিজের কিঞ্চিত বাস্তব চিন্তা-ভাবনার বর্ণনাকে ভিত্তি বানিয়ে তার উপর দাঁড় করানো হয়েছে "নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা" শীর্ষক এ লেখা। আলোচনা তাত্ত্বিকভংগিতে নয় বরং গল্পের ভংগিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠকবর্গ গল্পের আমেজে আত্মিক বিষয়াদির তাত্ত্বিক জটিলতাকে উত্তরণ করতে সক্ষম হন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
১৪/১/২০১০

প্রথম অধ্যায়

নফছ, শয়তান ও তাদের ওয়াছওয়াছা প্রসঙ্গে প্রাথমিক কিছু কথা

www.maktabatulabrar.com

প্রথম অধ্যায়

নফছ, শয়তান ও তাদের ওয়াছওয়াছা প্রসঙ্গে প্রাথমিক কিছু কথা

নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা করার গুরুত্ব

নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, মনের মধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল চিন্তাই মানুষকে খারাপ পথে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে ভাল চিন্তা-চেতনাই ভাল পথে অগ্রসর করে। একজন মানুষ হঠাৎই খারাপ হয়ে যায় না। প্রথমে তার মধ্যে খারাপ চিন্তা-চেতনার উদয় ঘটে। সে যখন সেই খারাপ চিন্তা-চেতনাকে প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়, তখন অবলীলায় সেই খারাপ চিন্তা-চেতনার পথে অগ্রসর হয়। এভাবে সে খারাপ হয়ে যায়। যেমন- একজনের মনে যেনা করার চিন্তা উদয় হল, বা গান শোনার চিন্তা উদয় হল, কিংবা মদ গাঁজা খাওয়ার বা অন্য কোনো নেশা গ্রহণের চিন্তা উদয় হল। এখন সে যদি এই চিন্তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে এসব পাপের দিকেই অগ্রসর হয়ে খারাপ হয়ে যাবে। আর যদি এসব চিন্তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। তাই মনের চিন্তার বিষয়কে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। খারাপ চিন্তাকে শনাক্ত করে সেটাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে যত্নবান না হলে খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

www.maktabatulabrar.com

কেউ নফ্ছে আম্মারাহ ও নফ্ছে আম্মারার মন্দ উস্কানী থেকে মুক্ত নয়। তদুপরি নফ্ছে আম্মারার সহযোগী শয়তানও রয়েছে প্রত্যেকের সঙ্গে। ভাল-মন্দ-এর বিবেচনা বাদ দিয়ে অবলিলায় জীবন চালাতে চায় যারা, তাদের কথা ভিন্ন। তারা কোন্ চিন্তার পরিণতি কী হবে তা গুরুত্বের সঙ্গে না নিলে সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু যে মুমিনের ব্রত থাকবে মন্দ চিন্তাকে প্রতিহত করে ভাল চিন্তাকে বিজয়ী করা এবং তদনুযায়ী ভাল চিন্তা-চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও ভাল কর্ম সম্পাদন করা, তাকে অবশ্যই বিষয়টাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। এ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

নফ্ছে আম্মারাহ থেকে মুক্ত নয় কেউ

মনে রাখতে হবে, খারাপ চিন্তা উদয় হওয়া থেকে কেউ নিরাপদ নয়। কারণ, নফ্ছে আম্মারাহ থেকে মুক্ত নয় কেউ। নফ্ছে আম্মারার পক্ষ থেকে খারাপ চিন্তা উদয় করে দিয়ে ক্ষতির দিকে ধাবিত করার আশংকা থেকে মুক্ত নয় কেউ। এমনকি কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে জলীলুল কদর নবী হযরত ইফছুফ (আ.)-এর একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে-

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوٓءِ.﴾

অর্থাৎ, আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় নফ্ছ মন্দ বিষয়ের নির্দেশ দেয়। (সূরা ইফছুফ: ৫৩)

নবীর বেলায় যখন বিষয়টা এমন, অন্যদের বেলায় তো অবশ্যই তেমনি। তাই কেউ যতই কামেল হোক না কেন নফ্ছে আম্মারার ওয়াছওয়াছা থেকে কখনই মুক্ত হতে পারবে না। নফ্ছে আম্মারাহ ও তার সহযোগী শয়তানের সঙ্গে মোকাবেলা করার পর্যায় থেকে কেউ কখনই অব্যাহতি লাভ করতে পারবে না। অতএব নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া সকল স্তরের সকলের জন্য জরুরি পর্যায়ের বিষয়।

মনের আবেগ-অনুভূতি যতটুকু বান্দার ইখতিয়ারে

মনের মধ্যে কখন কোন্ ধরনের আবেগ-অনুভূতি প্রবেশ করবে, কখন মনের পর্দায় কোন আবেগ-অনুভূতি আবির্ভূত হবে, মন কখন কী বলে উঠবে, কোন্ চিন্তা-ভাবনা কখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, তা কারও

ইখতিয়ারী বিষয় নয়। এ বিষয়টা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ اٰدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– « اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ».

অর্থাৎ, “বনী আদমের কৃলবসমূহ আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে একটি কৃলবের ন্যায় (তথা সম্পূর্ণই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে), যেভাবে তিনি চান সেভাবে তাকে ঘুরান। এ কথা বর্ণনা করার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করলেন, হে কৃলবসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের কৃলবসমূহ তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও। (মুসলিম)

এ হাদীছে সম্ভবত চিন্তা-চেতনার যে স্তর মানুষের ইখতিয়ার বহির্ভূত, সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। তবে চিন্তার একটা স্তর বান্দার ইখতিয়ারের আওতাভুক্ত। সেটা হল কোন চিন্তাকে বারবার মনের মধ্যে রোমন্থন করা এবং চিন্তাকে সংকল্পের স্তরে পৌছানোর তৎপরতা। চিন্তাকে রোমন্থন করার মধ্যেও বান্দার ইখতিয়ার থাকে, আবার সংকল্পের স্তরে পৌছানোর মধ্যেও বান্দার ইখতিয়ার থাকে। এজন্য কোনো পাপ কাজের সংকল্প করলে এবং সংকল্পজাত পদক্ষেপ শুরু করলে তার জন্য বান্দা পাপী হয়। কেননা, এটা তার ইখতিয়ারে ঘটে থাকে। অতএব মনে কোনো খারাপ আবেগ- অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে, মনের মধ্যে কোনো খারাপ ইচ্ছা জাগ্রত হলে সেটা যেন সংকল্পে রূপ নিতে না পারে সেজন্য মনের জবান দিয়ে তার বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে হবে, সেই খারাপটার অনুকূলে নফ্ছ ও শয়তান বক্তব্য রাখলে নফ্ছ ও শয়তানের সঙ্গে বাহাছ করতে হবে, নফ্ছ ও শয়তানের পেশ করা দলীল-প্রমাণ ও যুক্তিকে খণ্ডন করতে হবে, নফ্ছ ও শয়তানের সঙ্গে চালাতে হবে মোকাবেলা। “নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা” শীর্ষক এ পুস্তকে এমন সব বাহাছের কথাই তুলে ধরা হবে। এসব বাহাছে বিজয়ী হতে পারলেই হবে নফ্ছের সঙ্গে মোকাবেলায় বিজয়। এটাই হল নফ্ছের সঙ্গে জেহাদ। নফছের সঙ্গে জেহাদই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জেহাদ।

www.maktabatulabrar.com

তবে মনে রাখতে হবে যে, নফ্ছ ও শয়তানের সঙ্গে এই বাহাছে বিজয়ী হওয়ার জন্য শুধু নফ্ছ ও শয়তানের প্রতারণা-কৌশল ও তা মোকাবেলা করার মত যুক্তি-তর্ক ও পদ্ধতি জানাই যথেষ্ট নয়, আল্লাহ তাআলার রহমতেরও একান্ত প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করেই অঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়া বৈ গত্যন্তর নেই। আমরা শুধু এ বিষয়েই নয়, সর্ববিষয়ে সদা আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করি। আমীন!

কৃলব, নফ্ছ ও রূহ সম্বন্ধে কিছু কথা

কৃলব শব্দের এক অর্থ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। এর আর এক অর্থ হচ্ছে মন/অন্তর/হৃদয়। এই অর্থে কৃলব হল সব রকম ভাবনা-চেতনার আকর। মনের মধ্যে আছে একটি স্মৃতি ভাণ্ডার। সেই স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চারিত হয় ও সঞ্চিত থাকে সব রকমের আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, অনুমান, সংবেদন ইত্যাদি। এই আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, অনুমান ও সংবেদন ইত্যাদির কোনোটি যখন চিন্তা ও ইচ্ছায় রূপ নিয়ে কোন লক্ষ্যে অগ্রসর হতে চায়, তখন মন তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এ হিসাবে মনকে তুলনা করা যায় একটা ইঞ্জিনের সঙ্গে। আর ঐ চিন্তা বা ইচ্ছাকে তুলনা করা যায় একজন আরোহীর সঙ্গে। আমাদের জড়দেহ হল সেই গাড়ির বডি সমতুল্য। আর রূহ তথা আত্মা/প্রাণ হল ইঞ্জিনের শক্তি সমতুল্য। আত্মার শক্তিতে মনরূপ ইঞ্জিন তার গাড়ির বডি তথা এই জড়দেহ নিয়ে অগ্রসর হয় গন্তব্যের দিকে। অবশ্য এই জড়দেহ ছাড়াও রূহ (আত্মা/প্রাণ) ও কৃলবের আরও একটা অজড় দেহ রয়েছে, যাকে বলে “জিস্‌মে মিছালী” তথা প্রতীকী দেহ বা রূপক দেহ। নিদ্রাবস্থায় এই জিস্‌মে মিছালী নিয়েই আত্মা ও কৃলব বিচরণ করে থাকে। উল্লেখ্য, নিদ্রার সময় পরমাত্মা[১] বিচরণে বের হয়। জীবাত্মা[২] তখনও জড়দেহে বিদ্যমান থাকে, ফলে জড়দেহ বেঁচে থাকে।

১। এখানে “পরমাত্মা” বলে বোঝানো হয়েছে আত্মার যে অংশটুকুর ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনা সক্রিয় থাকে। ঘুমের সময় মানুষের দেহের অভ্যন্তরে এই পরমাত্মা থাকে না বলেই তখন চিন্তা-চেতনা সক্রীয় থাকে না।

২। জীবাত্মা” বলে বোঝানো হয়েছে আত্মার যে অংশটুকুর ফলে মানুষ বেঁচে থাকে। ঘুমের সময় দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মা থাকে বলে মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু পরমাত্মা না থাকায় চিন্তা-চেতনা সক্রীয় থাকে না।

ক্বলব তথা ইঞ্জিন যেদিকে চলে, জড়দেহরূপ গাড়ির বডিও সেদিকেই চলে। রূহ, ক্বলব ও জড়দেহ– এই তিনটি মিলেই হল একটি গাড়ি। এই গাড়ির ড্রাইভার হয়ে থাকে ফিতরতে সালীমা (সুস্থ স্বভাব বা সু-প্রবৃত্তি) কিংবা নফ্‌ছ (কু-প্রবৃত্তি)। "ফিতরতে সালীমা" হল মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত জন্মগত একটি সুস্থ স্বভাব, যা মানুষকে ইতিবাচক পথের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّذِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বভাব-প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এই সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।[১] এটাই সঠিক দ্বীন। (সূরা রূম: ৩০)

এ আয়াতে "ফিতরত" বলে এই ফিতরতে সালীমা তথা সুস্থ স্বভাবকেই বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে দ্বীনসম্মত ইতিবাচক পথের দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে এ স্বভাব প্রদত্ত হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيْهَا جَدْعَاءَ.» (رواه البخاري برقم ١٣٨٥)

অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান ফিতরতে সালীমার উপর জন্মগহণ করে, তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী বানায় বা নাসারা (খৃষ্টান) বানায় কিংবা মাজূসী (অগ্নিপূজক) বানায়। যেমন একটা অবলা প্রাণী একটি সুস্থ বাচ্চা জন্ম দেয়, তারপর তোমরা সেই বাচ্চাদের মধ্যে নাক-কান কর্তিত কোনো শাবক দেখতে পাও কি? (বোখারী)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে যে স্বভাব প্রদত্ত হয় তা তাকে ইতিবাচক পথের দিক-নির্দেশনা দেয়, নেতিবাচক পথের দিক-নির্দেশনা দেয় না। বরং পরবর্তীতে পরিবেশ ও

১। মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় বিভ্রান্ত হলেও মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত জন্মগত যে সুস্থ স্বভাব তা কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় না। এরই ফলে চরম বিভ্রান্ত লোকও যেকোনো সময় ভাল হয়ে উঠতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তার মধ্যে নেতিবাচক চিন্তা-চেতনার উদ্রেক হয়। যেমন– একটি প্রাণীর বাচ্চা জন্মগতভাবেই নাক/কান কর্তিত অবস্থায় জন্মায় না, পরবর্তীতে মানুষ তার নাক/কান কেটে খুঁতযুক্ত করে দেয়। এভাবে মানুষ ফিতরতে সালীমা নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পরও পরবর্তীতে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তার মধ্যে খুঁত দেখা দেয় অর্থাৎ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তার মধ্যে নেতিবাচ্যতা দেখা দেয়। সারকথা– মানুষের মধ্যে জন্মগত যে সুস্থ স্বভাব সেটিই হল ফিতরতে সালীমা। পক্ষান্তরে নফ্‌ছ বা প্রবৃত্তি হল মানুষের মধ্যে রাখা এমন একটা শক্তি যাতে ভাল ও মন্দ উভয় বৃত্তি থাকে। উভয় রকম প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতাই আল্লাহ তার মধ্যে রেখেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.﴾

অর্থাৎ, শপথ (মানুষের) নফ্‌ছের এবং যিনি তাকে (সবদিক থেকে) সুসমঞ্জস করেছেন তার। অতঃপর তিনি তার (নফ্‌ছের) মধ্যে ভাল ও মন্দের বৃত্তি দিয়ে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি নফ্‌ছকে পবিত্র করে সে নিশ্চিত সফলকাম হয় আর যে তাকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (সূরা আশ-শাম্‌ছ: ৭–১০)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, নফ্‌ছের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয় রকম প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতা রাখা হয়েছে। যখন নফ্‌ছ শয়তানের কু-মন্ত্রণা কিংবা পারিপার্শ্বিকতার কু-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং নেতিবাচক দিকটা তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে আখ্যায়িত হয় নফ্‌ছে আম্মারাহ বা কু-প্রবৃত্তি বলে। আবার ক্রমাগত নফ্‌ছের কথা অমান্য করতে থাকলে, মন্দটাকে বারবার তার সামনে মন্দ হিসাবে তুলে ধরতে থাকলে এবং অব্যাহত সু-দিক-নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রাখলে নফ্‌ছও মন্দটাকে মন্দ বলতে শেখে এবং মন্দের পক্ষে উস্কানী বন্ধ করে দেয়। এ পর্যায়ে উপনীত হলে তখন নফ্‌ছকে বলা হয় "নফ্‌ছে লাওয়ামাহ" তথা মন্দকে তিরস্কার জানানো প্রবৃত্তি। তারপর এ অবস্থা আরও অব্যাহত থাকলে এক পর্যায়ে নফ্‌ছের পক্ষ থেকে এতমীনান হওয়া যায় যে, সে আর

মন্দের উস্কানী দিবে না। নফ্ছ এ পর্যায়ে উপনীত হলে তাকে বলা হয় "নফ্ছে মুত্মায়িন্না" অর্থাৎ, এমন নফ্ছ যার ব্যাপারে এতমীনান হওয়া যায় এবং যার থেকে আশংকা মুক্ত থাকা যায়। তবে স্বভাবগতভাবে নফ্ছের মধ্যে কু-প্রভাব গ্রহণের বৃত্তি প্রবল থাকায় এবং শুরু থেকেই শয়তান কর্তৃক তাকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা জোরদার হওয়ায় নফ্ছ নফ্ছে আম্মারাহ তথা মন্দের উস্কানীদাতাই হয়ে থাকে। তাই সাধারণভাবে নফ্ছ বলতে নফ্ছে আম্মারাহ তথা কু-প্রবৃত্তিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। যাহোক বলা হচ্ছিল, মনরূপ ইঞ্জিনের (গাড়ির) ড্রাইভার হয়ে থাকে এই ফিতরতে সালীমা কিংবা নফ্ছ তথা কু-প্রবৃত্তি।

ইবলীছ শয়তানের পরিচয়

"ইবলীছ" হচ্ছে শয়তানের উপাধী। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মোতাবেক তার নাম ছিল আযাযীল।[১] ইবলীছ শব্দের অর্থ হতাশ। শয়তান হযরত আদম (আ.)কে সাজদা করার খোদায়ী নির্দেশ অমান্য করার ফলে যখন খোদার পক্ষ থেকে সে চির অভিশপ্ত ঘোষিত হয় এবং সে আল্লাহর রহমত পাওয়া থেকে হতাশ হয়ে পড়ে, তখন থেকে তার উপাধী হয়ে দাঁড়ায় ইবলীছ। আর "শয়তান" শব্দের অর্থ হচ্ছে দূরবর্তী তথা রহমত থেকে দূরবর্তী, রহমত থেকে বিতাড়িত। যে কারণে সে ইবলীছ তথা আল্লাহর রহমত পাওয়া থেকে হতাশ, একই কারণে সে শয়তান তথা আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত। তাফসীরে রূহুল মাআনীর একটা বর্ণনা মোতাবেক জিনদের মধ্যে যারা কাফের তারা সকলেই শয়তান বলে আখ্যায়িত হয়।

শয়তান মূলত জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বলেছেন, সে মূলত ছিল ফেরেশতা। এ কথা ঠিক নয় চারটা কারণে। যথা:

এক. শয়তান যে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত তা কুরআনে কারীমে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ.﴾

অর্থাৎ, সে হচ্ছে জিনদের অন্তর্ভুক্ত। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালনে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল। (সূরা কাহ্ফ: ৫০)

১। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল হারেছ। (রূহুল মাআনী)

www.maktabatulabrar.com

দুই. ফেরেশতাদের সন্তানাদি নেই, পক্ষান্তরে ইবলীছ শয়তানের সন্তানাদি আছে। এ মর্মে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতাংশের পরে উক্ত আয়াতেই ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা কি আমাকে ছেড়ে তাকে (শয়তানকে) ও তার আওলাদকে বন্ধু বানাতে চাও, অথচ তারা তোমাদের শত্রু?

তিন. ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমানী করে না, পক্ষান্তরে ইবলীছ আল্লাহর নাফরমানী করেছে এবং এখনও করে চলেছে। ফেরেশতাদের সম্বন্ধে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে যে ব্যাপারে নির্দেশ দেন তারা আল্লাহর নাফরমানী করে না। বরং যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় তারা তা করে। (সূরা তাহরীম: ৬)

চার. ফেরেশতারা নূরের তৈরি অথচ শয়তান আগুনের তৈরি। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) কে সাজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয়তান যা বলেছিল –যা কুরআনে এসেছে– লক্ষ করুন,

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন আমি তোমাকে সাজদা করার নির্দেশ দিলাম, তুমি কেন সাজদা করলে না? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাকে তৈরি করেছ আগুন দিয়ে আর তাকে (আদমকে) তৈরি করেছ মাটি দিয়ে। (অতএব আগুনের স্বভাব যেহেতু উপরের দিকে যাওয়া তাই আমি নিচের দিকে ঝুকে সাজদা করতে পারি না।) (সূরা আ'রাফ: ১২)

যাহোক এসব দলীলের ভিত্তিতে স্পষ্ট যে, শয়তান ফেরেশতা নয় বরং সে হচ্ছে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত।

"আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব"–এর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন, হযরত আদম (আ.) যেমন মানব জাতির মূল, তেমনি ইবলীছ হচ্ছে জিন জাতির মূল। "আল-বাহরুল মাদীদ"সহ

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই এই জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা পৃথিবীতে বসবাস করত। "আকামুল মারজান ফী আজাইবি ওয়া গরাইবিল জান" গ্রন্থের এক বর্ণনা অনুসারে পৃথিবীতে তারা দুই হাজার বছর বসবাস করে। ইতিমধ্যে তারা পৃথিবীতে ব্যাপক ফিতনা-ফাসাদ ঘটাতে শুরু করলে তাদেরকে ধ্বংশ করার জন্য ফেরেশতাদের পাঠানো হয়। তখন প্রচুর জিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভেগে গিয়ে নির্জন পাহাড়-পর্বতে আত্মগোপন করে। ইবলীছ বন্দী হয়ে আসমানে নীত হয়। সে আত্মসমর্পন করে এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়। এভাবে ফেরেশতাদের সঙ্গে তার সহ অবস্থান চলতে থাকে। পরে হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর তাকে সাজদা করার নির্দেশ দিলে ইবলীছ তা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাকে সাজদা করার নির্দেশ দিলাম কিসে তোমাকে সাজদা থেকে বিরত রাখল? সে জওয়াব দিল, আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। (অতএব আগুনের স্বভাব যেহেতু উপরের দিকে যাওয়া, তাই আমি নিচ হয়ে সাজদা করতে পারব না।) এভাবে অহংকারের কারণে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা থেকে সে বিরত থাকে। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি অভিশপ্ত। কেয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর অভিশাপ। তখন ইবলীছ আবেদন করল, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও (অর্থাৎ, হায়াত দাও) আল্লাহ তাআলা বললেন, যাও তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। সে বলল, যেহেতু এই আদমের কারণে আমি অভিশপ্ত হলাম, তাই বনী আদমকে আমি দেখে ছাড়ব, বনী আদমকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমি অবশ্যই তাদের পিছে লেগে থাকব। তাদের সামনের দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে– চতুর্দিক থেকে তাদের উপর হামলা চালাব (ওয়াছওয়াছা দিব)। তখন থেকেই শুরু হল আদম ও বনী আদমের বিরুদ্ধে শয়তানের ওয়াছওয়াছা চালানোর যাত্রা।

আউযু বিল্লাহ ইত্যাদি পড়লে শয়তান কীভাবে ভেগে যায়?

শয়তান বনী আদমকে ওয়াছওয়াছা দিয়ে বিভ্রান্ত করার জন্য স্থায়ী মিশনে নেমেছে। আল্লাহ তাআলা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.maktabatulabrar.com

সাল্লামও শয়তানকে তাড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। নির্ভরযোগ্য হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থায় শয়তান ভেগে যায়। "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম" পড়লে শয়তান ভেগে যায়। "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়লে ভেগে যায়। আযান দিলেও ভেগে যায়, ইকামত হলেও ভেগে যায়। কীভাবে ভেগে যায় তার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ.» (رواه البخاري برقم ٦٠٨ ومسلم برقم ٣٨٩ واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পায়ু পথে বায়ু নির্গমন করতে করতে (পাদতে পাদতে) পেছনে সরে যায়। যাতে আযান শুনতে না পায়। (বোখারী ও মুসলিম)

এখানে "পাদতে পাদতে পেছনে সরে যায়" কথাটির ব্যাখ্যায় কোন কোন মুহাদ্দিছ রূপক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, এর অর্থ হল আযানের শব্দ শোনা থেকে মনোযোগ হটিয়ে নেয়। যেমন বায়ু নির্গমনের শব্দ হলে অন্য শব্দ শোনা যায় না, অন্য শব্দ শোনা থেকে মনোযোগ হটে যায় তদ্রূপ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল আযানের শব্দের প্রতি সে অবহেলা প্রদর্শন করে। কিন্তু "পাদ" কথাটিকে এখানে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করাতে কোন বাধা নেই। কেননা, শয়তান পানাহার করে থাকে তা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। অতএব শয়তানের পানাহার যখন প্রমাণিত, তখন তার পাদ থাকাটাও স্বাভাবিক। আর কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ যদি স্বাভাবিক হয় –অসম্ভব বা পরিত্যাক্ত না হয়– কিংবা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করে রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে এমন কোন লক্ষণও না থাকে, তাহলে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করাই রীতিসিদ্ধ। তদুপরি মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে حُصَاص (হুসাস) শব্দ বর্ণিত হয়েছে। এ শব্দের অর্থগুলোর মধ্যে "দ্রুত ভেগে যাওয়া" অর্থও রয়েছে, যা "পাদতে পাদতে পেছনে সরে যাওয়া" কথাটার প্রকৃত অর্থ গ্রহণের পক্ষে বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এজন্যই মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এখানে প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করেছেন। সেমতে মনের চোখ দিয়েই দেখতে হবে শয়তান কীভাবে ভেগে যায়।

আমি সেরকম একটু দেখতে চাইলে আমার মনে হয় তার ভেগে যাওয়ার উপমা হল এক সময়কার সদরঘাট থেকে পোস্তগোলা ও নারায়ণগঞ্জগামী কিংবা রামপুরা থেকে সদরঘাটগামী লক্কড়ঝক্কড় সেই পুরনো স্টাইলের মুড়ির টিন (বাস)–এর মত[১], যা স্টার্ট দিলে পেছন থেকে কাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবং ধাওয়া খাওয়া বুড়ো মানুষের মত কোঁকাতে কোঁকাতে দৌড় দিত। ছাত্র জীবনে মালিবাগ জামেয়ায় পড়াকালীন জামেয়ার কাছ থেকে বায়তুল মুকাররম বা গুলিস্তান যেতে রামপুরা থেকে ছেড়ে আসা সদরঘাটগামী সেই ঐতিহাসিক মুড়ির টিনে বহুবার চড়ার সৌভাগ্য (!) হয়েছিল। ফলে উপমার জন্য সহজেই এটি স্মরণে আসে।

শয়তান মানুষের মনের কথা বোঝে কীকরে?

একবার আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তো গায়েব জানে না। তাহলে শয়তান মানুষের মনের কথা টের পায় কীকরে? মানুষের মনের গোপন চিন্তা তো গায়েবের বিষয়ের মতই। আর শয়তান মানুষের মনের মধ্যে জাগ্রত গোপন চিন্তাও বুঝতে পারে। তাহলে কি বলতে হবে শয়তানও গায়েব জানে? প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তর আমি খুঁজে পেয়েছিলাম।

মানুষের মনের সব চিন্তা-চেতনা পরিচালিত ও সঞ্চিত হয়ে থাকে মস্তিষ্কের স্মৃতিকেন্দ্রে। আর স্মৃতিকেন্দ্র হল কতগুলো স্নায়ু নিয়ে গঠিত। এই স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে সব চিন্তা-চেতনা পরিচালিত হয়, এগুলোর মধ্যেই সব চিন্তা-চেতনা সঞ্চিত থাকে। শয়তান যেসব শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে চলাচল করতে সক্ষম, সে শিরা-উপশিরার মধ্যে এসব স্নায়ুও অন্তর্ভুক্ত। আরও উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকটা শব্দ ও আলোকের যেমন প্রবাহ/তরঙ্গ থাকে, তেমনি সব চিন্তা-চেতনারও একটা প্রবাহ/তরঙ্গ থাকার কথা। চিন্তা-চেতনার যখন গতি আছে তখন তার প্রবাহ/তরঙ্গ আছেই মানতে

১। উল্লেখ্য, ঐ সময় এক ধরনের বাসকে রসিকতা করে মুড়ির টিন বলা হত। কারণ মুড়ির টিনে মুড়ি ভরে ঝাকা দিলে যেমন মুড়িগুলো খেপে গিয়ে আরও মুড়ি ভরার জায়গা বের হয়, তদ্রূপ সেই বাসগুলোতেও লোক বোঝাইয়ের পর ড্রাইভার কৌশল করে বাসকে ঘনঘন দ্রুত আগপিছ করত, (মানে বাসকে মুড়ির টিনের মত ঝাকা দিত) যাতে আরও লোক খাপানোর সুযোগ বের হয়। ঐ বাসগুলোর আকৃতি ছিল পেছনের অংশ এখনকারই বাসের মত, আর সামনের অংশ অনেকটা জিপের মত নিচ।

www.maktabatulabrar.com

হয়। সেমতে হতে পারে স্নায়ুর মধ্য দিয়ে চলাচল কালে চিন্তা-চেতনার যে প্রবাহ/তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা দেখেই শয়তান বুঝতে পারে তার মর্ম কি। এভাবেই হয়তো শয়তান মনের চিন্তা-চেতনা ও মনের কথা টের পায়। এটাকে গায়েব জানা বলা হবে না। এটা হল অনেকটা আবহাওয়া নির্দেশক যন্ত্র– হাইড্রমিটার, স্যাটেলাইট রিসিভার বা ওয়েদার র‌্যাডার প্রভৃতিতে বায়ুর প্রবাহ/তরঙ্গ দেখে আবহাওয়ার অবস্থা টের পাওয়ার মত, অথবা সিজমোগ্রাফ মেশিনের প্রবাহ/তরঙ্গ দেখে দূরবর্তী ভূমিকম্পের অবস্থা টের পাওয়ার মত, কিংবা ইসিজির রিপোর্টে হার্টের প্রবাহ/তরঙ্গ রেখা দেখে হার্টের অবস্থা টের পাওয়ার মত। এরূপ হলে সেটাকে গায়েব জানা বলা হবে না, বরং সেটা হবে একটা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে চলাচল করতে সক্ষম– এ কথা সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে। এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. الحديث.» (رواه البخاري برقم ٢٠٣٨ و مسلم برقم ٢١٧٥)

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের শিরা- উপশিরার মধ্য দিয়ে চলে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

শয়তান যদি মানুষের স্নায়ুর মধ্যে বিদ্যমান চিন্তা-চেতনা ও বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে অবগত হতে না পারবে, তাহলে মানুষকে ধোঁকা দিবে কীভাবে? আজকালকার মানুষের মস্তিস্কে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত শাখার তথ্য আর রং-বেরংয়ের কত শাস্ত্রীয় কথাবার্তা। এগুলো প্রাচীনকালের মানুষের মস্তিষ্কে ছিল না। শয়তান অনেক জান্তা হলেও তার জানা তো প্রাচীন কালের কিছু বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা। আধুনিক এসব বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তো তার আনাড়ি থাকারই কথা। সে কি কোন মানুষের কাছে এসব বিদ্যা-বুদ্ধি শিখতে যাবে বলে মনে হয়? সারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার মত মহা চিন্তা চরিতার্থ করার পর এগুলো শেখার মত এত সময়ই বা তার কোথায়? তাছাড়া তার অহংকারও কি তাকে কারো শীষ্যত্ব বরণের অনুমতি দিবে? আসলে কারও কাছেই তাকে কিছু শিখতে যেতে হয় না। সে মনের মধ্যে চলাচলকারী সব চিন্তা-চেতনার মর্মই বুঝতে

সক্ষম হয়। চাই তা সেসব চিন্তা-চেতনার প্রবাহ/তরঙ্গ দেখেই হোক বা অন্য কোনভাবে হোক। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য, তর্কশাস্ত্রের মারপ্যাঁচ আর জটিল গাণিতিক প্যাঁচপোচ সবই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তাই যে কেউ যে কোন শাস্ত্রের মার-প্যাঁচ দিয়েই বলুক না কেন, যে কেউ যে কোন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয়েই কথা বলুক না কেন, সবটারই সে মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে পারে এবং করে থাকেও।

তাছাড়া মনের মুখ আছে, কান আছে, চোখ আছে। মনে মনে যখন কোন কথা বলা হয়, শয়তান সে কথা শুনতে পায়। এভাবেও সে মনের কথা টের পায়। মনের চোখ, মুখ, কান ইত্যাদি আছে বলেই আমরা বলে থাকি মনের মধ্যে কত কথা, মনের চোখ দিয়ে দেখ, মনের কান দিয়ে শোন ইত্যাদি। একথাগুলোকে রূপক অর্থে না নিয়ে প্রকৃত অর্থেও নিতে কোন বাধা নেই। হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত যে, মনের চোখ, কান, মুখ ইত্যাদি আছে। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে আছে যে, শয়তান তোমাদের কারও কাছে এসে বলবে যে, অমুকটা কে সৃষ্টি করল, অমুকটা কে সৃষ্টি করল? (তুমি হয়তো তার জবাবে বলবে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কারণ, একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।) অবশেষে এক পর্যায়ে সে বলবে যে, তাহলে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করল কে? এ পর্যায়ে উপনীত হলে "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম" পাঠ করবে অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহ কামনা করবে।) এ হাদীছে শয়তান "বলবে"– কথাটির প্রকৃত অর্থ নিতে কোন অসুবিধে নেই। অর্থাৎ, শয়তান মনের কাছে বলবে আর মনের কাছে বললে মন তা শুনতে এবং বুঝতেও পারবে। মন যদি শুনতে ও বুঝতে না পারবে, তাহলে তার প্রতিকার কীভাবে করবে? তাহলে "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম" বা "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পাঠ করবে কীভাবে? যাহোক বোঝা গেল এটা বলা যায় যে, মন শয়তানের কথা শুনতে পায় এবং শয়তানও মনের কথা শুনতে ও বুঝতে পারে।

শয়তান এত ভাষা বোঝে কীকরে?

এখানে কারও মনে কৌতুহল জাগতে পারে যে, মানুষ মনে মনে যে কথা বলে সেটা কোন্ ভাষায় হয়ে থাকে? এর জবাব হল– সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে ভাষা, মনের কথাগুলোও সে ভাষাতে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

www.maktabatulabrar.com

অতএব প্রশ্ন হল– পৃথিবীতে রয়েছে ৫ হাজারের বেশি ভাষা। শয়তান এত ভাষা বোঝে কীকরে? একজনের পক্ষে কি এত আষা শিক্ষা করা সম্ভব? এক চীনা ভাষা পড়া শিখতে গেলেই নাকি ৭০ হাজার চিহ্ন/প্রতীক শিখতে হয়, বলতে এবং বুঝতে গেলেও অতগুলো চিহ্ন/প্রতীকের উচ্চারণ ও অর্থ শিখতে হয়। অন্যান্য ভাষা এতটা কঠিন না হোক এর কাছাকাছি কঠিন আরও অনেক ভাষা রয়েছে। তাহলে এক শয়তানের পক্ষে এতসব ভাষা শেখা কি সম্ভব? এ প্রশ্নের তিনটি জবাব দেয়া যায়।

এক. আল্লাহ পাকই তাকে সব ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। এমন ক্ষমতা না দিলে সে মানুষকে ধোঁকা দিবে কীভাবে? আর ধোঁকা দিতে না পারলে দুনিয়া পরীক্ষার স্থান হবে কীরূপে? অতএব সব ভাষাই তাকে শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, সব ভাষার জ্ঞানই তাকে দেয়া হয়েছে। কষ্ট করে শেখা ছাড়াও তো জ্ঞান দিয়ে দেয়া যেতে পারে। আজকাল যেমন কম্পিউটারে লিখিত কোন ডাটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক ফাইল থেকে অন্য ফাইলে কপি (copy) করে পেষ্ট (peste) করে দেয়া যায়। হয়তো এক সময় এমন আসবে যখন লিখিত ডাটা নয় বরং একজনের মস্তিষ্কে সঞ্চিত ডাটাও কপি করে আর একজনের মস্তিষ্কে পেষ্ট করে দেয়া সম্ভব হবে। হয়তো এমন কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ পাক শয়তানের মাথায় সব ভাষার জ্ঞান দিয়ে থাকবেন। অনেকটা যেমন ইল্‌হাম ও ইল্‌মে লাদুন্নির বেলায় ঘটে থাকে। শেখার জন্য কোন মেহনত ছাড়াই তখন মস্তিষ্কে বিভিন্ন ডাটা সংরক্ষিত হয়ে যায়। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ পাক কারও কারও মস্তিষ্কে ডাটা পেষ্ট করে দিয়ে থাকেন। এক ধরনের ওহীও এমন ছিল, যাতে জিব্রাঈলের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে অন্তরে বিভিন্ন ডাটা সঞ্চিত হয়ে যেত। যাহোক আল্লাহ পাক অন্তরে ডাটা পেষ্ট করে দিতেও পারেন আবার ডিলীট/কাট (delete/cut) করে দিতেও পারেন। প্রখ্যাত বুযুর্গ হাফিজ, মুহাদ্দিছ আবূ আব্দিল্লাহ উন্দলূসীর ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি এক খৃষ্টান নারীর মোহে পড়লে আল্লাহ পাক একটি আয়াত ও একটি হাদীছ ব্যতীত কুরআন হাদীছের বাকি সব ডাটা তার অন্তর থেকে কাট (cut) করে নিয়ে যান। অবশ্য পরে এক সময় তওবার তাওফীক হলে আল্লাহ পাক পুনরায় সেই কাট করে নেয়া ডাটাগুলো আন্ডু কাট (undo cut) করে তার মনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। শুনেছি কিছু

গবেষক নাকি মস্তিষ্কের ডাটাগুলো এরূপ কাট, কপি, পেষ্ট করার যান্ত্রিক পদ্ধতি আবিষ্কারের চিন্তায় রয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ পাক এগুলো করেন কোন বিড়ম্বনা ছাড়াই। মানুষ এমন করতে গেলে কি বিড়ম্বনা ছাড়া তা করতে পারবে? তাহলে শেখার জন্য কোন মেহনত ছাড়াই সব বিদ্যে-বুদ্ধি অর্জিত হয়ে যাবে। তখন আল্লামা হওয়া বা বিজ্ঞানী হওয়া কিংবা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অমুক তমুক হওয়া একেবারেই সহজ হয়ে দাঁড়াবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়েল হোম, মক্তব, মাদ্রাসা, বই-পত্র ছাপার প্রেস বাঁধাইখানা সবই প্রয়োজন না থাকায় বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি তখন বিদ্যে-বুদ্ধিরও কোনই দাম থাকবে না। দোকানে গিয়ে দশ টাকা দিয়ে তাবৎ বিদ্যে-বুদ্ধির ডাটা মাথায় আপলোড করে নিয়ে আসলেই হবে। এমন সস্তা উপায়ে অর্জিত হলে সেই বিদ্যে-বুদ্ধির দাম থাকতে যাবে কেন? আর দাম না থাকলে কেউ কিছু শিখতেও যাবে না। তখন এক মস্তিষ্ক থেকে কিছু কপি করতে গেলে দেখা যাবে তাতে গোবর ছাড়া দামী বিদ্যে-বুদ্ধি কিছুই নেই! হয়তো কেউ ভাববে আর নতুন করে কারও ব্রেন থেকে কিছু কপি করার দরকার হবে না, পুরনোগুলোই কপি পেষ্ট করে করে চালানো হবে। কিন্তু যদি তাতে ভাইরাস ঢুকে কোন সর্বনাশ ঘটায় তখন কী হবে? সেই নতুন ভাইরাস ক্লিন করার জন্য এন্টি ভাইরাস তৈরি করার মত জ্ঞান তখন কোথায় পাওয়া যাবে? আর কোন দুষ্ট লোক যদি পথে-ঘাটে কারও মাথা থেকে সব ডাটা ডিলীট্ করে দেয়, তাহলে তার বাসায় ফিরে আসার কী উপায় হবে? এর চেয়ে আরও বেশি ভ্যাজাল লাগবে যদি অন্য কোন মাথার ডাটা তার মাথায় পেষ্ট করে দেয়া হয় আর সে লোক সেই অন্য লোকের বাসায় গিয়ে ঠেলে ওঠে এবং তার মা বাবাকে নিজের মা বাবা এবং তার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী ভেবে অগ্রসর হতে যায়। আল্লাহই মালূম। তাই গবেষকগণ ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হোন। যাহোক এ গেল এক নং জবাব।

দুই. মানুষ যা কিছু বলে মনের মধ্যে তার চিন্তাও এসে থাকে এবং চিন্তা আসে বলার আগে। আর চিন্তা এসে গেলেই সেই চিন্তার প্রবাহ/তরঙ্গ দেখে শয়তান বুঝে নেয় তার মর্ম কি। এর অর্থ হল বলার পূর্বেই শয়তান কথাটি বুঝে নেয়। এমনটি হলে তো শয়তানের কোন ভাষা শেখার বা বুঝার প্রয়োজনই হয় না। তবে শয়তান পৃথিবীর সব ভাষাই

জানে বলে মনে হয়। কারণ, পৃথিবীর বহু দেশের বহু ভাষাভাষী মানুষের সাথে শয়তানের সাক্ষাতের ইতিহাস পাওয়া যায়। অতএব সব ভাষাই সে জানে বলে মনে হয়। সুতরাং সব ভাষা সে কীভাবে আয়ত্ব করে তার ব্যাখ্যা থাকলেই সুন্দর লাগবে। এ ব্যাখ্যার জন্যই তৃতীয় জবাব–

তিন. আজকাল তো যে কোন ভাষার কথা সংশ্লিষ্ট শ্রোতার ভাষায় অনুদিত হয়ে কানে আসার মত মেশিন আবিষ্কার হয়ে গেছে। তাহলে এ প্রশ্ন আর জটিল রইল কোথায়? শয়তান হয়তো এভাবেই দুনিয়ার যে কোন ভাষাভাষী মানুষের শুধু মনের কথাই নয়, জড়দেহের মুখের কথাও নিজস্ব ভাষায় শুনতে পায়। আবার সে যখন কোন মানুষের সাথে কথা বলে (চাই মনের মধ্যে কথা হোক বা বাহ্যিক সাক্ষাৎকারেই হোক), সে মানুষটির মনও তার কথা সেভাবেই বুঝতে পারে। শয়তানের নিজস্ব কোন ভাষা আছে কি না –যে ভাষায় সে সকলের সাথে কথা বলে– থাকলে সে ভাষাটি কি তা-ই বা কে জানে? সে এক সময় উর্দ্ধজগতে ফেরেশতাদের সাথে ছিল বলেই তার নিজস্ব ভাষা আরবী বা ফেরেশতাদের অন্য কোন ভাষা হয়ে থাকলে তা হবে সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, সে দুনিয়াতেও দীর্ঘকাল ছিল বলে জানা যায়। তখন তার ভাষা কি ছিল তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। সে জমানার তথ্য ও ইতিহাস জিন ও ইনসানের মধ্যে একমাত্র শয়তানই কিছু বললে বলতে পারে, কিন্তু সেরকম কিছু তথ্য যদি শয়তান কাউকে জানায়ও, তবুও কি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে?

এ তো গেল প্রধান শয়তান সব ভাষা কীকরে বোঝে সে প্রসঙ্গে কথা। তাছাড়া প্রত্যেক এলাকা ভিত্তিক শয়তান থাকতে পারে, তদুপরি হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের সাথে থাকে এক একজন শয়তান। অতএব এলাকা ভিত্তিক নিযুক্ত শয়তানরা সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষা কিংবা প্রত্যেকের সাথে নিযুক্ত শয়তান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভাষা শিখে নিতে পারে এটা এমন জটিল কিছু তো নয়। এতে তাদের দুনিয়ার তাবত ভাষা শেখার প্রয়োজন দেখা দেয় না।

শয়তান মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কীভাবে কেটে পড়ে?

শয়তান মানুষের চিরশত্রু। বিভিন্ন রকম ওয়াছওয়াছা দিয়ে মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। কখনও সেই বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে আসে না এই মায়াবোধ থেকে যে, আমার ওয়াছওয়াছায়ই

www.maktabatulabrar.com

তো বেচারারা এই বিপদে পড়েছে। মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সে কেটে পড়ে।

শয়তান মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কীভাবে কেটে পড়ে তার একটা ঘটনা শুনুন। বদর যুদ্ধে মক্কার কুরায়শ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মুকাবেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এ আশংকা চেপে বসেছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনূ বকর গোত্রও আমাদের শত্রু। আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সে সুযোগে এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ী-ঘর, নারী ও শিশুদের উপর হামলা করে বসে। এমনি সময় শয়তান কেনানা গোত্রের বড় সর্দার সুরাকা ইব্‌নে মালেকের রূপ ধরে তার এক বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হল এবং এগিয়ে গিয়ে কুরায়শ জওয়ানদের উদ্দেশে এক ভাষণ দিল এবং দুইভাবে তাদেরকে প্রতারিত করল। প্রথমত সে বলল, আজকের দিনে এমন কেউ নেই যে, তোমাদের উপর জয়ী হবে। দ্বিতীয়ত বনূ বকরের ব্যাপারে যদি তোমাদের আশংকা হয়ে থকে তবে তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আমি তোমাদের সমর্থক ও সহায়ক রয়েছি। এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে তাদের বধ্যভূমির দিকে হাঁকিয়ে দিল। কিন্তু যখন বদর প্রান্তরে ভিষণ যুদ্ধ শুরু হল, তখন শয়তান হযরত জিবরাঈল (আ.)সহ ফেরেশতাদের বাহিনী দেখে আতংকিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কুরায়শ যুবক হারিছ ইবনে হিশামের হাতে ধরা ছিল। শয়তান সংগে সংগে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারিছ তিরস্কার করে বলল, এ কী করছ? তখন সে হারিছের বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে তাকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে সটকে পড়ল। হারিছ তখন সুরাকা মনে করে শয়তানকে বলল, হে আরব সর্দার! তুমি না বলেছিলে, আমাদের সমর্থনে থাকবে? অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ! তখন শয়তান সুরাকার বেশেই উত্তর দিল, আমি তোমাদের সাথে নেই। কারণ, আমি দেখছি তোমরা যা দেখছ না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ

وَقَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.﴾

অর্থাৎ, আর (স্মরণ কর,) যখন শয়তান সুশোভন করেছিল তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজসমূহ এবং বলেছিল, আজ কোনো মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর আমি তোমাদের সহায়ক আছি। অতঃপর যখন উভয়দল সামনাসামনি হল, তখন সে পশ্চাৎপদ হয়ে পলায়ন করল এবং বলল, নিশ্চিতই তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি অবশ্যই দেখছি যা তোমরা দেখছ না; আমি তো আল্লাহকে ভয় করছি। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী। (সূরা আনফাল: ৪৮)

শয়তানের কমন ওয়াছওয়াছা ও তা থেকে বাঁচার উপায়

নফ্‌ছ ও শয়তান কত বিষয়ে ওয়াছওয়াছা দেয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। কত বিষয়ে, কত রংয়ে, কত ঢংয়ে যে নফ্‌ছ ও শয়তান ওয়াছওয়াছা দিতে পারে এবং দিয়ে থাকে তার হদ্দ ও হিসাব পুরোপুরি জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কতগুলো বিষয় আছে কমন, যেসব বিষয়ে প্রায়শই ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে। যেমন:

- ওয়াছওয়াছা হয়– আসলেই আল্লাহ আছেন কি? আসলেই কবরের আযাব বলে কিছু আছে কি? আসলেই জান্নাত জাহান্নাম আছে কি? এই ওয়াছওয়াছাগুলো হচ্ছে নফ্‌ছ ও শয়তানের কমন ওয়াছওয়াছা। আপনি যতই এসব ওয়াছওয়াছার জবাব দিতে থাকুন না কেন এসব বিষয়ে ওয়াছওয়াছা হতেই থাকবে। সদা সর্বদাই হতে থাকবে। এসব ব্যাপারে শয়তান যেন পা চাটা প্রকৃতির, যতক্ষণ সে তার চাহিদা মোতাবেক আপনাকে এসব বিষয়ে সন্দিহান করে তুলতে না পারবে ততক্ষণ সে এসব বিষয়ে ওয়াছওয়াছা দিয়েই যেতে থাকবে, আপনার পা চাটতেই থাকবে, এই আশায় যে, যদি কখনও আপনার থেকে তার চাহিদা পূরণ করিয়ে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনার বাঁচার একটা পথ রয়েছে। তাহল– একবার এসব ওয়াছওয়াছার যেসব জবাব পূর্বে দেয়া হয়েছে তা দিন, তারপর পুনরায় যখনই এবং যতবারই এসব বিষয়ে ওয়াছওয়াছা হবে তখন শুধু বলবেন, এর জবাব তো পূর্বে

www.maktabatulabrar.com

দিয়েছি, আবার জবাব দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। "আমানতু বিল্লাহ (এসব ব্যাপারে আমি যথাযথ ঈমান রাখি)। ব্যস এই বলেই অন্য কোন কাজে বা অন্য কোন চিন্তায় লিপ্ত হবেন। যতই আপনার পা চাটুক, যতই ঘ্যানর ঘ্যানর করুক আর কখনও এগুলোর জবাব দিতে প্রবৃত্ত হবেন না।

- কমন ওয়াছওয়াছার আরও কিছু বিষয় হল– নামায না পড়ার ওয়াছওয়াছা। কোনোক্রমেই নামায থেকে বিরত না হলে অন্তত সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে শুধু ফরযের উপর ক্ষান্ত করার ওয়াছওয়াছা। ভালমতো উযু না করা, বরং উযুর সুন্নাত মুস্তাহাব, আদব ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে কোনো রকমে উযুর ফরয আদায়ের উপর ক্ষান্ত করার ওয়াছওয়াছা। এভাবে যেকোনে নেক আমল ছেড়ে দেয়ার ওয়াছওয়াছা। এসব ওয়াছওয়াছা কখনও বন্ধ বা নির্মূল করা যাবে না। নির্মূল করার চিন্তার দরকারও নেই। বরং সর্বদাই শয়তান এসব ওয়াছওয়াছা দিতে থাকুক আর আপনি সেই ওয়াছওয়াছা উপেক্ষা করে যথাযথভাবে এসব আমল করে যেতে থাকুন এবং নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মুজাহাদা করার ছওয়াব হাছেল করতে থাকুন। নফ্ছ ও শয়তান যদি এসব ওয়াছওয়াছা বন্ধ করে দেয় তাতে বরং আপনি মুজাহাদা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, মুজাহাদার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই এসব বিষয়ে ওয়াছওয়াছা হলেই মনে মনে বলুন, এই তো নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মুজাহাদা করার সুযোগ এসে গেছে, এবার আমি নফ্ছ ও শয়তানের সাথে মুজাহাদা করে মুজাহাদার ফায়দা হাসেল করতে চাই। এই বলে সংশ্লিষ্ট আমলগুলো সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করুন। তাতে সেই আমলের ছওয়াবের সাথে সাথে নফছের সাথে মুজাহাদার ছওয়াবও অর্জিত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সকলকে সেই তাওফীক দান করুন।

নামাযে যেসব ওয়াছওয়াছা হয় তার মধ্যে আর একটা হল নামাযে তাড়াহুড়ো করার ওয়াছওয়াছা। যেমন: অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে নামায থেকে ফারেগ হয়ে যেতে মন চায়। মনে চিন্তা জাগে কত রকম কাজ রয়ে গেছে, এই ঝামেলা রয়েছে, ঐ ঝামেলা রয়েছে ইত্যাদি।

www.maktabatulabrar.com

এটাও শয়তানের এক ধরনের ওয়াছওয়াছা। এরকম ওয়াছওয়াছা থেকে যদি কেউ মুক্তি পেতে চান তাহলে তাকে ধীরে সুস্থে নামায সারতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, আমি ধীরে সুস্থেই নামায পড়ব, আমি কোনো রকম তাড়াহুড়ো করব না, এটা শয়তানের ওয়াছওয়াছা। আর যেসব কাজের কথা চিন্তায় আসবে সে ব্যাপারে মনকে বোঝাতে হবে যে, ঐ কাজটা একটু পরে করলেও তেমন কোন অসুবিধা হবে না। মনকে এরূপ বোঝালে তাড়াহুড়োর মনোভাব দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

- শয়তানের কমন ওয়াছওয়াছার আর একটা বিশেষ বিষয় হল তাকদীরের বিষয়। পদে পদে মনের মধ্যে তাকদীর সম্বন্ধে ওয়াছওয়াছা এসে থাকে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "তাকদীর প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা" শিরোনামে নাতিদীর্ঘ আলোচনা আসছে।

জরুরী কাজের মুহূর্তে নফ্ছ ও শয়তানের সাথে বাহাছ করতে নেই

মনে রাখা চাই নামায, যিকির, তেলাওয়াত, মুতালাআ ইত্যাদি জরুরী কাজে মগ্ন থাকার মুহূর্তে নফ্ছ ও শয়তানের সাথে বাহাছ করতে নেই। কারণ, তখন এসব ছওয়াল জবাবে মশগূল হলে আপনি সেসব জরুরী কাজের মগ্নতা হারিয়ে ফেলবেন। তাহলে নফ্ছ ও শয়তান এভাবে কামিয়াব হয়ে যাবে যে, জরুরী কাজের মগ্নতা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করে দিতে সক্ষম হল। যেসব কাজে মগ্নতা আবশ্যক, সেসব কাজের মুহূর্তে এসব চিন্তা মনে এলে সেদিকে কোনক্রমেই মনোযোগ না দেয়া চাই। যেসব কাজে মগ্নতা আবশ্যক তখন নফ্ছ ও শয়তানের পক্ষ থেকে বারবার এসব প্রশ্নের দিকে পুশিং হতে থাকবে, এসব চিন্তার দিকে ধাবিত করার জন্য পুনঃপুনঃ উস্কানী আসতে থাকবে, কিন্তু তখন অনড় থাকতে হবে ঐসব কাজের মগ্নতায়। তখন কোনক্রমেই ঐসব প্রশ্নের দিকে মনোযোগ দেয়া সমীচীন হবে না। হাঁ অবসর কোন সময়ে –যখন কোন জরুরী কাজের মগ্নতায় ব্যাঘাত না ঘটে তখন– নফ্ছকে বাগে আনার জন্য এবং নফ্ছকে ভাল চিন্তায় অভ্যস্ত করানোর উদ্দেশ্যে এসব ছওয়াল জওয়াবে মনোযোগ দেয়া যেতে পারে।

শয়তানের নিত্য কৌশল

ইবলীছ শয়তানের কমন ওয়াছয়াছার বিষয়ে অর্থাৎ, সাধারণত যেসব বিষয়ে সে ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে তা নিয়ে অল্প-বিস্তর আলোচনা পেশ করা হল। এবার ইবলীছ শয়তানের দু' ধরনের কৌশল– অর্থাৎ, ওয়াছওয়ার দু' ধরনের কৌশল– প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে যাচ্ছি। ১. নিত্য কৌশল, ২. বিরল কৌশল। নিত্য কৌশল বলতে বুঝাচ্ছি সেসব কৌশল যা সে সচরাচর গ্রহণ করে থাকে এবং সবার বেলায় গ্রহণ করে থাকে। আর বিরল কৌশল বলতে এমন কোন কৌশল যা নতুন, যা পূর্বে ছিল না কিংবা যা সবার বেলায় গ্রহণ করে না, বরং বিশেষ বিশেষ লোকের বেলায় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রহণ করে থাকে।

শয়তানের নিত্য কৌশলের মধ্যে রয়েছে:

কৌশল নং ১: ভাল কাজকে মন্দ করে দেখানো এবং মন্দ কাজকে ভাল করে দেখানো।

শয়তানের নিত্য কৌশলের মধ্যে সর্বপ্রথম কৌশল হল মানুষ যেন কোনো ভাল কাজ তথা নেক কাজের দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধই না হয় তাই ভাল কাজকে মন্দ করে দেখানো এবং মন্দ কাজকে ভাল করে দেখানো। অর্থাৎ, উল্টো বোঝানো। শয়তানের কাজ হচ্ছে উল্টো বোঝানো। আল্লাহ আল্লাহর রসূল যেমন বোঝান শয়তান বোঝায় তার উল্টো। যেমন: কয়েকটা উদাহরণ দেই। আল্লাহ্ তাআলা বোঝান যে,

﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ.﴾

অর্থাৎ, যদি যাকাত-ফেতরা দেয়া হয়, দান-সদকা করা হয়, তাহলে আল্লাহ্ সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন, সম্পদের বরকত বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে সূদী কারবার করলে সম্পদ এবং সম্পদের বরকত কমিয়ে দেন। (সূরা বাকারা: ২৭৬)

বুঝা গেল যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা হয়, দ্বীনী কাজে ব্যয় করা হয়, তাহলে সম্পদ বাড়বে, কমবে না। বিশেষভাবে হজ্জ- ওমরার ব্যাপারে স্পষ্টতই হাদীছে বলা হয়েছে,

عبد الله بن مسعود قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :

«تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ.» (رواه الترمذي وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب)

অর্থাৎ, বেশী বেশী করে একের পর এক হজ্জ ওমরা করতে থাক। তাহলে এই হজ্জ ওমরাহ্ গোনাহ্‌কেও দূর করবে, অভাবকেও দূর করবে। (তিরমিযী) আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসূল বোঝাচ্ছেন এ-ই, আর শয়তান বোঝাচ্ছে কি? কুরআনে কারীমে এসেছে,

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ.﴾

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং যাকাত না দেয়ার নির্দেশ দেয়। (সূরা বাকারা: ২৬৮)

সে বোঝায় যে, দান-সদকা করলে টাকা-পয়সা কমে যাবে, হজ্জ-ওমরায় গেলে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়ে যাবে। শয়তান তো বোঝায় এমনই, কিন্তু যে আল্লাহ্ সম্পদ দেন, সে আল্লাহ্ বলেছেন, এগুলো করলে সম্পদ কমবে না বরং সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের সামনে এমন অনেক লোক আছেন, যারা প্রতি বছর হজ্জ ওমরাহ্ করেন, কিন্তু তাদের সম্পদ কমে না। যাকাত হিসেব করেই ঠিক ঠিকমত আদায় করেন, কিন্তু সম্পদ কমে না। যদি কুরআন হাদীছের কথায় বিশ্বাস থাকে এবং মজবুত বিশ্বাস নিয়ে পূর্ণ ইখ্‌লাছের সাথে আমরা এসব কাজে ব্যয় করতে থাকি, তাহলে সম্পদ কমবে না বরং বাড়বে। যদি পরিমাণে নাও বাড়ে, সম্পদের বরকত বেড়ে যাবে, সম্পদের কার্যকারিতা বেড়ে যাবে। দেখা যাবে পরিমাণে কম, কিন্তু কাজে লাগবে বেশী। একজন মানুষ লাখ লাখ টাকা উপার্জন করে, আবার লাখ লাখ টাকা তার বাজে খাতে ব্যয় হয়ে যায়; এমনকি অনেক সময় এসব বাজে কাজে সে ঋণীও হয়ে যায়। তাহলে দেখা গেল তার সম্পদ পরিমাণে বেশী হলেও তা কাজের কাজে লাগছে না, তার সম্পদে বরকত হচ্ছে না। তাহলে তো প্রকৃতপক্ষে সে অভাবী। সে যা আয় করে তার চেয়ে বেশী ব্যয় হয়ে যায়, এক লাইনে আয় করে, দশ লাইনে ব্যয় হয়ে যায়। এটা হচ্ছে আয়ে বে-বরকতির নমুনা। আর আয়ে বরকতের নমুনা হল একজন মানুষ আয় করে পরিমাণে কম, কিন্তু তার কোন বাজে খরচ সামনে আসেই না। কোন ফালতু ও বেহুদা খরচ তাকে করতে হয় না, বরং যা আয় করে খরচ হওয়ার পরও তার কিছু বাড়তি থেকে যায়,

www.maktabatulabrar.com

তাহলে এ ব্যক্তি ধনী। একেই বলে বরকত। অল্পের ভিতরে আল্লাহ্ পাক বেশী বরকত দিতে পারেন। যা হোক- যে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেন সে আল্লাহই বলেছেন যে, দান-সদকা, যাকাত, হজ্জ, ওমরাহ্ ইত্যাদির কারণে সম্পদ কমবে না বরং সম্পদ বাড়বে। কিন্তু শয়তান আমাদেরকে বুঝায় দান-সদকা করলে, হজ্জ-ওমরাহ করলে, যাকাত-ফেত্রা দিলে সম্পদ কমে যাবে। দেখা গেল- আল্লাহ্ তাআলা যা বোঝাচ্ছেন, শয়তান তার বিপরীত বোঝাচ্ছে। সারকথা আল্লাহ ও তার রসূল সব ভালটিকে ভাল বোঝান, মন্দটাকে মন্দ বোঝান আর শয়তান ভালটিকে খারাপ আর খারাপটাকে ভাল বলে বোঝায়। এর ফলে মদ, নেশা, জুয়া, সিনেমা, বাইস্কোপ গান-বাদ্য ইত্যাদি যত রকম খারাপ কাজ রয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে ভাল লাগে। শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলেই তা ভাল লাগে। সে মানুষকে বোঝাতে চায় যে, এগুলোতে কত মজা! নেশা করলে সব দুঃখ ভুলে যাওয়া যায়, গান-বাদ্য, সিনেমা-বাইস্কোপে জীবনটা স্বাদে/গন্ধে ভরে ওঠে, জীবনে কত রোমান্স পাওয়া যায় ইত্যাদি। শয়তান মানুষকে এ সব ভুয়া কল্পনার মধ্যে ঘুরাতে থাকে। এসব ভুয়া কল্পনার মধ্যে মানুষ তার সত্যিকার বিবেক হারিয়ে ফেলে। তখন সে ভাবে, জুয়া খেলতে হুজুররা নিষেধ করে, অথচ একবার যদি লেগে যায় তাহলে ব্যস কেল্লা ফতেহ্। গান-বাদ্য, সিনেমা ইত্যাদি হুজুররা নিষেধ করে, অথচ এগুলো যদি না করি তাহলে তো জীবনটা একেবারে নিরস হয়ে যায়, জীবনে কোন রস-কষ থাকে না, জীবনে কোন রোমান্স থাকে না। খাও দাও ফুর্তি কর, জীবনটাকে উপভোগ কর, জীবন/যৌবন স্বাদে/গন্ধে ভরে তোল! এসব যদি না করি, তাহলে জীবনের কী মূল্য থাকল? শয়তান এগুলো শেখায়। এভাবে শয়তান খারাপ জিনিসকে ভাল করে দেখায়। আবার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দাড়ি, টুপি, পর্দা ইত্যাদি শরীয়তের করণীয় বিষয়গুলোকে খারাপ করে দেখায়। এগুলো মনে ভাল লাগে না। শয়তানই মনের মধ্যে এরূপ প্রভাব ফেলে থাকে।

কৌশল নং ২: আগামীর চক্করে ফেলে দেয়া।

শয়তানের নিত্য কৌশলের একটা হল– কেউ যখন নেক কাজ করতে ইচ্ছাই করে নেয় তখন তাকে আগামীর চক্করে ফেলে দেয়া। অর্থাৎ, আগামীতে করব এই চক্করে ফেলে দেয়া। যেমন: আমরা অনেক

www.maktabatulabrar.com

সময় চিন্তা করি আমল করা দরকার, আমল করতেই হবে, আমাকে তো মরতেই হবে, আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে হবে, অতএব আমল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তবে এখন তো একটু অসুবিধার মধ্যে আছি, এখন নানান ঝামেলায় আছি, আচ্ছা ক'দিন পরেই শুরু করা যাবে, সামনে ঠিকমত সব আমল শুরু করে দিব। এ বছরটা একটু ঝামেলায় আছি, হজ্জটা করতে পারলাম না, যাক আগামীতে করব। সব সময় তো আর ঝামেলা থাকবে না। এভাবে সব আমলের ক্ষেত্রেই আগামীর চক্করে পড়ে যাই। শয়তানই আমাদেরকে আগামীর চক্করে ফেলে দেয়। আমরা ভাবি এখন টাকা-পয়সার অভাব আছে একটু দান-সদকা কম করলাম, সামনে খুব দান-সদকা করব। ইদানিং শরীরটা একটু খারাপ, ক'দিন পর সুস্থ হয়ে যাব, তখন ঠিকমত আমল করব। এভাবে সব ব্যাপারেই শয়তান আমাদেরকে আগামীর চক্করে ফেলে দেয়।

এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা হল– এখনই যথাসাধ্য আমল শুরু করে দেয়া এবং একথা চিন্তা করা যে, সামনে ঝামেলা কমবে, সামনে অভাব কমবে, সামনে সুস্থতা বাড়বে– এগুলোর কোনো নিশ্চয়তা নেই বরং বাস্তবে দেখা যায় যত দিন যায় ততই ঝামেলা বাড়ে, যত দিন যায় ততই টাকা-পয়সার প্রয়োজন বাড়ে, যত দিন যায় ততই রোগ-ব্যাধি বাড়ে। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আগামীর চক্করে না পড়ার কথা খুব সুন্দর করে বলেছেন,

«اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَائَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.» (رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق برقم ٨٠١٠ وقال : صحيح على شرط الشيخين وعلق عليه الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم.)

অর্থাৎ, পাঁচটা জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটা জিনিসকে কাজে লাগাও, পাঁচটা অবস্থা আসার পূর্বে পাঁচটা অবস্থার মূল্যায়ন কর। এক. তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার পূর্বে। দুই. অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতাকে কাজে লাগাও। তিন. তোমার সচ্ছলতাকে কাজে লাগাও অভাব

আসার পূর্বে। চার. তোমার অবসরকে কাজে লাগাও ব্যস্ততা আসার পূর্বে। পাঁচ. জীবনকে কাজে লাগাও মৃত্যু আসার পূর্বে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে আগামীতে করব, সামনে করব– এই চক্করে পড়ো না বরং এখনই কাজ শুরু করে দাও। সামনে নয় বরং যা করার এই মুহূর্তে শুরু করে দাও। অতএব শয়তান যদি আগামীর চক্করে ফেলার ওয়াছওয়াছা দেয়, তাহলে তার মোকাবেলার পদ্ধতি হল এখনি শুরু করে দেয়া।

কৌশল নং ৩: ইল্‌ম থেকে দূরে রাখা।

যখন মানুষ আগামীর চক্কর থেকে উঠে এখনই আমল করা শুরু করে তখন শয়তানের কৌশল হয় সেই আমল যেন শুদ্ধ না হয় তার জন্য ইলম অর্জন করা থেকে দূরে রাখা। আমল শুদ্ধ করার জন্য প্রথমেই জরুরী হল ইল্‌ম অর্জন করা বা জানা, শেখা, অর্থাৎ, কুরআন হদীছের কথা জানা, কুরআন হাদীছের কথা শেখা, দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা, মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা। এটাই হল প্রথম জরুরী। কারণ ইল্‌ম না থাকলে আমল শুদ্ধ হয় না। তাই শয়তানের কাজ হয় এই ইল্‌মের লাইনে বাধা সৃষ্টি করা। এ জন্য সে দ্বীনী ইল্‌মের বিরুদ্ধে, দ্বীনী ইল্‌মের ধারক-বাহক উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে নানান রকম ওয়াছওয়াছা দেয়, নানান রকম কুমন্ত্রণা দেয়, নানান রকম অমূলক ধারণা সৃষ্টি করে দেয়, যাতে মানুষ দ্বীনের কথা না শেখে। শয়তান এসব কাজ নিজেও করে, আবার তার দোসর মানুষরূপী শয়তানদের মাধ্যমেও করায়। তাই দেখা যায় পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে যত আম্বিয়ায়ে কেরাম এসেছেন, তাদের সকলের আনীত দ্বীনী ইল্‌মের ক্ষেত্রে শয়তানের দোসর এক শ্রেণীর লোকেরা তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করে বলেছে, এরা কী বিদ্যা নিয়ে এসেছে? এ বিদ্যা দুনিয়ার কী কাজে লাগে? এটা ভিক্ষা-বিদ্যা, আলেম সমাজ পরজীবী, তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি নানান কথা বলা হয়। এগুলো শয়তানের শেখানো কথা। দ্বীনী ইলম থেকে মানুষকে সরানোর জন্য ও দ্বীনী ইলমের ধারক-বাহকদের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্যই শয়তান মানুষকে এসব কথা শিখিয়েছে। এগুলো শয়তানের শেখানো বুলি। মানুষ যেন এই ইল্‌ম থেকে দূরে সরে থাকে, তাই সে এসব বুলি চালু করে দিয়েছে। ইল্‌ম থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্য আমল থেকে দূরে রাখা। ইল্‌ম থেকে দূরে সরে থাকলে আমল আসবে কোত্থেকে?

www.maktabatulabrar.com

উলামায়ে কেরাম সম্বন্ধে কিছু লোকের অভিযোগ

কুরআন হাদীছের ইলম থেকে মানুষকে সরানোর জন্য এই ইলম ও তার ধারক-বাহক আলেম সমাজ সম্বন্ধে প্রধানত চারটা অভিযোগ তোলা হয়। ১. এই বিদ্যা ভিক্ষা-বিদ্যা। ২. এই বিদ্যা দুনিয়ার কোন কাজে লাগে না। ৩. আলেম সমাজ পরজীবী। ৪. আলেমরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এ অভিযোগগুলোর উত্তর শুনে নিন। শয়তান ও তার দোসরদের উত্তরগুলো শোনান এবং তাদেরকে পরাস্ত করুন।

প্রথম অভিযোগের উত্তর: কুরআন-হাদীছের ইলম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে এটা ভিক্ষাবিদ্যা। অথচ কেউ কুরআন-হাদীছের ইলম শিক্ষা করলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা কখনও ভিক্ষাবৃত্তি করান না। আলেম সমাজ ভিক্ষা করে খান না। তারা আয়- উপার্জন করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কোন আলেম যদি মসজিদ মাদ্রাসার কাজের জন্য কাউকে দান-সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন তখন তারা উদ্বুদ্ধ হয়েই দান-সদকা করেন। কারও উপর চাপ সৃষ্টি করে নেয়া হয় না। এটাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলা জেনেবুঝে মিথ্যাচার। উলামায়ে কেরামকে কেউ হাদিয়া-তোহফা দিলে তাও মানুষ খুশি মনেই দিয়ে থাকে। ভক্তি আবেগ নিয়েই দিয়ে থাকে। অথচ বহু স্কুল কলেজের জন্য যখন চাঁদা আদায় করা হয় তখন তা চাপের মুখেই আদায় করা হয়। বলা যায় একরকম ছুরি দেখিয়েই তা করা হয়।

দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর: কুরআন হাদীছের ইলম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, এই বিদ্যা দুনিয়ার কোন কাজে আসে না। এই বিদ্যা কোন কাজে আসে কি না সে সম্বন্ধে শুনুন। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে ন্যায়নীতি, সততা, পরোপকার, দায়িত্ব-সচেতনতা ইত্যাদি যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, তা এই বিদ্যার এবং এই বিদ্যার ধারক বাহকদেরই অবদান। আর এই ন্যায়নীতি, সততা ও দায়িত্ব সচেতনতাই উন্নতির মূলকথা। ন্যায়নীতি, সততা ও দায়িত্ব সচেতনতা ছাড়া কোন দেশের, কোন জাতির পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। আর এই ন্যায়নীতি, সততা ও দায়িত্ব সচেতনতার কথাগুলো এই ইলমের ধারক-বাহকরাই শেখান। অতএব এই ইলমের ধারক-বাহকদের শিক্ষাই উন্নতির মূলে কাজ করছে। এই আমাদের দেশেই লক্ষ করুন লাখো মসজিদের মিনার থেকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত আজানের ধ্বনি ভেসে ওঠে, এটা এই বিদ্যারই অবদান। পথে ঘাটে বের হন লক্ষ কোটি মানুষ একে

অপরকে সালাম দিচ্ছে, মুসাফাহা করছে, মুআনাকা করছে– এগুলো এই বিদ্যারই অবদান। লাখো মানুষের মুখে দাড়ি, গায়ে দ্বীনী লেবাস, হেজাব, বোরকা– এগুলোও এই বিদ্যারই অবদান। এখনও সমাজে বাকি বকেয়া যতটুকু গুরুজন-মান্যতা ও আদব-কায়দা রয়েছে, তা-ও এই বিদ্যারই অবদান। সমাজে এখনও যতটুকু হায়া-লজ্জা রয়েছে তাও এই বিদ্যারই অবদান। মানুষের নৈতিক চরিত্র বলতে যা বোঝায়, তা যতটুকুই সমাজে বিদ্যমান রয়েছে এই বিদ্যারই অবদান। স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তো স্পষ্টতই বলে থাকেন নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া তাদের দায়িত্ব নয়। তাহলে সমাজে নৈতিক চরিত্রের এ চর্চা কোন্ বিদ্যার অবদানে এসেছে? নিশ্চয় তা এই বিদ্যারই অবদান।

তৃতীয় অভিযোগের উত্তরঃ উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে এরা পরজীবী, অর্থাৎ, পরের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ ক্ষেত্রে কথা হল কিছুর উপর নির্ভর করা ছাড়া দুনিয়ায় কে টিকে থাকে? যারা জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত, তারাও তো চাকরি ছাড়া বাঁচে না, কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ছাড়া বাঁচে না, এভাবে তারাও তো অন্য কিছু একটার উপর আশ্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাহলে তারাও তো পরজীবি।

উলামায়ে কেরাম পরজীবী– এ কথার ব্যাখ্যা যদি এভাবে করা হয় যে, উলামায়ে কেরাম মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি যেসব প্রতিষ্ঠান চালান তা জনগণের অর্থের উপর নির্ভরশীল, এভাবে উলামায়ে কেরাম জনগণের উপর নির্ভরশীল, একেই বলে পরের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করা তথা পরজীবী হওয়া। তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করব স্কুল কলেজ চালানোর অর্থও তো জনগণ থেকেই আসে। তাহলে স্কুল-কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও পরজীবী বলুন। বরং সরকারী স্কুল-কলেজ হলে তো সেগুলো ট্যাক্সের টাকায় চলে, যে ট্যাক্স জনগণ থেকে জোরপূর্বক আদায় করা হয়। জনগণ খুশিমনে ট্যাক্স দেয় না, সরকারকে অভিশাপ দেয় আর ট্যাক্স দেয়। সেই ট্যাক্সের টাকায় যারা চলে তাদেরকে তো অভিশপ্ত পরজীবী বলা চাই। পক্ষান্তরে মসজিদ মাদ্রাসার জন্য জনগণ যে অর্থ দেয় তা খুশি মনে দিয়ে থাকে। ভক্তি আবেগে, মহব্বত ভালবাসায় দিয়ে থাকে।

চতুর্থ অভিযোগের উত্তরঃ উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা সমাজ-বিচ্ছিন্ন। অথচ উলামায়ে কেরামই সমাজের লোকদের

www.maktabatulabrar.com

সবচেয়ে কাছের মানুষ। মানুষ আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের বাইরে যদি অন্য কোন শ্রেণীর মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে থাকে, তাহলে তারা হলেন উলামায়ে কেরাম। মানুষ উলামায়ে কেরামকে যতটুকু ভালবাসে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে। খাঁটি অন্তর দিয়ে মানুষ তাঁদেরকে ভক্তি করে। আর কোনো শ্রেণীর লোককে মানুষ এরকম খাঁটি অন্তরে ভালবাসে না, আর কোনো শ্রেণীর লোককে মানুষ এরকম নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে না। যারা রাজনৈতিক নেতাদেরকে ভালবাসে, তাদের প্রতি ভক্তি দেখায়, তা শুধু স্বার্থের জন্য। তাই স্বার্থ উসূল না হলে তাদের দল ছেড়ে দিয়ে আরেক দলে চলে যায়। তাদের পেছনে যে মানুষগুলো ঘুরঘুর করে, তাদের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা নেই। মানুষ আন্তরিকভাবে তাদেরকে ভালবাসে না। কিন্তু দ্বীনদার ও পরহেযগার মানুষ উলামায়ে কেরামকে যতটুকু ভালবাসে, অন্তর দিয়ে ভালবাসে। আলেম সমাজের সাথে মানুষের তাই আন্তরিক সম্পর্ক। আর কোন শ্রেণীর সাথে মানুষের এরকম আন্তরিক সম্পর্ক নেই। তাই উলামায়ে কেরাম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন বরং তাঁরাই হচ্ছেন মানুষের অন্তরের মানুষ, মানুষের কাছের মানুষ। অন্য কোন শ্রেণীর মানুষকে লোকেরা এরকম বিশ্বাস করতে পারে না, এরকম আস্থাভাজন মনে করে না, উলামায়ে কেরামকে যতটা বিশ্বাস করে এবং তাঁদেরকে যতটা আস্থাভাজন মনে করে। অতএব উলামায়ে কেরাম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন– এটা সম্পূর্ণ উল্টো কথা। শয়তান কুরআন-হাদীছের শিক্ষার প্রতি মানুষের মনে অভক্তি সৃষ্টি করে দেয়, আর তা থেকেই কুরআন-হাদীছের ধারক-বাহক আলেম সমাজ সম্পর্কে কটুক্তি করা হয়। এটা হল কুরআন-হাদীছের ইল্ম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার শয়তানী কৌশল।

কৌশল নং ৪ঃ রিয়া ও হুব্বে জাহ–এর চেতনা এনে দেয়া।

শয়তানের উপরোক্ত ওয়াছওয়াছা উপেক্ষা করে যখন কেউ ইল্ম শিক্ষা করে এবং আমল শুরু করে দেয়, তখন শয়তানের ওয়াছওয়াছা হয় আমলের মধ্যে রিয়ার চেতনা (তথা মানুষকে দেখানোর চিন্তা, মানুষের কাছে ভাল প্রতিপন্ন হওয়ার চিন্তা, মানুষের কাছে প্রশংসা পাওয়ার চিন্তা)

এনে দিয়ে আমলের ছওয়াব নষ্ট করে দেয়া। যেমন: কেউ নামায পড়া শুরু করলে তখন শয়তান তার মনের মধ্যে এই চিন্তা এনে দেয় যে, খুব সুন্দরভাবে নামায পড়া দরকার, যাতে মানুষ বলে, আমি সুন্দরভাবে নামায পড়ি। অথবা তার মধ্যে এই ভাবনা জাগিয়ে দেয় যে, আমার পেছনে, আমার আশেপাশে অনেক লোক আছে তারা দেখছে আমি কীভাবে নামায পড়ছি, যদি খারাপভাবে পড়ি তাহলে তারা কী বলবে? পক্ষান্তরে সুন্দরভাবে পড়লে তারা প্রশংসা করবে। এই লোক দেখানোর চিন্তাকে বলা হয় রিয়া এবং মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার চেতনাকে বলা হয় হুব্বে জাহ তথা প্রশংসা ও যশ-প্রীতি।

এই রিয়ার চিন্তা মন থেকে দূর করার উপায় হচ্ছে–

রিয়া দূর করার পদ্ধতি

বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন সুন্নাহ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রিয়া (লোক দেখানোর চিন্তা) ও হুব্বে জাহ (প্রশংসা/সম্মান-প্রীতি) দূর করার জন্য যে পদ্ধতি বলেছেন নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

১. কেউ দেখল বা দেখল না তা একেবারেই চিন্তায় না আনা। ওদিকে একদম লক্ষ্য না দেয়া।

২. তারপরও মনের মধ্যে চিন্তা এসে গেলে একথা মনে জাগ্রত করা যে, কারও ভাল বলার দ্বারা পরকালে আমার কোন কাজে আসবে না– আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে করলে আমার কাজে আসবে, তাই আল্লাহকে খুশি করার নিয়তেই আমি করছি। এভাবে সহীহ নিয়ত অন্তরে উপস্থিত করে কাজ করে যেতে থাকবে, এভাবে ধীরে ধীরে সেটা আদত বা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং আদত থেকে ইবাদত ও এখলাসে পরিণত হবে।।

৩. যে ইবাদত প্রকাশ্যে করার বিধান, তা তো প্রকাশ্যেই করতে হবে, এ ছাড়া অন্যান্য ইবাদত প্রকাশ করারও নিয়ত রাখবে না, গোপন করারও উদ্যোগ নিবে না।

৪. হুব্বে জাহ বা সম্মান-প্রীতি অন্তর থেকে বের করতে হবে। তাহলে অন্তর থেকে রিয়ার চেতনা দূর হবে। নিম্নে হুব্বে জাহ বা সম্মান-প্রীতি দূর করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

www.maktabatulabrar.com

হুব্বে জাহ্ (প্রশংসা ও যশ-প্রীতি) দূর করার পদ্ধতি

১. এই চিন্তা করা যে, আমি যাদের নিকট ভাল হতে চাই তারাও থাকবে না আমিও থাকব না। অতএব, এমন অসার জিনিসের প্রতি মন লাগানো নির্বুদ্ধিতা বৈ কি?

২. এমন কোন কাজ করা, যা শরীআতের খেলাফ নয় কিন্তু লোক-চোখে সেটা লজ্জাকর, যেমন: বাড়ির কোন নগন্য জিনিস বিক্রি করা। প্রভাবশালী ও নামী-দামী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিজে বাজারঘাট করা, নিজে বাজারের থলে বয়ে নিয়ে আসা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য: হুব্বে জাহ তথা প্রশংসা, সুনাম ও সম্মানের লোভ মনে এলে অন্যের প্রশংসা, সুখ্যাতি ও সম্মান দেখে মনে আগুন জ্বলে ওঠে এবং হিংসা লাগে আর অন্যের অপমান বা পরাজয়ের কথা শুনে মনে আনন্দ জন্মে। এমনিভাবে অনেক খারাবী এ রোগের কারণে দেখা দেয়। তাই এ রোগ দূর করার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেয়া চাই।

কৌশল নং ৫: ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়া।

শয়তানের নিত্য কৌশলের একটা হল ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়া। যেমন ধরুন একজন নিয়মিত নামাযী মানুষ, যিনি নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় করেন। এরূপ লোককে যদি শয়তান হুট করে প্রথমেই নামায ছেড়ে দেয়ার ওয়াছওয়াছা দেয় তাহলে লোকটিকে তা কোনোক্রমেই মানাতে পারবে না। তাই শয়তান এরূপ লোকের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে পেছনের দিকে নেয়ার কৌশল গ্রহণ করে। যেমন: সে প্রথমে একদিন লোকটিকে ওয়াছওয়াছা দেয় যে, আজ শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। আজ না হয় ঘরেই নামায আদায় করে নেই। এভাবে একদিন দু'দিন ঘরে নামায পড়াতে পারলে তারপর মনে এনে দেয় আমি তো আর নিয়মিত জামাতে নামায পড়ি না। ঘরেও তো মাঝে মধ্যে নামায পড়ি। তা নামায ঘরে পড়লেও তো হয়ে যায়। এভাবে তার মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়ার পালা বাড়তে থাকে। ঘরে নামায পড়তে গিয়ে মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় ছুটতে শুরু করে। মনে হয় আচ্ছা ঘরেই তো নামায পড়ব তা একটু বিলম্বে পড়লেও তো চলে। এভাবে মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায পড়া বাদ যায়।

তারপর বিলম্বে পড়তে গিয়ে মাঝে মধ্যে মাকরূহ ওয়াক্তেও চলে যায়। তারপর পড়ি পড়ি করতে করতে কোন একদিন হয়তো কাজা হয়ে গেল। কাজাও পড়ে নিল। এভাবে কাযার পরিমাণ বেড়ে গেলে মনে আসতে শুরু করে আচ্ছা পরে কাযা করে নিব। এভাবে নামায ছোটা বাড়তে থাকে এবং কাযার স্তুপ হতে থাকে। তারপর একসময় মনে আসতে শুরু করে আমি তো নিয়মিত নামাযী নই। আচ্ছা ভবিষ্যতে নিয়মিত হওয়া যাবে। এই ভেবে এক সময় পূরো বে-নামাযী হয়ে যায়। এমনকি নাউযু বিল্লাহ এভাবে পেছনে সরতে সরতে বে-ঈমান কাফের পর্যন্ত হয়ে যায়।

শুধু নামাযীর ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে অগ্রসর ব্যক্তিদেরকেও শয়তান এভাবে ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নিয়ে থাকে। তাই সর্বদা সচেতন থাকতে হয় শয়তান আমার গতি যেন পেছন দিকে নিতে না পারে। একবার গতি পেছনের দিকে হয়ে গেলে চূড়ান্ত পতন না হওয়া পর্যন্ত পেছনে যেতেই থাকবে। যেমন মনে করুন একটা গাড়ি যদি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতে চায় তাহলে তার গতি কখনও কমানোর অবকাশ নেই, বরং সর্বদাই গতি বাড়ানো এবং গতিকে শক্তিশালী করে যেতে হবে। যদি একবার গাড়ি পেছনের দিকে যেতে শুরু করে, তাহলে সর্বনিম্ন স্তরে খাদে পড়ে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত হয়তো গাড়ি আর থামবে না। ঠিক তেমনি জীবনে উন্নতির শিখরে আরোগণ করার জন্য গতি যখন সামনের দিকে বাড়তে শুরু করবে, তখন পেছনের দিকে গেলে হতে পারে জীবন নামক এই গাড়ি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আর ক্ষান্ত হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন!

কৌশল নং ৬: পরহেযগারির চেতনা উস্কে দেয়া।

শয়তানের নিত্য কৌশলের আর একটা হল– পরহেযগারির চেতনা উস্কে দেয়া। শয়তান শুধু খারাপ চেতনা নিয়েই আসে না, অনেক সময় সে বাহ্যিক ভাল চেতনা নিয়েও আসে। ঐ ভালোর পেছনে তার উদ্দেশ্য থাকে খারাপ। যেমন কোন নামাযী ব্যক্তি যখন এখ্লাসের সাথে নামায পড়া শুরু করে, তখন শয়তান এরূপ চিন্তা মনে এনে দেয়; যেটাকে বাহ্যিকভাবে মনে হবে ভাল চিন্তা, কিন্তু আসলে সেটা খারাপ। অর্থাৎ, সেই নামাযী ব্যক্তি তখন মনে করতে থাকে মাশাআল্লাহ্ আলহাম্দু লিল্লাহ! এখন

www.maktabatulabrar.com

আমার মধ্যে ইখলাস এসে গেছে, আমি এখন কাউকে খুশি করার চিন্তায়, কারও কাছে প্রশংসিত হওয়ার চিন্তায় নামায পড়ি না। আমি এখন ইখলাসের সাথে নামায পড়ি, আমার মন থেকে রিয়া দূর হয়ে গেছে। অথচ এই যে ইখলাস এসে যাওয়ার চিন্তা– এ চিন্তাও কিন্তু এক রকম ইখ্লাসের পরিপন্থী চিন্তা। হযরত ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেছেন, ইখ্লাস কাকে বলে? মানুষ দেখছে বা দেখছে না এরকম কোন চিন্তাই ভিতরে আসবে না, আমার মধ্যে ইখ্লাস আছে এ চিন্তাও আসবে না। তিনি বলেন, ইখ্লাস বলা হয় ইখ্লাস না থাকাকে অর্থাৎ, আমার মধ্যে ইখ্লাস এসে গেছে- এই উপলব্ধিও থাকবে না। এটাই হল পূর্ণ ইখ্লাস। চিন্তা থাকবে শুধু এটাই যে, আমি আল্লাহ্র জন্য করছি, এছাড়া অন্য কোনো রকম চিন্তা ভিতরে আসবে না– এ-ই হল আসল ইখ্লাস।

অনেক সময় শয়তান এভাবেও পরহেযগারির চেতনা এনে দেয় যে, একটা আমল খুব ভালভাবে করতে বলে। কিন্তু এর পেছনে তার উদ্দেশ্য থাকে খারাপ। যেমন: কেউ উযূ করছে। শয়তান ওয়াছওয়াছা দিবে অমুক অঙ্গটা তিনবার ধোয়ার পরও বোধ হয় কোথাও একটু শুকনো থেকে যেতে পারে। যদি শুকনো থেকেই যায় তাহলে তো নামায হবে না। তাই আরও একবার ধুয়ে নেয়া চাই। বাহ্যিকভাবে মনে হবে এটা পরহেযগারির চেতনা। কিন্তু এখানে শয়তানের উদ্দেশ্য থাকে খারাপ। সে চায় এই চেতনার ফলে সে সেই অঙ্গটাকে তিনবারের বেশি ধৌত করুক। আর এভাবে তার উযূ মাকরূহ হয়ে যাক। কিংবা চায় এভাবে এক একটা অঙ্গের পেছনে প্রচুর সময় অতিবাহিত হোক আর ইতিমধ্যে জামাতের নামায শুরু হয়ে যাক তাহলে এই লোকের তাকবীরে উলা ফওত হয়ে যাবে। কিংবা আরও বেশিক্ষণ উযূতে ধরে রাখতে পারলে তার জামাতের কয়েক রাকআত বা পূরো জামাতই ফওত হয়ে যাবে।

অমুক অঙ্গ ঠিকমত ধোয়া হয়নি, অমুক অঙ্গে ঠিকমত পানি পৌছায়নি– এভাবে বলে বলে শয়তান ওয়াছওয়াছার রোগ সৃষ্টি করতে চায়। আর একবার ওয়াছওয়াছার রোগ সৃষ্টি হলে তখন অবস্থা এমনও দাঁড়াতে পারে যে, শত সাবধানে বরং শত কসরৎ করে উযূ করার পরও নামাযে দাঁড়ালে আবার ওয়াছওয়াছা হবে যে, উযূ তো ঠিকমত হয়নি,

অমুক জায়গায় সমস্যা রয়ে গেছে। তখন নামায ছেড়ে দিয়ে আবার উযূতে যাবে। তাই যে অঙ্গ যে কয়বার ধোয়া বা মাসেহ করার নিয়ম তার চেয়ে বেশি করতে যাবেন না, তাতে ওয়াছওয়াছার রোগ দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

নামাযের মধ্যেও শয়তান অতি পরহেযগারির চেতনা এনে দিয়ে নামাযকে ত্রুটিপূর্ণ করে দিয়ে থাকে। যেমন: রুকূতে পুরুষের জন্য কমর, মাথা ও পিঠ বরাবর রাখা সুন্নাত। এখন একজন লোকের কমর মাথা ও পিঠ সোজা হওয়া সত্ত্বেও শয়তান তাকে ওয়াছওয়াছা দিবে আরে কমর মাথা পিঠ ঠিকমত সোজা হয়নি, সামনের অংশ আরও বেশি ঝোঁকানো দরকার, নইলে সুন্নাত তরীকা মোতাবেক রুকূ হবে না। তখন লোকটা অসচেতন হয়ে থাকলে এই ওয়াছওয়াছায় সে মাথা আরও নত করে দিবে। এভাবে অতি পরহেযগারির চেতনা এনে দিয়ে শয়তান তার নামাযকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। আরও উদাহরণ নিন। ইমাম না হলে নামাযের কেরাত, এমনিভাবে সকলের জন্যই নামাযের তাসবীহ, দুআ দুরূদ ইত্যাদি এতটুকু শব্দে পড়তে হয় যেন স্বাভাবিক পরিবেশ হলে নিজের কানে তা শোনা যায়– এভাবে পড়াই অধিকতর সহীহ মত। এখন শয়তান ওয়াছওয়াছা দিবে আরও একটু জোরে না পড়লে তো কানে শোনার মত হল না। তাহলে তো অধিকতর সহীহ মতের উপর আমল হল না। তখন নামাযী সচেতন না হলে আরও জোরে পড়ে পড়ে অন্য নামাযীদের নামাযে ব্যঘাত ঘটানোর পাপে জড়িয়ে পড়ে। শয়তান এভাবেও অতি পরহেযগারির চেতনা এনে দিয়ে খারাবীর দিকে নিয়ে যায়।

অনেক সময় কোন কোন লোক নামায শুরু করার জন্য হয়তো তাকবীরে উলা বলেছে, তারপর ওয়াছওয়াছা হল ভালভাবে বলা হয়নি। সে আবার আল্লাহু আকবার বলল, আবার ওয়াছওয়াছা হওয়ায় আবার বলল, এভাবে হয়তো বলতে থাকল আর ইতিমধ্যে ইমাম রুকুতে চলে গেলেন। তখন সে তড়িঘটি রুকুতে গেল। তবে ওয়াছওয়াছার আবর্তে পড়ে থাকার কারণে সে কেরাত শোনার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হল।

অনেকে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে থাকে। তাদের কারও কারও ওয়াছওয়াছা হয়, বুঝি নিয়ত হয়নি, আবার নিয়তের শব্দগুলো বলে, আবার ওয়াছওয়াছা হওয়ায় আবার বলে, এভাবে বলতে থাকে, বলতে থাকে। এভাবে সে নিয়তের শব্দের পালায় পড়ে তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

তাকে তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত করার জন্যই শয়তান এই ওয়াছওয়াছা দেয় যে, নিয়ত সুন্দর করে তো বলা হল না। অথচ নিয়ত বলা তথা মুখে উচ্চারণ করা মোটেই জরুরি বিষয় ছিল না। মনের মধ্যে নামায পড়ার যে চিন্তা সেটাই নিয়ত। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়।

এই অতি পরহেযগারির ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার উপায় হল সদা সচেতন থাকা। সর্বদাই মনে রাখতে হবে সব ইবাদতই অতি সুন্দরভাবে হওয়া কাম্য, কিন্তু অতি সুন্দর করতে গিয়ে যেন খারাপ হয়ে না যায়। আরও মনে রাখতে হবে ইবাদত ইত্যাদি সুন্দরভাবে হওয়া সত্ত্বেও এই চিন্তা যে, আমার এই আমল বুঝি সুন্দর হচ্ছে না, ঐই আমল বুঝি সুন্দর হচ্ছে না– এভাবে ওয়াছওয়াছার রোগ যেন দাঁড়িয়ে না যায়।

ওয়াছওয়াছার রোগের ব্যাপারে সাবধান!

খুব সাবধান থাকা চাই যেন কোনোভাবেই ওয়াছওয়াছার রোগ দাঁড়াতে না পারে। ওয়াছওয়াছার রোগ দাঁড়িয়ে গেলে ইবাদত-বন্দেগী করা ও শরীয়তের উপর চলা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। একবার ওয়াছওয়াছার রোগ দাঁড়িয়ে গেলে ইবাদত-বন্দেগী করা ও শরীয়তের উপর চলা কত কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তার কিছু বিবরণ পূর্বে প্রদান করা হয়েছে। আরও একটু বিবরণ শুনুন। তিনটা ঘটনা বলি। সবগুলোই বাস্তব ঘটনা।

ঘটনা নং এক. আমি তখন মালিবাগ জামেয়ার ছাত্র। জামেয়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ছিল ওয়াছওয়াছার রোগ। তিনি উযূ করার সময় হাত ধুতে যেয়ে হাতে এত বেশি মর্দন করতেন এবং এত জোরে জোরে মর্দন করতেন যেন রীতিমত হাতের সাথে ধস্তাধস্তি করছেন। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত লোমের কোন নিশানাও বাকি ছিল না। আর মাথায় মাসেহ করার সিস্টেম তো ছিল ঐতিহাসিক। ভিজানো হাত মাথায় ফিরালে যদি চুলে সে ভিজা না লাগে, তাই প্রথমে কিছুদিন দুই হাতের কোষ ভরে পানি তুলে সেই পানি মাথার উপর ছেড়ে দিতেন, পাছে আবার মাথার কোথাও শুকনো থেকে না যায়। তারপর সন্দেহ আরও আগে বেড়ে এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল যে, হাতের কোষ ভরে পানি মাথার উপর ছাড়লেও সন্দেহ যাচ্ছে না। তখন উযূর সময় হাউজের পাড়ে যখন যেতেন সঙ্গে নিতেন টিফিনক্যারিয়ারের একটা বাটি। মাথায় মাসেহের সময় এলে হাউজ থেকে

বাটির পর বাটি ভরে মাথায় পানি ঢালতে থাকতেন। মাসেহ করা কাকে বলে, মাসেহ হবে না, মাসেহের বাপ হবে! এতকিছুর পরও মাঝে মধ্যে দেখা যেত জামাতে নামাযে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ নামায ছেড়ে দিয়ে আবার হাউজের পাড়ে।

ঘটনা নং দুই. একজন আলেমের মুখে ঢাকার লালবাগ শাহী মসজিদের এক মুসল্লীর ঘটনা শুনেছি। সেই মুসল্লী নামাযে নিয়ত বাঁধার সময় খুব সুন্দর করে আল্লাহু আকবার বলার পরও তার ওয়াছওয়াছা থেকে যেত কি জানি ঠিকমত বলা হল কি না? তাকবীরে তাহরীমা তো ফরয, সেটাই যদি ঠিকমত না হয়, তাহলে নামাযের কী দশা হবে? আবার তিনি খুব জোরে জোরে টেনে টেনে আল্লাহু আকবার বলছেন, এভাবে কতবার যে আল্লাহু আকবার বলছেন, তার কোন ইয়ত্তা নেই। ইতিমধ্যে হয়তো ইমাম সাহেব অনেক দূর এগিয়ে গেছেন আর লোকটা তাকবীরে উলার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাকবীরে তাহরীমার আল্লাহু আকবার বলার আগেও তার সমস্যা ছিল। সে সমস্যা ছিল রীতিমত হাস্যকর। নিয়তের সময় "ইক্তাদাইতু বিহাযাল ইমাম" (অর্থাৎ, আমি এই ইমামের পেছনে এক্তেদা করছি।) জোরে জোরেই বলতেন, কিন্তু সন্দেহ হত "এই ইমাম" বলে যার দিকে ইশারা করছি, সেই ইশারা আবার অন্যদিকে চলে গেল কি না। তাই ইমামের পেছনে বরাবর দাঁড়াতেন আর "বিহাযাল ইমাম" (অর্থাৎ, এই ইমামের পেছনে) বলার সময় রীতিমত হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে আঙ্গুল দিয়ে ইমামের দিকে ইশারা করে তারপর হাত বাঁধতেন। এক সময় তাতেও সন্দেহ থেকে যেতে লাগল, হাতের ইশারা অন্য দিকে হয়ে যায় না তো? তাই সেই সন্দেহ দূর করার জন্য "বিহাযাল ইমাম" বলার সময় হাত দিয়ে ইমামের পিঠে একটা খোঁচা দিয়ে তারপর নিয়ত বাঁধতেন। ইশারা আবার অন্যদিকে যাবে?

ঘটনা নং তিন. আমাদের পরিচিত একজন আলেমের ঘটনা। তিনি তার মাদ্রাসা থেকে হাঁটা পথে তিন মিনিট দূরত্বে এক মসজিদে ইমামত করতেন। বর্ষার সময় এলে যদি রাস্তার পানি ছিটে পাজামায় লাগে, তাই মসজিদে গিয়ে পাজামা পরিবর্তন করে নামায পড়াতেন। যদিও মাসআলা অনুযায়ী এরূপ রাস্তার পানিতে নিশ্চিত নাপাকী দেখা না গেলে আর সে পানি শরীর বা কাপড়ে লাগলে তাতে শরীর বা কাপড়

www.maktabatulabrar.com

নাপাক হয়ে গেছে ধরা হয় না, তা পাল্টানোর কষ্ট সওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শীতের সময় পায়ে চামড়ার মোজা থাকলে মাদ্রাসায় ফিরে এসে তিনি সে মোজা রীতিমত পানি দিয়ে ধুয়ে নিতেন। একদিন আমি তার হুশ ফিরানোর জন্য বললাম, হযরত! শুধু পানি দিয়ে মোজা ধুলে কি মোজা পাক হবে? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কী করতে হবে? আমি বললাম, সাবান দিয়ে ভাল করে ধুতে হবে। তিনি মনে করলেন আমি বুঝি সত্যি সত্যিই বলছি। তখন আমি আবার বললাম, না শুধু সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলেই পাক হবে না। কারণ নাপাক পানি যদি চামড়ার মোজার মধ্যে শোষিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে উপর দিয়ে ধুলে তা পাক হবে কীকরে? তাই সাবানের পানির মধ্যে মোজা দীর্ঘক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর ভাল করে নিংড়িয়ে ফেলতে হবে। এভাবে তিনবার না করলে মোজা পাক হবে না, মোজার দশা যা-ই হোক না কেন। তখন তিনি বুঝলেন আমি তাকে ক্ষেপানোর জন্যই এমনটা বলছি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম হযরত! নাপাক কাপড় তিনবার কীকরে ধোন? তিনি বললেন, একবার বালতিতে পানি নিয়ে কাপড় ধুয়ে সে পানি ফেলে দেই। আবার পানি নিয়ে দ্বিতীয়বার ধুই। এভাবে তিনবার ধুই। আমি বললাম, একবার যখন বালতিতে নাপাক কাপড় ধোয়া হয় তখন তো বালতির সেই পানিও নাপাক হয়ে যায়, আর সেই নাপাক পানি বালতির গায়ে লেগে যায়, তাই বালতির পানি ফেলে দিলেও তো বালতির গায়ে নাপাক পানি লাগা থেকে গেল। সেই অবস্থায় ঐ বালতিতে নতুন পানি নিলে সেই পানিও তো বালতির গায়ে লেগে থাকা নাপাক পানির সঙ্গে মিশে নাপাক হয়ে যাবে। তাহলে আপনি কীভাবে কাপড় পাক করবেন? তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। আমি বললাম, হুজূর! শরীয়ত এত কঠিন নয়। বালতির পানি ফেলে দেয়ার পর তার গায়ে লেগে থাকা পানি যুক্তি অনুসারে নাপাক হলেও শরীয়তে তা মাফ। এমনিভাবে চামড়ার মোজার গায়ে নাপাকি লাগলে উপর থেকে মুছে নিলেও তা পাক হয়ে গেছে ধরা হবে, যদিও ভেতরে নাপাকী শোষিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেটা মাফ। শরীয়তকে অযথা কঠিন করতে নেই। তাহলে শরীয়তের উপর চলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আপনি কি এ হাদীছ পড়েননি?

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. الحديث.» (رواه البخاري برقم ٣٩)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দ্বীন সহজ, কেউ দ্বীনকে কঠিন করলে সে অপারগ হয়ে পড়বে। (বোখারী: হাদীছ নং ৩৯)

এ হাদীছে দ্বীনকে কঠিন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, দ্বীনকে কঠিন করলে এক পর্যায়ে গিয়ে অপারগ হয়ে পড়তে হয়।

কৌশল নং ৭: ভাল হওয়া সম্ভব নয়– এই ধারণা দেয়া।

শয়তানের নিত্য কৌশলের আর একটা হল– ভাল হওয়া সম্ভব নয়– এই ধারণা দেয়া। শয়তানের এরূপ ওয়াছওয়াছার ফলেই অনেকের মনে হয় আমি এত অন্যায় করেছি, জীবনে এতসব জঘন্য কাজ করেছি, না, আমার পক্ষে আর ভাল হওয়া সম্ভব নয়! এভাবে সে ভাল হওয়ার চিন্তা থেকে বহু পিছনে হটে যায়। অথচ হাজার খারাপ হওয়ার পরও যে ভাল হওয়া সম্ভব তার প্রমাণও রয়েছে হাজার হাজার মানুষের জীবন। তার মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ফুযায়েল ইবনে ইয়াজ (রহ.)–এর ঘটনা। তিনি ছিলেন ডাকাতের সর্দার। একবার গভীর রাতে ডাকাতি করার জন্য দলবল নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। পথিমধ্যে এক জীর্ণ কুঠিরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলেন তার মধ্যে একজন তাহাজ্জুদের নামাযে তেলাওয়াত করছেন,

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.﴾

(এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে– জীবনের এত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও, এত দলীল-প্রমাণ থাকার পরও কি মুমিনদের সময় হয়নি যে, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য তাদের দিল নরম হবে? এরপরও আহলে কিতাবদের দিল যেমন শক্ত রয়ে গেছে তেমনই দিল শক্ত রয়ে যাবে? তাদের মত অবাধ্য রয়ে যাবে? তাদের অধিকাংশই তো অবাধ্য। তাদের

www.maktabatulabrar.com

পথ পরিহার করার সময় কি হয়নি?) হযরত ফুযায়েল ইবনে ইয়াজ (রহ.) আয়াতের তেলাওয়াত শুনে এবং তার মর্মার্থ অনুধাবন করে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, হাঁ আমার সময় হয়েছে! হাঁ আমার দিল নরম হওয়ার মুহূর্ত এসে গেছে! তারপর সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার, আমি এখন থেকে আর ডাকাতির কাজে যাব না। তিনি ভাল হওয়ার পথ সন্ধান করতে করতে বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত খাজা আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)–এর সন্ধান লাভ করে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় নিমগ্ন হলেন এবং বিখ্যাত বুযুর্গে পরিণত হলেন।

হাজার খারাপ হওয়ার পরও যে ভাল হওয়ার চেষ্টা করতে হয় এবং চেষ্টা করতে করতে ভাল হওয়ার আগে মরে গেলেও আল্লাহর কাছে ভাল প্রতিপন্ন হওয়া যায় তার একটা প্রমাণ হল মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত একটি ঘটনা। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনাটি বয়ান করেছেন। ঘটনাটি এরূপ– পূর্বের যুগে একজন লোক ৯৯টা খুন করেছিল, তারপর লোকটির মনে হল, আমি ভাল হতে চাই। তাই সে ঐ যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানীর সন্ধান করছিল। এক পর্যায়ে লোকেরা তাকে এক খৃষ্টান পণ্ডিতের সন্ধান দিল। সে উক্ত খৃষ্টান পণ্ডিতের কাছে গিয়ে নিজের অবস্থা জানিয়ে বলল, আমি ভাল হতে চাই, আমার ক্ষমা পাওয়ার কোন সুযোগ আছে কি না? পণ্ডিত বলল, সর্বনাশ তুমি ৯৯টা খুন করেছ! তোমার মত মানুষের ভাল হওয়ার আর কোনো পথ নেই, তোমার ক্ষমা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লোকটি ভাবল যখন ভাল হওয়ার কোনোই পথ নেই, তখন খুনের সংখ্যা ১০০টা পুরো করে ফেলি। এই ভেবে সে উক্ত পণ্ডিতকেও খুন করল। এভাবে তার খুনের সংখ্যা ১০০টা পুরো হয়ে গেল। এরপর সে লোকজনের কাছে আবার জিজ্ঞেস করতে থাকল, সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে আছে? অবশেষে একজন বড় জ্ঞানীর সন্ধান পেয়ে তার কাছে সে গেল এবং সব ঘটনা খুলে বলল। জ্ঞানী লোকটি বলল, কে তোমার তওবার পথ বন্ধ করতে পারে? তুমি যে এলাকায় থেকে, যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে খারাপ হয়েছ, সেই এলাকা ছেড়ে অমুক এলাকায় চলে যাও যেখানে নেককার-পরহেয্‌গার লোকেরা বসবাস করে। লোকটি সেদিকে যাওয়া শুরু করল, মাঝপথে হযরত আজরাঈল (আ.) সামনে এসে পড়লেন। আজরাঈলকে দেখে সে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু ভাবল

আমি ভাল হওয়ার জন্য যেদিকে যাচ্ছি যতক্ষণ জীবন আছে আমি সে দিকে এগুতে থাকব। তখন বুক ঘষে ঘষে আরও কিছুটা অগ্রসর হল। ইতিমধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ভাল লোকের ইন্তেকাল হলে খুবসূরত রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে যান। আর খারাপ লোকের মৃত্যু হলে বদসূরত, কুৎসিত ভয়ংকর রূপের আযাবের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে যান। এখন এই লোকটির রূহ্ কারা নিবে এ নিয়ে রহ্মতের ফেরেশতা আর আযাবের ফেরেশতার মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। রহ্মতের ফেরেশতারা বললেন, তার রূহ আমরা নিব। কারণ সে তওবার উদ্দেশ্যে এসেছিল। অতএব তাকে ভাল বলে গণ্য করতে হবে। আযাবের ফেরেশতারা বললেন, সে জীবনে কোনো নেক কাজ করেনি, অতএব তাকে খারাপই গণ্য করতে হবে, কাজেই আমরা তার রূহ্ নিব। তখন আল্লাহ্ তাআলা অন্য এক ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। তিনি এসে ফয়সালা দিলেন, সে যে এলাকা থেকে এসেছে এবং যে এলাকায় যাচ্ছিল, উভয় এলাকার মধ্যে মাপ দেয়া হোক। লোকটি যে এলাকার নিকটবর্তী তাকে সে এলাকার গণ্য করা হবে। মাপ দেয়া হল এবং দেখা গেল যেদিকে সে যাচ্ছিল, সেদিকে সামান্য একটু অগ্রসর। ফলে রহ্মতের ফেরেশতারা তার রূহ্ নিয়ে গেলেন। সম্ভবত এই সামান্য পরিমাণ যেটুকু সে অগ্রসর ছিল, সেটা হল ঐ জায়গাটুকু যেটুকু সে বুক ঘষে অগ্রসর হয়েছিল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনার মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাহল- (১) জীবনে হাজার খারাপ করার পরও ভাল হওয়ার চেষ্টা বাদ দিতে নেই। (২) ভাল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। জানা নেই শেষ মুহূর্তের কোন একটা আমলও নাজাতের ওছীলা হতে পারে। হতে পারে ঐসময় সামান্যতম যা কিছু করা হবে সেটার কারণেই কল্যাণের ফয়সালা হয়ে যাবে। (৩) এ ঘটনার সব চেয়ে বড় শিক্ষা হল- ভাল হতে চাইলে ভাল লোকদের কাছে যেতে হবে। ভাল লোকদের কাছে গেলেই মানুষ ভাল হতে পারে। খারাপ লোকদের কাছে থেকে ভাল হওয়া বেশ কঠিন (৪) এ ঘটনার আর একটা বড় শিক্ষা হল মানুষ যত পাপই করুক না কেন তার জন্য তওবার দরজা খোলা থাকে। আল্লাহ্র নিকট তওবার দরজা তথা ক্ষমা পাওয়ার দরজা কখনও বন্ধ হয় না। ফার্সী কবিতায় বলা হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

این درگاه ما درگاه نامید نیست + صد بار اگر توبہ شکستی باز آ باز آ

অর্থাৎ, আমার এই দরবার হতাশ হওয়ার দরবার নয়, শতবার যদি তওবা ভঙ্গ করে থাক তবুও ফিরে আস, তবুও ফিরে আস। এখানে শতবার বলে ঠিক একশত বার বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং বোঝানো উদ্দেশ্য যত বেশিবারই অপরাধ হয়ে যাক না কেন, তোমার জন্য তওবার দরজা বন্ধ নয়, বরং খোলা।

কৌশল নং ৮ঃ অহংকার বা আত্মগর্ব উস্কে দেয়া।

শয়তানের নিত্য কৌশলের আর একটা হল- অহংকার বা আত্মগর্ব উস্কে দেয়া। চারিত্রিক ক্ষেত্রে নষ্ট করার জন্য এই কৌশল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পূর্বের যে কয়টা কৌশল সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা হল ইবাদত-বন্দেগী থেকে সরানোর জন্য শয়তানের গৃহীত কৌশল। আর এটা হল ইবাদত-বন্দেগী থেকে সরানোর সাথে সাথে ভাল আখলাক-চরিত্র থেকেও সরানোর জন্য শয়তানের গৃহীত কৌশল। শয়তান অহংকার বা আত্মগর্ব উস্কে দেয়ার মাধ্যমে মানুষকে উত্তম আখলাক-চরিত্র থেকে বিচ্যুত করে দেয়। অহংকার বা আত্মগর্ব মানুষকে যেমন ঈমান ও আমল-বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি অনেক চরিত্র-বিরোধী কাজেও উদ্বুদ্ধ করে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় অহংকার বা নিজের বড়ত্ববোধের কারণে নিম্নোক্ত খারাবীসমূহ দেখা দিয়ে থাকে।

- অহংকারের ফলেই মানুষ হককে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে থাকে। এই অহংকারের ফলেই ইবলীছ হযরত আদম (আ.)কে সাজদার বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিল।
- যখন মানুষের মধ্যে আমি বড়- এই চেতনা উস্কে ওঠে, তখন সে অন্যকে তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করে থাকে।
- যখন মানুষের মধ্যে আমি বড়- এই চেতনা উস্কে ওঠে, তখন সে অন্যকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান থেকে বিরত থাকে।
- এই অহংকার বা বড়ত্ববোধ থেকেই মানুষের মধ্যে অন্যের সমালোচনার প্রবৃত্তি জাগে। সমালোচনার সময় এই মনোভাবই কাজ করে যে, অমুকের মধ্যে এই দোষ সেই দোষ, আমার মধ্যে এসব দোষ নেই, অতএব আমি তার চেয়ে ভাল। এভাবে নিজের ভালত্ব বা বড়ত্বের মনোভাব থেকেই অন্যের সমালোচনার প্রবৃত্তি জাগে।

- এই বড়ত্ববোধ থেকেই মানুষের মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগে যে, আমার সাথে এই আচরণ, আমি ওকে দেখে নেব!
- এই বড়ত্ববোধ থেকেই স্পৃহা জাগে যে, আমাকে উপরে থাকতেই হবে, তার জন্য প্রয়োজনে প্রতিপক্ষকে যেভাবে হোক দমন করতেই হবে, এমনকি তাকে খুন করে হলেও।
- এই বড়ত্ববোধের কারণেই যখন কারও সামনে অন্য কারও প্রশংসা বা গুণগান হয় তখন তার গায়ে জ্বালা ধরে, তার প্রতি হিংসা জাগে।
- এই বড়ত্ববোধের কারণেই কারও ভাল কিছু দেখলে তার মধ্যে হাছাদ বা পরশ্রীকাতরতা দেখা দেয় এই ভেবে যে, ও আমার উপর উঠে গেল!

এভাবে অহংকার ও আত্মগর্বের ফলে মানুষ ঈমান, আমল ও আখলাক-চরিত্র থেকে বহু দূরে সরে যায়।

তাকাব্বুর বা অহংকারের ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার উপায়

এই অহংকারের ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার উপায় হল নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করে তাওয়াজু বা বিনয় অবলম্বন করা। আর নিজের কোন গুণ বা কৃতিত্বের কথা স্মরণ হলে সেটাকে আল্লাহর দান মনে করে সেই দানকারীর উদ্দেশ্যে মাথা নত করে দেয়া।

বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অহংকার থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহ বলেছেন,

১. নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যে, আমি নাপাক পানি থেকে তৈরী এবং বর্তমানেও আমার পেটে নাপাক ভরা, চোখে মুখে ও নাকের ভিতর ময়লা ভরা। আর মৃত্যুর পর আমার সবকিছু পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। ইত্যাদি।

২. এ কথা চিন্তা করা যে, সমস্ত গুণ মূলত আল্লাহ্‌রই একান্ত দান, আমার বুদ্ধি বা বাহু বলে তা অর্জিত হয়নি, নতুবা আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারেনি। অতএব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যা অর্জিত হয়েছে তার জন্য আমার অহংকার বা বড়ত্ববোধ করা বোকামি বৈ কি? বরং এর জন্য আল্লাহ্‌র সামনে আমার বিনয়ী হওয়া উচিত।

www.maktabatulabrar.com

৩. যাকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হবে, মনে না চাইলেও জোর- জবরদস্তী তার সাথে নম্র ব্যবহার করতে হবে।

৪. অভাবী ও গরীব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বেশি উঠা-বসা রাখতে হবে।

৫. মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে।

৬. নিজের দোষ-ত্রুটি, নিন্দা-অপবাদ শুনেও প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. ক্রোধ প্রকাশ পেলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে (ছোটদের থেকে হলেও)।

৮. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের ছোট-খাট কাজ নিজেই করতে হবে, সেসব কাজে মজদুর বা চাকর-নওকর লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯. সকলকে আগে সালাম দিতে হবে।

১০. তাকাব্বুর দূর করার সবচেয়ে উত্তম ও সহজ পন্থা হল তাকাব্বুরের ধরন ও বিবরণ জানিয়ে হক্কানী পীর ও শায়খে তরীকত থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা। কারণ নিজে তাকাব্বুরের ধরন ও প্রতিকারের পন্থা বুঝতে অনেক সময় কঠিন হয়ে থাকে।

উজ্‌ব বা আত্মগর্ব থেকে বাঁচার উপায়

তাকাব্বুর বা অহংকারের কাছাকাছি আর একটা জিনিস রয়েছে। তা হল উজ্‌ব তথা আত্মগর্ব। তাকাব্বুর বা অহংকার হল নিজেকে বড় মনে করার সাথে সাথে অন্যকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করা। আর কেউ যদি কোন বিষয়ে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করে শুধু নিজেকে বড় মনে করে গর্ববোধ করে, তাহলে সেটাকে বলা হয় উজ্‌ব বা আত্মগর্ব। আত্মগর্ব করাও গোনাহে কবীরা।

বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উজ্‌ব বা আত্মগর্ব থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহ বলেছেন,

১. নিজের দোষ-ত্রুটি চিন্তা করে দেখা।

২. গুণকে আল্লাহ্‌র দান মনে করা।

৩. উক্ত দানের জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা।

৪. এই আশংকা রাখা যে, আল্লাহ্‌র শক্তি আছে যেকোনো সময় তিনি এটা ছিনিয়ে নিতে পারেন।

৫. দুআ করা যেন আল্লাহ উক্ত দান থেকে মাহরূম না করেন, সেটা যেন ছিনিয়ে না নেন।

কৌশল নং ৯: বারংবার একই বিষয়ে ওয়াছওয়াছা দেয়া।

শয়তানের নিত্য কৌশলের আর একটা হল– বারংবার একই বিষয়ে ওয়াছওয়াছা দেয়া। যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, শয়তান ঈমান-সম্পর্কিত বিষয়ে বারবার ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে। বলে থাকে, আসলেই আল্লাহ আছেন কি? আসলেই কবরের আযাব বলে কিছু আছে কি? আসলেই জান্নাত জাহান্নাম আছে কি? ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে শয়তানের মোকাবেলা করার পদ্ধতিও পূর্বে বলা হয়েছে যে, একবার এসব ওয়াছওয়াছার জবাব দিয়ে দিন। এসব ওয়াছওয়াছার জবাব কি তা পূর্বে বলা হয়েছে। সেভাবে একবার জবাব দিন, তারপর পুনরায় যখনই এবং যতবারই এসব বিষয়ে ওয়াছওয়াছা হবে তখন শুধু মনকে লক্ষ্য করে বলবেন, এর জবাব তো পূর্বে দিয়েছি, আবার জবাব দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। "আমান্তু বিল্লাহ (এসব ব্যাপারে আমি যথাযথ ঈমান রাখি)। ব্যস এই বলেই অন্য কোন কাজে বা অন্য কোন চিন্তায় লিপ্ত হবেন। নফ্‌ছ ও শয়তান যতই আপনার পা চাটুক, যতই ঘ্যানর ঘ্যানর করুক আর কখনও এগুলোর জবাব দিতে প্রবৃত্ত হবেন না।

এমনিভাবে যত ধরনের নেক আমল রয়েছে তা না করার জন্য এবং বিভিন্ন রকম পাপ কাজ করার জন্য শয়তান বারংবার ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে। এমন হয় না যে, একবার ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করে কোন নেক কাজ সম্পন্ন করলে কিংবা একবার ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করে কোন পাপ থেকে বিরত থাকলে ভবিষ্যতে সে ব্যাপারে শয়তান আর ওয়াছওয়াছা দিবে না। শয়তানের ওয়াছওয়াছা উপেক্ষা করা হল, এতে তার শরম লাগার কথা ছিল, কিন্তু শয়তানের হায়া-শরম নেই। সবচেয়ে বড় মুহ্‌ছিন তথা অনুগ্রহকারী আল্লাহর মুখের সামনে তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে যার শরম লাগেনি, মানুষের বেলায় তার আবার শরম কিসের? তাই তার ওয়াছওয়াছা উপেক্ষিত হলেও সে ওয়াছওয়াছা অব্যাহত রাখে। সুতরাং এসব ওয়াছওয়াছা কখনও বন্ধ বা নির্মূল করা যাবে না। নির্মূল করার চিন্তার দরকারও নেই। বরং সর্বদাই শয়তান এসব ওয়াছওয়াছা

www.maktabatulabrar.com

দিতে থাকুক আর আপনি সেই ওয়াছওয়াছা উপেক্ষা করে যথাযথভাবে নেক আমলগুলো সম্পাদন করে যেতে থাকুন আর পাপ কাজগুলো থেকে বিরত রইতে থাকুন। এভাবে নেক আমল করার সাথে সাথে নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মুজাহাদা করার ছওয়াবও হাছেল করতে থাকুন। নফ্‌ছ ও শয়তান যদি এসব ওয়াছওয়াছা বন্ধ করে দেয় তাতে বরং আপনি মুজাহাদা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, মুজাহাদার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই এসব বিষয়ে ওয়াছওয়াছা হলেই মনকে বলুন, এই তো নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মুজাহাদা করার সুযোগ এসে গেছে, এবার আমি নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মুজাহাদা করে মুজাহাদার ফায়দা হাসেল করতে চাই। এই বলে সংশ্লিষ্ট বিষয় করণীয় নেক আমল হলে সেগুলো সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করুন, আর পাপ বিষয় হলে তা থেকে বিরত থাকুন। তাতে সংশ্লিষ্ট নেক আমলের ছওয়াবের সাথে সাথে নফ্‌ছের সাথে মুজাহাদার ছওয়াব ও অর্জিত হবে।

কৌশল নং ১০: তাড়াহুড়োর মনোভাব এনে দেয়া।

শয়তানের নিত্য কৌশলের আর একটা হল– যেকোনো ইবাদত শুরু করলে তাড়াহুড়োর মনোভাব এনে দেয়া। যেমন: আপনি নামাযে দাঁড়িয়েছেন। মনের মধ্যে অহেতুক তাড়াহুড়োর মনোভাব জাগবে। মনে হবে কত কাজ রয়ে গেছে! নামায পড়ে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, এক কাপ চা না খেলে তো আর চলছেই না, একটা পান মুখে পুরতে না পারলে তো মস্তিষ্ক সজীবই হচ্ছে না, চুরোটে একটা টান দিতে না পারলে যে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল, দোকানে কত কাষ্টমার ভীড় করে আছে, অফিসে কত লোক কাজ নিয়ে বসে আছে, জরুরী মুতালাআ রয়েছে, লেখার মত কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মাথার মধ্যে রয়েছে, এখনই লিখে নেয়া চাই, একটু হিসেব বাকি রয়েছে, ওটা শেষ করতে পারলেই আজকের কাজের ঝামেলা মিটে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু নামাযের ক্ষেত্রে নয়, তেলাওয়াত করতে বসেছেন, ওয়াজ-নসীহত শুনতে বসেছেন, ওজিফা আদায় করতে বসেছেন, ধর্মীয় বইপত্র পড়তে শুরু করেছেন– এসব ক্ষেত্রেও আপনার মধ্যে নানান অজুহাতে তাড়াহুড়োর মনোভাব জাগ্রত হবে। নানান ব্যস্ততার কথা মনে আসবে। আসলে এই যে চা পান

চুরোটের চিন্তা, হিসেব নিকেশ ইত্যাদির চিন্তা– এগুলো প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যস্ততাই নয়। এ বিষয়গুলো এমন যা পাঁচ দশ মিনিট পরে করলেও তেমন কোন অসুবিধে হয় না। মনকে বলুন, আচ্ছা! ধীরে সুস্থে নামাযটা আদায় করতে না হয় পাঁচ মিনিট বিলম্ব হবে, তাতে এমন কোনই ক্ষতি হবে না। এগুলো পাঁচ মিনিট পরে করলেও চলবে। মনকে আরও বলুন, প্রকৃতপক্ষে আমার কোনই ব্যস্ততা নেই, অহেতুকই আমি ব্যস্ততা অনুভব করছি। এরূপ চিন্তা করলে দেখবেন সত্যিই আপনার মন থেকে ব্যস্ততার অনুভূতি বিলীন হয়ে গেছে।

কৌশল নং ১১: যেকোনো মূল্যে ধন-সম্পদ বৃদ্ধির ওয়াছওয়াছা।

শয়তানের নিত্য কৌশলের আর একটা হল– যেকোনো মূল্যে হোক ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করার ওয়াছওয়াছা দেয়া। অর্থাৎ, দুনিয়া ও মালের মহব্বত অন্তরে খুব আকর্ষণীয় করে তোলা। অন্তরে টাকা-পয়সার লোভকে বল্গাহীন করে দেয়া। অথচ টাকা-পয়সার লোভ এত বড় খারাপ জিনিস যে, একবার তা মনে ঢুকলে সেখানে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ থাকতে পারে না। এমনিভাবে ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা, আসবাব-পত্র, কাপড়-চোপড়, ইত্যাদির মহব্বত এক কথায় দুনিয়ার মহব্বত তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সবকিছুর মহব্বত এমন এক জঞ্জাল, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত থাকতে পারে না। এই দুনিয়ার মহব্বতের কারণে মানুষ হক-নাহক, হারাম হালাল ও সত্য-মিথ্যার বিচার হারিয়ে ফেলে। এমনকি মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ঈমানহারা অবস্থায়ও মৃত্যুবরণ করতে পারে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা।

তবে উল্লেখ্য যে, ধন-সম্পদ, মাল-আসবাব ইত্যাদির প্রতি স্বভাবগতভাবে মানুষের কিছু আকর্ষণ থাকে। এটা শরীআতে নিন্দনীয় নয়। এমনিভাবে শরীআতসম্মত পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জন করাও নিন্দনীয় নয়, বরং নিন্দনীয় হল যদি কেউ সম্পদের প্রতি মনের আকর্ষণকে এতটা বল্গাহীন ছেড়ে দেয় বা এমনভাবে সম্পদ উপার্জনে মত্ত হয় যে, আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকামের পরোয়া থাকে না এবং আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের আদর্শের চেয়ে সেটাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। শয়তানই মনের মধ্যে ওয়াছওয়াছা দিয়ে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ ও মাল-আসবাবের আকর্ষণকে মনের কাছে বল্গাহীন করে দেয়।

www.maktabatulabrar.com

এই ওয়াছওয়াছার প্রতিকার হল:

১. এ সবকিছু একদিন ছেড়ে যেতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে– একথা বেশি বেশি স্মরণ করা।
২. ব্যবসা-বাণিজ্য, জায়গা-জমি, আসবাবপত্র, মানুষের সঙ্গে দুস্তী-মহব্বত, আলাপ-পরিচয় জরূরতের চেয়ে বেশি না করা।
৩. অপব্যয় না করা। কেননা অপব্যয় থেকে আয় বৃদ্ধির লোভ জন্মে।
৪. সাধারণ খাওয়া-পরার অভ্যাস করা।
৫. দরিদ্রদের সংসর্গ গ্রহণ ও ধনীদের সংসর্গ বর্জন করা।
৬. দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গদের জীবনী পাঠ করা।
৭. যে জিনিসের প্রতি মন বেশি লেগে যায়, তা হয় কাউকে দিয়ে দেয়া (দান স্বরূপ দিতে মনে না চাইলে অন্তত যাকাত সদকা স্বরূপ হলেও দিয়ে দেয়া) কিংবা বিক্রি করে দেয়া।

শয়তানের কিছু বিরল কৌশল

পূর্বের পরিচ্ছেদে ইবলীছ শয়তানের নিত্য কৌশলের কিছু বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শয়তান তার কৌশলে পরিবর্তনও এনে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শয়তান নিত্য কৌশল বাদ দিয়ে বিরল কৌশল গ্রহণ করে থাকে। পূর্বে পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিরল কৌশল বলে বোঝানো হয়েছে এমন কোন কৌশল যা নতুন, যা পূর্বে ছিল না কিংবা যা সবার বেলায় গ্রহণ করে না, বিশেষ বিশেষ লোকের বেলায় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রহণ করে থাকে। অনেকের বেলায় এমন সব কৌশলও অবলম্বন করে যা রীতিমত অভিনব। নিম্নে কয়েকটা বিরল ও অভিনব কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা গেল।

- একবার আমাদের গ্রামের (খুলনা জেলার রূপসা থানার মৈশাগুনি গ্রামের) একজন লোক আমার কাছে এসে বলল, হুজুর! আমাদের গ্রামের একজন লোক স্বপ্নে দেখেছে কে যেন অদৃশ্যে থেকে তাকে বলছে, তুই মন্দিরে গিয়ে মনসাকে দুধ কলা দিয়ে আয়, নতুবা তোর ছেলে মারা যাবে। লোকটি আমাকে বলল, হুজুর! এই স্বপ্ন দেখার পর সে খুব দুশ্চিন্তায় আছে, তার একটি মাত্র ছেলে। এখন সে কী করতে পারে? আমি বললাম, এটা শয়তানের দেখানো স্বপ্ন। এভাবে শয়তান

তাকে মূর্তি পূজায় লিপ্ত করে কাফের বানিয়ে তাকে চির জাহান্নামী করে দিতে চায়। মানুষকে মারার ক্ষমতা শয়তানের নেই। শয়তান জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত তাই সে জিনদের মত আছর করতে পারে মাত্র। লোকটা যদি মনসাকে দুধ কলা না দেয় তাহলে বেশির থেকে বেশি শয়তান তার ছেলের উপর আছর করে তাকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলতে পারবে। আর দুধ কলা না দেয়ার পর যখনই সে তার ছেলেকে অসুস্থ হতে দেখবে তখন মনে করবে এই বুঝি আমার ছেলে মরতে যাচ্ছে, তখন সে অবশ্যই মনসাকে দুধ কলা দিয়ে মুশরিক কাফেরে পরিণত হবে। এই হল শয়তানের কৌশল। আমি লোকটিকে বললাম, আপনি গিয়ে আশপাশের কিছু লোক জড় করে তাদের সামনে প্রকাশ্যে আমার নাম নিয়ে বলবেন যে, মাওলানা হেমায়েত সাহেব বলেছেন, মনসাকে দুধ কলা দেয়া যাবে না, যদি তার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে মাওলানা হেমায়েত সাহেব তাকে জিন শয়তানের আছরের তাবীজ দিবেন, ইনশাআল্লাহ সে আছর-মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে দাঁড়াবে। আমার চিন্তা ছিল লোকটা এভাবে জনসমক্ষে আমার নাম বললে শয়তানও জানবে বুঝবে যে, এবার এ ঘটনার পেছনে এক কড়া মৌলবী লেগেছে, আমি জিততে পারব না। তখন সে এই মিশন থেকে সরে দাঁড়াবে। শয়তানের চক্রান্ত অত মজবূত হয় না। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল হয়ে থাকে। (সূরা নিছা: ৭৬)

যাহোক আমার কৌশলে কাজ হয়েছিল মনে হয়। কারণ সেই লোকের ছেলের অসুস্থ হওয়ার কোন সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেনি।

- পূর্বের মতই আর একটা ঘটনা বলছি। তবে এ ঘটনায় একটু ভিন্নতা রয়েছে। বিগত ৪/৫/২০১৬ তারিখে একজন লোক আমাকে ফোন করেছিল যে, এক ব্যক্তি কয়েকটা সাপ মারার পর তার খুব জ্বর হয়েছিল। কোন ডাক্তার কবিরাজে কাজ হচ্ছিল না। তখন হঠাৎ একজন হিন্দু সাধুর সঙ্গে তার দেখা। সাধু তাকে বলল, তোর জ্বর কেন হয়েছে তা জানিস? মনসা দেবিকে মারার কারণে। তোর জ্বর ভাল হবে

www.maktabatulabrar.com

না। তুই মন্দিরে গিয়ে মনসা দেবির সামনে হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাহলে তোর জ্বর সারবে। এই কথার ভিত্তিতে লোকটা মন্দিরে গিয়ে মনসা দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। ক্ষমা চাওয়ার পর তার জ্বর ভাল হয়ে গেছে। এখন ঐ লোকটার কী করণীয়? আর ব্যাপারটার রহস্যই বা কি একটু খুলে বলুন তো।

আমি বললাম, কী করণীয় তা পরে বলছি। আগে শুনুন ঘটনার রহস্য। ঐ যে সাধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, ও কোন মানুষ নয়। মানুষ গায়েব জানে না। সেই সাধু মানুষ হয়ে থাকলে সে জানল কী করে যে, সাপ মারার পর থেকে তার জ্বর হয়েছে। তাই ও সাধু কোন মানুষ নয়, ও ছিল আসলে জিন শয়তান। ঐ জিন শয়তানই আছর করার ফলে তার জ্বর হয়েছিল। তারপর যখন তার কথামত লোকটা মনসা দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়েছে, তখন শয়তান তার আছর তুলে নিয়েছে। আর এভাবে শয়তান লোকটাকে শির্কে লিপ্ত করেছে। এটাই ছিল শয়তানের উদ্দেশ্য। তাকে শির্কে লিপ্ত করার জন্যই শয়তানের এই অভিনব কৌশল। তারপর বললাম, এবার শুনুন লোকটার করণীয় কি। সে শির্ক থেকে তওবা করুক এবং ঈমানকে নবায়ন করে নিক।

এতক্ষণ শয়তানের কমন কৌশল ও বিরল কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল। এবার শুনুন শয়তান বিভিন্ন শ্রেণীর আলেম ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে কীভাবে ওয়াছওয়াছা দেয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্টাইলে ধোঁকা প্রদান প্রসঙ্গে

এমনিতে গোটা বনী আদমের সাথেই শয়তানের শত্রুতা। তার মধ্যে আলেম সমাজের সাথে শয়তানের শত্রুতার পরিমাণ অনেক বেশী। কারণ, একদিকে ইল্‌ম থাকার সুবাদে আলেম সমাজকে বিভ্রান্ত করা শয়তানের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার তারা গোটা সমাজকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষার জন্য কাজ করে থাকেন, শয়তানের ব্যাপারে সমাজকে সতর্ক করেন, মানুষকে শয়তানের খপ্পর থেকে আত্মরক্ষার কৌশল শিখিয়ে দেন। এসব কারণে আলেম সমাজের বিষয়টা শয়তানের কাছে সাধারণ ইবাদতকারীদের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন প্রতীয়মান হয়। আলেম সমাজকে বিভ্রান্ত করতে পারলে তার মিশন চালানো তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

ইল্ম থাকার সুবাদে আলেম সমাজকে বিভ্রান্ত করা কঠিন এ কারণেও যে, ইল্ম থাকলে খোদার ভয়ও বেশী থাকে, ফলে খোদার ভয় তাদেরকে গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে রাখে। কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির: ২৮)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল আলেমদের মধ্যে ইল্ম থাকার ফলে তাদের মধ্যে খোদার ভয় বেশী থাকে, আর খোদার ভয় বেশী থাকার ফলে খোদার ভয় তাদেরকে গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে রাখে। এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে গোনাহে লিপ্ত করাতে হলে শয়তানকে অনেক বেশী শ্রম ব্যয় করতে হয়।

আলেম সমাজের ক্ষেত্রে শয়তানের অতিরিক্ত আরও সমস্যা হল আলেম সমাজ সহজে শয়তানের প্রতারণা কৌশল টের পেয়ে যান। আর টের পেয়ে যান বলে তাদের ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতারণা কৌশল তেমন কার্যকর না হওয়ায় শয়তানকে নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবনে তাকে বেশী মেধা ব্যয় করতে হয়। অনেকটা ঢাকার গুলিস্তানের ঠগবাজদের নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবনের পেছনে মেধা ব্যয় করার মত। একসময় ঢাকার গুলিস্তান এলাকায় থাকত অনেক ধরনের পকেটমার, ঠগবাজ, প্রতারক শ্রেণীর লোক। (এখনও যে মোটেই নেই তা নয়।) তারা মানুষকে প্রতারিত করার জন্য অনেক ধরনের কৌশল আবিষ্কার করত। কিন্তু কিছু দিন পার হলেই জনগণ তাদের সেই প্রতারণা-কৌশল টের পেয়ে যেত। তখন তাদেরকে আবার নতুন কৌশল আবিষ্কারের পেছনে মেধা-শ্রম ব্যয় করতে হত। যেমন ধরুন কিছু দিন তাদের একটা কৌশল ছিল নিম্ন মানের ঘড়ি, চশমা, আংটি ইত্যাদি বেশি দামে বিক্রির জন্য তারা সরল গোছের নতুন কোন পথিককে দেখলে কাছে এসে চুপি চুপি করে বলত, ভাই একটা দামী ঘড়ি (বা চশমা বা আংটি) আছে কিনবেন? অল্প দামে দিয়ে দেব। বিপদে পড়েছি, সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে বা পকেটমার হয়ে গেছে, বাড়ি যেতে পারছি না, তাই অল্প দামে

www.maktabatulabrar.com

হলেও এটা বিক্রি করে দেয়া ছাড়া বাড়ি যাওয়ার আর কোনো ব্যবস্থা নেই। সরল পথিক সুযোগ মনে করে সেটা কিনে নিত। এই কৌশলে বেশ কিছুদিন যাবত জনগণ প্রতারিত হয়ে এক সময় তারা প্রতারণা-কৌশলটা বুঝে গেল। তারপর ঠগবাজদের গুরুরা আর একটা নতুন কৌশল উদ্ভাবন করল। সেমতে নতুন কোন সরল গোছের লোককে যেতে দেখলে দু'জন ঠগবাজ পরস্পরে বাদানুবাদ শুরু করে দেয়। একজন আর একজনের হাত থেকে কোন একটা মাল জোর পূর্বক টেনে নেয়ার ভংগী করে বলতে থাকে, না, না, আমার মাল আমাকে দিয়ে দিন, এত দামী জিনিস এত অল্প টাকায় দেয়া যাবে না, বিপদে পড়েছি বলে কি আমি আপনাকে ফ্রি দিয়ে দেব? এই বলে কৃত্রিম ভংগীতে জোরপূর্বক মালটা টেনে নিয়ে সেই পথিকের পাশ দিয়ে যাওয়া আরম্ভ করল। পথিক ভাবল দেখি বিপদগ্রস্থ লোক থেকে ঐ মালটি কেনা যায় কি না, কিছুটা সস্তায় তো অবশ্যই নেয়া যাবে। ব্যস কথা বলতে বলতে এক সময় ঐ ঠগবাজের বলা দামের চেয়ে আরও একটু বেশী দামে জিনিসটি কিনে নিল। কিন্তু কালক্রমে এই কৌশলও জনগণ বুঝে গেল। তারপর আরও নতুন কৌশল আবিষ্কার, তারপর আরও ভিন্ন কৌশল আবিষ্কার, এখনও হয়ে চলেছে। শয়তানকেও ঠিক আলেম সমাজের ব্যাপারে ওরকম নিত্য নতুন কৌশল আবিষ্কার করতে হয়। নিত্য নতুন বেশ ভুষায় আলেম সমাজের সামনে আসতে হয়। কিন্তু শয়তান যে বেশ-ভূষা নিয়েই হাজির হয় আলেম সমাজ সহজেই তাকে টের পেয়ে যান। জনৈক কবি খুব সুন্দর করে কথাটি ব্যক্ত করেছেন,

بہر رنگیکہ خواہی جامہ می پوش + من انداز قدت را می شناسم

অর্থাৎ, যে রঙ্গের বেশ-ভূষা পরেই আস না কেন আমি তোমার কায়ার সাইজ দেখেই টের পেয়ে যাই।

কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে দুনিয়ার ব্যাপারে খুব সচেতন বলে দাবী করলেও শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে তারা মোটেই সচেতনতার পরিচয় দিতে পারে না। ঐ সেই আদিকালেও শয়তান সাধারণ মানুষকে যেসব কৌশলে ধোঁকা দিত এখনও তাদের বেলায় সেসব কৌশলই চালিয়ে যাচ্ছে, তবুও সাধারণ মানুষ তা টের পাচ্ছে না, ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। যেমন কয়েকটি উদাহরণ:–

১. সেই আদিকালেও মানুষ শয়তানের ধোঁকায় নিজের হাতে গড়া মূর্তিকে বিভিন্ন রকম ক্ষমতার উৎস মনে করে তার পূজা করত, আজও তেমনই করে যাচ্ছে।

২. সেই আদিকালেও গান-বাদ্য, নারী, নেশা ইত্যাদি দিয়ে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করত, আজও তেমনই করে যাচ্ছে।

৩. সেই আদিকালেও মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিয়ে যে ধরনের উপহাস ও কটুক্তি করত, আজও শয়তানের কুমন্ত্রণায় তেমনই করে যাচ্ছে। যেমন:

- সেই আদিকালেও শয়তান হযরত শুআইব (আ.)-এর গোত্রের লোকদেরকে নবী ও তার অনুসারী সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যা শেখাত এবং শয়তানের শেখানো মোতাবেক তারা যা বলত তা হল– সমাজে তোমাদের কোন শক্তি নেই, তোমরা তো দুর্বল শ্রেণী। সূরা হূদের ৯১ নং আয়াতে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَالُوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا.﴾

অর্থাৎ, হে শুআইব! তুমি যা বল তার সিংহভাগই আমরা বুঝি না। আর আমরা তো তোমাকে দেখছি আমাদের মধ্যে দুর্বল।

আজও আলেম সমাজ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তেমনই বলা হচ্ছে যে, আলেম মৌলবীরা সমাজের পরগাছা, সমাজে এদের কোন ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠা নেই। কখনওবা কিছুটা শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে এ কথাগুলোকেই এভাবে বলা হচ্ছে যে, ধর্ম-কর্ম সঠিক নয় বলেই নিম্ন মানের লোকেরাই ধর্ম-কর্ম করে। উন্নত মানের লোকেরা কেন ধর্মে আসে না? ইত্যাদি। (এসব অভিযোগের কিছু উত্তর পূর্বে গিয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪৩–৪৪। আর কিছু উত্তর সামনে আসছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ১৬৩–১৬৪)

সেই আদিকালেও শয়তান হযরত হূদ (আ.)-এর গোত্রের লোকদেরকে নবী ও তার অনুসারী সমাজের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যা শেখাত এবং শয়তানের শেখানো মোতাবেক তারা যা বলত তা হল– তোমার কথায়

কোন যুক্তি বা দলীল নেই, অতএব তা মানার যোগ্য নয়। সূরা হূদের ৫৩ নং আয়াতে এমনই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَالُوْا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, তারা বলল, হে হূদ! তুমি তো আমাদের নিকট কোন দলীল উপস্থাপন করতে পারনি। আমরা তোমার কথায় আমাদের দেবতাদের বর্জন করব না। এবং তোমার কথায় বিশ্বাস করব না।

আজও আলেম সমাজ থেকে সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তেমনই বলা হচ্ছে যে, আলেম মৌলবীরা অন্ধ তথা যুক্তি ও প্রগতি বিরোধী। অতএব এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে তাদের কথা চলতে পারে না। (এ অভিযোগের উত্তর সামনে আসছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ১৬৫)

- সেই আদিকালেও শয়তান হযরত নূহ (আ.)-এর গোত্রের লোকদেরকে নবী ও তার অনুসারী সমাজের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যা শেখাত এবং শয়তানের শেখানো মোতাবেক তারা যা বলত তা হল– শাস্তির ভয় ইত্যাদি ফাঁকা বুলি ছেড়ে দিয়ে পারলে শাস্তি এনে দেখাও। সূরা হূদের ৩২ নং আয়াতে এমনই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَالُوْا يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, তারা বলল, হে নূহ! তুমি তো আমাদের সাথে বেশ অনেক তর্কই করে ফেলেছ। তাহলে তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাও তা এনে দেখাও না, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।

আজও আলেম সমাজ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তেমনই বলা হচ্ছে যে, আলেমরা পরকালের জুজু বুড়ির ভয় দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে।

- সেই আদিকালেও শয়তান হযরত সালেহ (আ.)-এর গোত্রের লোকদেরকে নবী ও তার অনুসারী সমাজের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করে

www.maktabatulabrar.com

তোলার জন্য এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যা শেখাত এবং শয়তানের শেখানো মোতাবেক তারা যা বলত তা হল– হে সালেহ! তোমার প্রতি সমাজের আশা ভরসা ছিল যে, তুমি কিছু একটা হতে পারবে, কিন্তু তুমি এ কোন্ পথ ধরলে। সূরা হূদের ৬২ নং আয়াতে এমনই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَالُوْا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ.﴾

অর্থাৎ, তারা বলল, হে সালেহ! এর পূর্বে তো তোমার প্রতি আমাদের আশা ছিল, (যে, তুমি জীবনে বিরাট কিছু হবে।) এখন তুমি আমাদের বাপ-দাদারা যার পূজা করে এসেছে তা থেকে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছ? তুমি যার দিকে আমাদের আহবান জানাচ্ছ সে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান ।

আজও দেখা যায় কোন মেধাবী সম্ভাবনাময়ী ছাত্রকে মাদ্রাসা শিক্ষার লাইনে দেয়া হলে তার সম্বন্ধে বলা হয় ছেলেটা মেধাবী ছিল, জীবনে ভাল কিছু করতে পারত, কিন্তু তাকে ভিক্ষা বিদ্যার লাইনে দেয়া হল। এখন ভিক্ষার থলি নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরা ছাড়া জীবনে কী আর করতে পারবে!

দেখা গেল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানকে নতুন তেমন কিছু করতে হচ্ছে না। সেই আদিকালেও যেসব কথায় এবং যেসব পন্থায় তাদেরকে বিভ্রান্ত করত, এখনও তাদের বেলায় সেগুলোই চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাদের কানে পুরণো রেকর্ডটা বাজিয়ে দিলেই হচ্ছে। তাই দেখা যায় সাধারণ মানুষ দ্বীন-ধর্ম ও দ্বীনের ধারক বাহক আলেম সমাজের বিরুদ্ধে যা কিছু বলছে, তা নতুন কিছু নয়, সব হল পূরণো রেকর্ডের ভাঙ্গা সূর। গ্রাম্য অশিক্ষিত পুরনো ধাচের লোকেরা এসব পুরাতন রেকর্ড বাজালে খুব একটা আশ্চর্য লাগে না, আশ্চর্য লাগে যখন দেখি প্রগতির দাবীদার সেকেলে ধ্যান-ধারণার প্রতি নাক ভ্রু কোঁচকানো শ্রেণীর শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী লোকরা এই পুরণো রেকর্ডগুলোই মহানন্দে বাজিয়ে যাচ্ছে।

যাহোক বলছিলাম, সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শয়তানকে নতুন তেমন কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আলেম

www.maktabatulabrar.com

সমাজের ব্যাপারটা ভিন্ন। আলেম সমাজ শয়তানের সব প্রতারণা কৌশল টের পেয়ে যান। তাই তাদের বেলায় শয়তানকে নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তদুপরি খোদাভীতির কারণে শয়তানের শেখানো পথে আলেম সমাজকে অগ্রসর করা শয়তানের পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে। সবকিছু মিলিয়ে আলেম সমাজের পেছনে শয়তানকে অনক বেশি সময়, অনেক বেশি শ্রম ও অনেক বেশি মেধা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু তবুও সে থেমে নেই, থেমে থাকে না।

বিভিন্ন শ্রেণীর আলেমকে বিভিন্নভাবে ওয়াছওয়াছা

শয়তান এক এক শ্রেণীর আলেমকে বিভ্রান্ত করার জন্য এক এক রকম কৌশল অবলম্বন করে থাকে। আলেমদের প্রতি শয়তানের শত্রুতা বেশি। আলেমদের চরিত্র হনন করতে পারলে আরও অনেককে বিভ্রান্ত করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই শয়তান (ও শয়তানের দোসররা) আলেমদের চরিত্র হননের প্রচেষ্টায় এতটা তৎপর।

যাহোক বলছিলাম এক এক শ্রেণীর আলেমকে বিভ্রান্ত করার জন্য এক এক রকম কৌশল অবলম্বন করে থাকে। ওয়ায়েজদের ওয়াছওয়াছা দেয় এক কৌশলে, ইমাম ও খতীবদের ওয়াছওয়াছা দেয় এক কৌশলে, পীর সাহেবদের ওয়াছওয়াছা দেয় এক কৌশলে, মুসান্নিফ বা লেখকদের ওয়াছওয়াছা দেয় এক কৌশলে, মুদাররিস বা শিক্ষকদের ওয়াছওয়াছা দেয় এক কৌশলে ইত্যাদি। অর্থাৎ, এক এক শ্রেণীর আলেমের একেক ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে। নিম্নে সাধারণত কোন্ শ্রেণীর আলেমের কি ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে তার কিছু বিবরণ পেশ করা হল।

ওয়ায়েজদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

আমার ঘনিষ্ট এক ওয়ায়েজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওয়াজের ব্যাপারে নফছ ও শয়তান আপনাদেরকে কী বলে ধোঁকা দিয়ে থাকে? তিনি বেশ সরল মানুষ। বলে ফেললেন, আমার একটা বিশেষ ধোঁকা এই হয়, এমনভাবে ওয়াজ করতে হবে যেন শ্রোতারা নারায়ে তাকবীর দিয়ে ওঠে, শ্লোগান দিয়ে ওঠে। আর এক ওয়ায়েজ তো একদিন কথা প্রসঙ্গে অকপটে বলেই ফেললেন, কোন্ ধরনের কি কি কথা বললে শ্রোতারা নারায়ে তাকবীর দিয়ে উঠবে তা আমার রপ্ত হয়ে গেছে। এ তো গেল ওয়ায়েজদের

বিশেষ একটা ওয়াছওয়াছার কথা। এছাড়া কিছু কমন ওয়াছওয়াছা যা ওয়ায়েজদের সাধারণত হয়েই থাকে, তার মধ্যে রয়েছে−

- ওয়াজের মধ্যে আন-কমন কিছু অর্থাৎ নতুন কিছু বলা চাই যা অন্যরা বলে না, হোক না তা ভিত্তিহীন বা মওজূ রেওয়ায়েত। এই নতুনত্বের খাহেশে বাজারী ওয়ায়েজরা যে কতসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বা মওজূ রেওয়ায়েত বয়ান করে থাকেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। বিজ্ঞ আলেমগণ তা শুনে শুধু হতবাকই হয়ে থাকেন। চোখ মোটা করে মনে মনে শুধু বলেন, ব্যাটারা বলে কি!

এই ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার জন্য ওয়ায়েজদের মনে রাখতে হবে মওজু হাদীছ বয়ান করা কঠিন গোনাহ। প্রসিদ্ধ হাদীছ রয়েছে− রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.» (متفق عليه)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা সম্পৃক্ত করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারণ করে রাখে। (বোখারী ও মুসলিম)

- ওয়ায়েজদের আর একটা কমন ওয়াছওয়াছা এই হয়ে থাকে− মানুষকে হাসাতেও হবে কাঁদাতেও হবে, তাহলে তার ওয়াজের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়বে। ওয়ায়েজগণ মনে করতে পারেন এটা কোন ওয়াছওয়াছা নয়, পাবলিকই তো চায় এমন ওয়াজ হোক যাতে আনন্দ লাগবে আবার মন গলে কান্নাও আসবে। এভাবে মনে আছর ভাল হবে। পাবলিক এটা চায় আর তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য ওয়ায়েজদের মনে আল্লাহই এরূপ ঢেলে দেন, এটা কোন ওয়াছওয়াছা নয়। কিন্তু এভাবে যখন নিজের ওয়াজের আকর্ষণ বাড়ার চিন্তা মনে জাগে তখন সেটা ওয়াছওয়াছা বৈ কি? যাহোক ওয়ায়েজদের কমন ওয়াছওয়াছার বিষয়গুলো বলছিলাম।
- ওয়ায়েজদের কমন ওয়াছওয়াছার মধ্যে আরও রয়েছে ওয়াজের মেইন সময়ে অর্থাৎ, যখন শ্রোতাদের সমাগম বেশি হয় তখন সময় না দেয়া হলে অবমূল্যায়ন হচ্ছে ভেবে মন মুষড়ে যাওয়া।

এই ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার জন্য ওয়ায়েজদেরকে ইখলাসের চেতনা জাগ্রত করতে হবে। বরং নফ্ছের সাথে বিরোধিতা করার

www.maktabatulabrar.com

নিয়তে মাঝে মধ্যে লোক সমাগম যখন কম হয় ইচ্চাকৃতভাবে সে সময় বয়ান করে নফ্ছকে শিক্ষা দিতে হবে।

- ওয়ায়েজদের কমন ওয়াছওয়াছার মধ্যে আরও রয়েছে প্রচারপত্রে বা ঘোষণায় তার নামের শুরুতে প্রধান অতিথি বা প্রধান আকর্ষণ ইত্যাদি লেখা বা বলা না হলে মন খারাপ হয়ে যাওয়া। অনেক সময় এ কারণে সেই প্রোগামে যাওয়া থেকে বিরত থাকা হয়। এ কারণে ওয়াজের আয়োজকগণ −যারা ওয়ায়েজদের দাওয়াত দেন, ব্যবস্থাপনা করেন তারা−ও কম বিপাকে পড়েন না। প্রত্যেক ওয়ায়েজই যখন চান তার নামের শুরুতে প্রধান অতিথি বা এরকম কিছু লেখা হোক, তখন আয়োজকরা কয়জনের নামের শুরুতে একই উপাধি লাগাবেন? তাই তারা গবেষণা করে অনেকগুলো উপাধি বের করে সেমতে কারও নামের শুরুতে প্রধান অতিথি, কারও নামের শুরুতে বিশেষ অতিথি, কারও নামের শুরুতে প্রধান বক্তা, কারও নামের শুরুতে বিশেষ বক্তা, কারও নামের শুরুতে প্রধান আকর্ষণ, কারও নামের শুরুতে বিশেষ আকর্ষণ, কারও নামের শুরুতে প্রধান আলোচক, কারও নামের শুরুতে বিশেষ আলোচক ইত্যাদি লাগানো শুরু করেছেন। মানে অতিথি শব্দের সাথে কখনও প্রধান লাগানো কখনও বিশেষ লাগানো। কিংবা বক্তা শব্দের সাথে কখনও প্রধান কখনও বিশেষ লাগানো। অথবা আকর্ষণ শব্দের সাথে কখনও প্রধান কখনও বিশেষ লাগানো। কিংবা আলোচক শব্দের কখনও প্রধান কখনও বিশেষ লাগানো। এভাবে আটজন বক্তাকে সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ১. প্রধান অতিথি, ২. বিশেষ অতিথি, ৩. প্রধান বক্তা, ৪. বিশেষ বক্তা, ৫. প্রধান আকর্ষণ, ৬. বিশেষ আকর্ষণ, ৭. প্রধান আলোচক, ৮. বিশেষ আলোচক। যদিও এই অতিথি, বক্তা ও আলোচক এবং প্রধান ও বিশেষ-এর মধ্যে ঠিক কতটুকু তফাৎ তার মাথামুণ্ডু হয়তো আজও কারও ভাল করে বুঝে আসেনি। তবুও বলা যায় আয়োজকরা এগুলো করছেন বা করতে বাধ্য হচ্ছেন অন্তত ওয়ায়েজগণ যাতে না-খোশ না হন। তারা না-খোশ হলে যে আবার ওয়াজ জমবে না, তাহলে ব্যবস্থাপকদের সুনাম হবে কীকরে? মানুষ বলবে, কী ওয়ায়েজ এনেছে, ওয়াজ জমেনি! এটা আয়োজকদের অদক্ষতা। কিংবা ওয়াজ না জমলে তাতে ব্যবস্থাপকদের কালেকশনের টার্গেট যদি পূরো

না হয়! তাই ওয়াজ জমানোর চিন্তায় আয়োজকরাই এমন হাসানো কাঁদানো ওয়ায়েজদের সন্ধান করে থাকেন। এ চিন্তা থেকেই ওয়ায়েজদের খুশি করার জন্য তারা তৎপর থাকেন। সবার উদ্দেশ্যেই থাকতে পারে ঘুণ। ওয়াছওয়াছামুক্ত নয় কেউই।

ওয়ায়েজগণ উলামায়ে কেরামের জামাআতভুক্তই হয়ে থাকবেন, তাই তারা এসব ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা কীভাবে করবেন, তা তাদের জানা থাকারই কথা। সহজ উপায় হল– মাঝে মধ্যে আয়োজকদের বলে দিবেন, আমার নামের সাথে এসব কিছু লেখা বা বলা যাবে না।

- কোন কোন ওয়ায়েজ বা উপদেশদাতার এই ওয়াছওয়াছা হয় যে, ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশে লাভ কী? ওয়াজ-নসীহতে তো কাজ হয় না, মানুষ তো মানে না।

এই ওয়াছওয়াছার প্রতিকার হল এই চিন্তা করা যে, ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশে কাজ হয় না– এ কথা সঠিক নয়। মানুষ যা কিছু ধর্ম-কর্ম করছে তা তো ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ শুনেই করছে। ছোট্ট থাকতে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, বড় ভাই-বোন ও মুরব্বীগণ নসীহত উপদেশ করেছেন, ভাল হতে বলেছেন, গুরুজনকে মান্য করতে বলেছেন, নামায পড়তে বলেছেন, লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে বলেছেন ইত্যাদি। এসব নসীহত উপদেশ শুনেই তো আমরা যতটুকু পেরেছি তদনুযায়ী আমল করেছি এবং ভাল পথে অগ্রসর হয়েছি। এসব উপদেশ-নসীহত না শুনলে হয়তো এই ভাল পথে এতটুকু অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব হত না। মানুষ যতটুকু দ্বীনের পথে অগ্রসর হয় তার পশ্চাতে কোন না কোন আলেম বা দ্বীনদার ব্যক্তির নসীহত-উপদেশের ভূমিকা থাকে। অতএব ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশে লাভ কী– এ বক্তব্য সঠিক নয়।

- আল্লামা ইবনুল জাওযী "তালবীছে ইবলীছ" কিতাবে বলেছেন, কতক ওয়ায়েজের ওয়াছওয়াছা হয় তারা কৃত্রিমভাবে কাঁদে। মানুষকে দেখায় যে, তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে বিগলিত, অথচ তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত।

(এই ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের জন্য তাকে মনে রাখতে হবে) এরূপ কৃত্রিমতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

www.maktabatulabrar.com

- আল্লামা ইবনুল জাওযী "তালবীছে ইবলীছ" কিতাবে আরও বলেছেন, কতক ওয়ায়েজ ওয়াজের মজলিসে ইলমে মারেফাতের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয় ও ইশ্কে ইলাহীর বয়ান শুরু করে দেয় আর শয়তানের ওয়াছওয়াছায় মনে মনে ভাবে আমি তো বহু উপরের মাকামে পৌঁছে গেছি। নতুবা এমনসব কথা আমার মুখ থেকে কীভাবে বের হচ্ছে! তাদেরকে মনে রাখতে হবে মুখে বলা আর প্রকৃতপক্ষে মাকামে পৌঁছা এক নয়। এটা শয়তানের ধোঁকা।
- আল্লামা ইবনুল জাওযী " তালবীছে ইবলীছ" কিতাবে আরও বলেছেন, কতক ওয়ায়েজ মর্যাদা মোহের শিকার হয়ে পড়ে। এর আলামত হল তার পরিবর্তে যদি অন্য কেউ ওয়াজ করতে চায় তাহলে সে তা অপছন্দ করে।

(এই ওয়াছওয়াছা দূর করার জন্য তাকে ভাবতে হবে তার মধ্যে ইখলাসের অভাব রয়েছে।) সে যদি মুখলেস হত এবং মানুষের ইসলাহ ও সংশোধনই তার উদ্দেশ্য হত, তাহলে যে কেউ এ কাজ করুক তাতে সে সন্তুষ্ট থাকত।

ইমাম ও খতীবদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

ইমাম ও খতীব সাহেবগণ জুমুআর দিন, ঈদের দুই দিন, শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদি উপলক্ষে ওয়াজ বা বয়ান করে থাকেন। তাই ওয়াজের ব্যাপারে ওয়ায়েজদের যে জাতীয় ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে ইমাম ও খতীবদেরও সে জাতীয় ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে। যার বিবরণ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। সেগুলো ছাড়াও ইমাম ও খতীব হিসেবে তাদের কিছু খাস ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে। যেমন:

- মসজিদ কমিটির লোকজনকে স্যার স্যার করে চলতে হবে, তাতে আলেম হিসেবে যে গায়রত তথা আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলা উচিত ছিল তা বিসর্জিত হলেও। মনে করে চাকরি ঠিক রেখে সবকিছু!
- কোন তিক্ত সত্য বা কারও গায়ে লাগে এমন মাসআলা বলার প্রয়োজন থাকলেও তা বিশেষ বিশেষ লোকের চেহারার দিকে তাকিয়ে না বলা, পাছে যদি তারা আবার অসন্তুষ্ট হয়ে যান আর চাকরিতে আঘাত আসে!

- চাকরি রক্ষার জন্য এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মা বৌদের সঙ্গে খাতির রেখে চলা এবং খালাম্মা কেমন আছেন? ভাবি ভাল আছেন তো?– এসব চর্চায় লেগে পড়া।
- বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খুশি রাখার জন্য ঠেকায় বে-ঠেকায় খুব আবেগের সাথে তাদের নাম নিয়ে নিয়ে দুআ করা।
- যা বেতন পাওয়া যায় তা দিয়ে সংসার চলে না– এই অজুহাতে, কিংবা বাড়তি সঞ্চয়ের চিন্তায় প্রচলিত মীলাদ, কুলখানী, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি বেদআত জানা সত্ত্বেও করা। জায়েয পন্থায় যতটুকু উপার্জন হয় তাতে তুষ্ট না থাকা। ইত্যাদি।

এগুলো সবই শয়তানের ওয়াছওয়াছা। সঠিক পন্থায় থেকে নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি চাকরি চলে যায়, তাহলে সেই চাকরির পরওয়া না করা চাই। আল্লাহর উপর ভরসা করা চাই। এটাই তো হল তাওয়াক্কুল। আর হালাল পন্থায় যা উপার্জন হয় তাতেই তুষ্ট থাকা চাই। একেই বলে কানাআত। রিযা বিল কাযা তথা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি থাকলে, তাকদীরে যথাযথ বিশ্বাস থাকলে হালাল পন্থায় সিমাবদ্ধ না থেকে হারাম পন্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেতনা জাগ্রত হতে পারে না। এসব চেতনা শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব কোনো রূপ তাবীল বা অপব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে এগুলোকে শয়তানের ওয়াছওয়াছাই গণ্য করা চাই।

এ কথা সত্য যে, হালাল পন্থার চাকরিকে নিজের হেলায় নষ্ট করা ঠিক নয়। হালাল পন্থায় উপার্জনের সুযোগ আল্লাহর এক নেয়ামতও বটে। আর আল্লাহর কোন নেয়ামতকে অবমূল্যায়ন করা ঠিক নয়। এরূপ চাকরি রক্ষার জন্য বৈধ পন্থায় হেকমত অবলম্বন করে চলাও নিষেধ নয় বরং তা কাম্য। কিন্তু বুঝতে হবে আলেম হিসেবে যে আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলা উচিত তা বিসর্জন দেয়ার নাম হেকমত নয়। কারও চাটুকারিতার নাম হেকমত নয়। চাকরি রক্ষার জন্য শরীয়ত লঙ্ঘনের নামও হেকমত নয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে সঠিক মাসআলা –এমনকি কারও বিরুদ্ধে গেলেও তা– বলা কর্তব্য। অবশ্য তা কৌশলে এবং হেকমতের সাথেই বলা কাম্য। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়া হেকমত নয়।

www.maktabatulabrar.com

পীর সাহেবদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

পীর সাহেবরা মানুষকে শয়তানের ওয়াছওয়াছার ব্যাপারে সতর্ক করেন, ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেন, কিন্তু স্বয়ং পীর সাহেবরাও ওয়াছওয়াছা থেকে মুক্তি পান না। তাদেরকেও নফছ ও শয়তান নানান রকম ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে এবং শয়তান তাদের প্রতি বেশি ক্ষুব্ধ থাকার কারণে তাদেরকে একটু বেশি কঠিন ওয়াছওয়াছাই দিয়ে থাকে। পীর সাহেবদের ব্যক্তিত্ব এবং পজিশন ভেদে মোটামুটি তাদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে, তার মধ্যে রয়েছে–

- আমার কাছে বড় বড় মালদাররা মুরীদ হলে হাদিয়া-তোহফা বেশি পাওয়া যেত।
- সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় বড় পদের লোকেরা যদি আমার মুরীদ হত তাহলে আমার দাপট বৃদ্ধি পেত, তাদের দ্বারা অনেক কাজ নিতে পারতাম। লোকেরা বুঝত হুজূরের অনেক ক্ষমতা।
- বড় বড় আলেমরা যদি আমার মুরীদ হত তাহলে লোকেরা বুঝত হুজূর অনেক বড় আলেম ও কামেল লোক, নইলে কি এত বড় বড় আলেম হুজূরের মুরীদ হত।
- মনে মনে এই কামনা জাগা যে, মুরীদরা যদি আমাকে ওলিয়ে কামেল, গাওছ, কুতুব ইত্যাদি বড় বড় খেতাব প্রদান করত!
- কোন দুআ কবূল হলে বা তাবীজ ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলে কিংবা ঘটনাচক্রেও ভবিষ্যত বিষয়ক কোন কথা অনুযায়ী কিছু ঘটলে মনে এই কামনা জাগা যে, মুরীদরা যদি এটাকে আমার কামালিয়াত বা কারামত হিসেবে মূল্যায়ন করত!
- আমার মুরীদের সংখ্যা যদি সবার চেয়ে বেশি হত। সারা দেশের মানুষ বলত, অমুকের মুরীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
- শুধু দেশে নয় বিদেশেও যদি কিছু মুরীদ থাকত, তাহলে বিদেশেও প্রোগাম হত, তাহলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পীর আখ্যায়িত হতাম। লোকেরা বুঝত এবং বলাবলি করত, সারা পৃথিবীতে হুজূরের ভক্ত মুরীদান ছড়িয়ে আছে।

- যেখানেই যাই দলে দলে ভক্ত মুরীদরা যদি আমার আশে পাশে থাকত, তারা বিনয়ের সাথে কেউ জুতো সোজা করত, কেউ লাঠি নিয়ে আগাত, কেউ ফাই-ফরমায়েশ খাটত ইত্যাদি, তাহলে আমার পীরালির বড়ত্ব ফুটে উঠত।
- কথায় কথায় কেঁদে ফেলা চাই, মুনাজাতে কান্দা চাই, মানুষকে কান্দানো চাই, মাঝে মধ্যে সজোরে " আল্লাহ" বলে খোদাভীতি প্রকাশ করা চাই যাতে মুরীদরা আমাকে খোদাভীতি তাড়িত, সর্বক্ষণ আখেরাতের ফিকিরওয়ালা বুযুর্গ মনে করে।
- এগুলো ছাড়াও ওয়াজ-নসীহত করার সময় ওয়ায়েজদের মনে যেসব ওয়াছওয়াছা হয়, পীর সাহেবদের মনেও ওয়াজ-নসীহত করার সময় সেসব ওয়াছওয়াছা হতে পারে, হয়ে থাকে।

মুসান্নিফ বা লেখকদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

মুনান্নিফ বা লেখকদের মনে যেসব ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে তার কিছু বিবরণ শুনুন।

- লেখার শুরুতেই মনে হয় আমার এই বইটি বাজারে ভাল চললে আমার প্রচুর উপার্জন হবে। কিংবা আমার এই লেখাটি বা আমার এই বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে লেখক হিসেবে আমার সুনাম হবে। শয়তান শুরুতেই এরূপ ওয়াছওয়াছা দিয়ে লেখার সহীহ নিয়ত থেকে তথা মানুষের হেদায়েতের নিয়ত থেকে সরিয়ে দেয়। তবে উল্লেখ্য যে, কেউ লেখার পরিকল্পনা করেছে মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, কিন্তু পরে চিন্তায় এল যে, ভাল লিখলে প্রশংসাও পাওয়া যাবে, বই ভাল চললে টাকা-পয়সাও আসবে– এ চিন্তা ইখলাসের পরিপন্থী নয়। এটা স্বভাবগত বিষয় যে, ভাল কিছুর বিনিময়ে প্রশংসা অর্জিত হবে, প্রশংসা হলে ভাল লাগবে, নিন্দা হলে খারাপ লাগবে। টাকা-পয়সার চাহিদাও স্বভাবগত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। তাই এরূপ চিন্তা ইখলাসের পরিপন্থী নয়। ইখলাসের পরিপন্থী হবে তখন যখন লেখার পরিকল্পনাই নেয়া হবে প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বা টাকা-পয়সা অর্জনের উদ্দেশ্যে।
- ছোটখাট বই বা তেমন খ্যাতিমান নয় এমন লেখকের বই-পুস্তক থেকে কোন তথ্য নিলে তার বরাত না দেয়া এই ভেবে যে, এ বইয়ের বরাত

www.maktabatulabrar.com

দিলে আমি ছোট হয়ে যাব। এর বরাত না দিলেই বরং পাঠকরা মনে করবে আমি বিশাল বই-পুস্তক পড়াশোনা করে বা অনেক ঘাটাঘাটি করে তবে লিখেছি। অথচ এই খেয়াল করা হয় না যে, এভাবে বরাত না দিলে তো ইল্‌মী খেয়ানতের গোনাহ হয়ে যায়। এটা তো গোনাহের চেতনা।

- জামাতের নামাযের সময় জামাত থেকে দূরে রাখার জন্য শয়তান খুব সুন্দর মাজমূন (লেখার বিষয়বস্তু) মনে এনে দিতে পারে। আর লেখকের মনে হতে পারে সুন্দর মাজমূন (লেখার বিষয়বস্তু) যেহেনে আসছে, সব সময় তো এমন মজমূন যেহেনে আসে না। তাই এখন জামাতে না গেলে কি নয়? কিংবা লেখক যদি উস্তাদ হয় তাহলে মনে করা যে, এখন দরসের মুতালা বাদ দিয়েই লেখাটা চালিয়ে যাওয়া দরকার। দরসের মুতালাআ তো পরেও করা যাবে, এরকম মাজমূন পরে যেহেনে না-ও আসতে পারে। এভাবে শয়তান জামাতে নামায পড়ার মত গুরুত্বপূর্ণ আমল থেকে এবং মুদাররিছ হিসেবে দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করতে হলে যে মুতালাআর জরুরত তা থেকে লেখককে ফিরিয়ে দেয়। এটা ওয়াছওয়াছা এ কারণে যে, এখনই লেখা জরুরি নয় পরেও লেখা যাবে, অথচ এখনই জামাতে শরীক হওয়া জরুরি, এখনই মুতালাআ সেরে নেয়া জরুরি। আর যেহেনে মজমূন হাজির হওয়ার যে বিষয়টা তা মজমূনের দুই একটা শব্দ লিখে রাখলেও পরে তা দেখে আবার মজমূনের আগের চিন্তায় ফিরে আসা যায়। যারা জাত লেখক তারা এটা সহজেই বোঝেন। তা ছাড়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজের দায়িত্ব পালন করলে এর ওছিলায় আল্লাহ তার চেয়ে আরও সুন্দর মাজমূনও তো যেহেনে এনে দিতে পারেন।
- লেখার সময় মাঝে মধ্যে মনে হয় এমন পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও সাহিত্য-সমৃদ্ধ ভাষা হওয়া চাই যাতে পাঠকরা মনে করে লেখকের ভাষা-জ্ঞান ও সাহিত্যের পাণ্ডিত্ব সাংঘাতিক! শিক্ষিত সমাজ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্দেশ্যে যে লেখা তা অবশ্যই শুদ্ধ না হলে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ সেই লেখকের লেখায় আপ্লুত হবে না, তার লেখাকে তেমন মূল্য দিবে না, যা ঐই লেখা থেকে তাদের হেদায়েত গ্রহণ না করার কারণ হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ভাষার শুদ্ধতা ও চমকারিত্বের প্রতি খেয়াল রাখা

কাম্য। এতটুকু চিন্তা শয়তানের ওয়াছওয়াছা নয়। কিন্তু এর চেয়ে অতিরিক্ত ভাষা-জ্ঞান ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রশংসিত হওয়ার খাহেশ শয়তানের ওয়াছওয়াছা প্রসূত বলেই মনে হয়।

- অনেক লেখকের মনে তো শত-গ্রন্থ-প্রণেতা হওয়ার খাহেশ জাগে। ফলে যেনতেন করে লিখে তারা রাউন্ড ফিগার পূর্ণ করতে লেগে যান। এরূপ চিন্তায় আক্রান্ত লেখকরা যেমন তড়িঘড়ি করে লেখেন ফলে ভুল লেখেন, তেমনি বইয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়ানোর জন্য অপূর্ণাঙ্গভাবেই অনেক বই শেষ করে ফেলেন। ভাল, উপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ লেখা থেকে বঞ্চিত করার জন্য এ-ও শয়তানের এক ওয়াছওয়াছা বৈ কি?
- আগের যুগের লেখকরা কমার্শিয়াল ছিলেন না। অর্থাৎ, তারা টাকা-পয়সা উপার্জনের উদ্দেশ্যে লিখতেন না। তাদের মধ্যে লেখার ক্ষেত্রে লিল্লাহিয়াত বেশি ছিল। ফলে তাদের মধ্যে অন্যের লেখা হুবহু নকল করার ইতিহাস তেমন দেখা যায় না। কিন্তু ইদানিং অনেক লেখক অতিমাত্রায় কমার্শিয়াল হয়ে ওঠায় যত বেশি লেখা হবে তত বেশি উপার্জন হবে– এই মনোভাব তাদের মধ্যে এসে গিয়েছে। ফলে এখন তারা অন্যের লেখা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নকল করে যায়। আর ধরা পড়লে যেন গা বাঁচাতে পারে তার জন্য দুই একটা শব্দ মাঝে মধ্যে পাল্টে দিয়ে এই নকলগিরী চালিয়ে যায়। একজন রসিক মন্তব্য করেছিলেন, অনেক লেখক এখন আল্লাহকে খোদা বানিয়ে আর নবীকে রসূল বানিয়ে অন্যের লেখাকে নিজের লেখা বানিয়ে ফেলেন। অর্থাৎ, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন অন্যের লেখার মধ্যে সামান্য কিছু পরিবর্তন করে সেটাকে নিজের লেখা বানিয়ে ফেলা হয়। যেমন: সহজ পরিবর্তন হল আল্লাহ শব্দকে খোদা শব্দে আর নবী শব্দকে রসূল শব্দে রূপান্তর। শুনেছি অনেক লেখক অন্যের বই হুবহু কাউকে দিয়ে বা নিজেই কম্পোজ করে সেই কম্পোজকৃত কপির মধ্যে প্রুফ দেখার সময় এরকম দু' চারটে শব্দ পাল্টে দেন। ব্যস এরপরই সে বইটিকে অন্য একটা নাম দিয়ে নিজের নামে চালিয়ে দেন। এমন নজিরও আমাদের সামনে রয়েছে– অন্যের বইয়ে দু' একটা শব্দ না পাল্টেও হুবহু পূর্ববৎ রেখেই শুধু বইটির ভিন্ন একটা নাম দিয়ে নিজের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। আগের যুগের লেখকরাও চুরি করত বলে

www.maktabatulabrar.com

ইতিহাসে কম-বেশ তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু তা এখনকার মত এমন পুকুরচুরি ছিল না মোটেই।

এখনকার লেখকরা যে আরও কত রকম জালিয়াতি করে তার বর্ণনা শেষ করাও কঠিন। শুধু আর একটা ঘটনা উল্লেখ করেই এ বিষয়টা শেষ করছি। একবার একজন প্রকাশক তার প্রকাশিত একটা বইয়ের সম্পাদনার জন্য আমাকে বারবার অনুরোধ করায় সেটি সম্পাদনার কাজ শুরু করলাম। বইটি ছিল অনুবাদ। মূল আরবী গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখে সম্পাদনা করতে গিয়ে যা পেলাম তা হচ্ছে মূলের সঙ্গে অর্থের মিল তো দূরের কথা বহু নামের মধ্যে পর্যন্ত মিল নেই। তার চেয়ে আরও আশ্চর্য হলাম মূল বইয়ে যে লেখার কোনো পাত্তা পর্যন্ত নেই এমন বহু পৃষ্ঠা লেখা ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেক চিন্তা করে বের করলাম এর রহস্যটা কি। রহস্য হল ফাঁকে ফাঁকে অনুবাদক নিজের অন্য লেখা ঢুকিয়ে দিয়ে বইটির কলেবর বৃদ্ধি করেছে। এই বৃদ্ধি করার মধ্যেই তার বৈষয়িক লাভ। বইয়ের ফর্মা যত বাড়বে তার বিলের পরিমাণও তো তত বাড়বে। কী আশ্চর্য! এমনতর জালিয়াতিও হয়?

যাহোক শয়তান এখনকার লেখকদের এভাবে খেয়ানত ও চুরির ওয়াছয়াছা দিতে সাহস পাচ্ছে –যে সাহস সে পূর্ববর্তী লেখকদের বেলায় পেত না– কারণ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখনকার লেখকদের মধ্যে লেখার ক্ষেত্রে পূর্ববতীদের ন্যায় লিল্লাহিয়াত বিদ্যমান নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকেসহ সকল লেখককে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত দান করুন। আমীন!

"নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা" বইটি লেখার সময় ওয়াছওয়াছা

লেখকদের কী ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, তার কিছু বিবরণ এতক্ষণ প্রদান করা হল। এ ব্যাপারে আমি আমার "নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা" নামক এই বইটি লেখার সময় কি কি ওয়াছওয়াছার সম্মুখীন হয়েছিলাম তার কিছু বর্ণনা পেশ করছি, তাহলে লেখকদের কী কী ধরনের ওয়াছওয়াছা হয় তা আরও স্পষ্ট হবে। আমি যখন "নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা" বিষয়ে লেখা নিয়ে ভাবছিলাম। এ বিষয়ে কেন লিখব,

কি কি প্রসঙ্গ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, লেখার আংগিক কি হবে, উপস্থাপনভংগী কি হবে, কোন্ প্রসঙ্গ দিয়ে লেখার সূচনা করব– এসব নিয়ে ভাবছিলাম। ব্যস ভাবনা শুরু করতেই নফ্‌ছ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

নফ্‌ছ : এতসব লেখালেখি করে লাভ কী?

আমি : লাভ আছে। এ বিষয়ে লিখলে আশা করা যায় বহু মানুষ নফ্‌ছ ও শয়তানের প্রতারণা কৌশল এবং নফ্‌ছ ও শয়তানের সঙ্গে মোকাবেলা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারবে। নফ্‌ছ ও শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা পাওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে। নফ্‌ছ ও শয়তানের প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্ম-কর্মে বেশি অগ্রসর হতে পারবে।

নফ্‌ছ : পূর্বেও তো এ শিরোনামে না হোক এর কাছাকাছি শিরোনামে অন্য অনেকে এ জাতীয় বিষয়ে লিখেছেন। তাতে কি নফ্‌ছ ও শয়তানের প্রতারণা থেকে মানুষ রক্ষা পেয়েছে। আল্লামা ইবনুল জাওযী লিখেছেন "তাল্‌বীসে ইবলীস", লিখেছেন "সাইদুল খাতির"। লেখা হয়েছে শয়তানের ডায়েরী, আরও কত কিছু। তাতে কি আগের চেয়ে ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্ম-কর্মে মানুষ বেশি অগ্রসর হতে পেরেছে? নফ্‌ছ ও শয়তান দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পরিমাণ বা সংখ্যা কি আগের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে?

আমি : হে শয়তান! দুআ করতে গেলেও তুমি এই যুক্তি দেখিয়ে থাক যে, এত দুআ করে লাভ কী? তুমি যা চাও তা তো পাও না! ওয়াজ-নসীহত করতে গেলেও তুমি এই যুক্তি দেখিয়ে থাক যে, এত ওয়াজ-নসীহত করে লাভ কী? মানুষ তো মানে না! তাই বলে কি তোমার যুক্তি মেনে আমরা আল্লাহর কাছে চাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি? ওয়াজ-নসীহত কি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে? কেউ কোন বিষয়ে বই-পত্র লেখার মনস্থ করলেও তুমি তার সামনে এই যুক্তি প্রদর্শন করে তাকে লেখা থেকে নিবৃত্ত করতে চাও, তার লেখা বন্ধ করে দেয়ার প্রয়াস চালাও যে, এত লেখালেখি করে লাভ কী? তাই বলে কি বই-পত্র লেখা বন্ধ রয়েছে? অতএব আমার এ লেখাও বন্ধ হবে না। তোমার বক্তব্য সঠিক নয়। দুআ করে লাভ কী– এ বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। আমি দুআতে যা চাই সবসময় হুবহু আমাকে তা প্রদান করা হয় না বলে কি দুআ করাটা

একেবারেই বেকার? অনেক সময় তো যা চাওয়া হয় আল্লাহ তাআলা হুবহু তা-ই প্রদান করেন। আবার কখনও কখনও যা চাওয়া হয় সেটা দুআকারীর জন্য মঙ্গলজনক হবে না বিধায় যেটি তার জন্য মঙ্গলজনক হবে সেটিই আল্লাহ তাআলা প্রদান করে থাকেন। এতেই কি লাভ নয় যে, মঙ্গলজনকটিই পাওয়া গেল? আবার কখনও কখনও দুনিয়ার জন্য চাওয়া হলে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে না দিয়ে তার আখেরাতের জন্য সেটা রেখে দেন। এতেও তার জন্য মঙ্গল। কারণ, দুনিয়ারটা ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতেরটি চিরস্থায়ী। এটাই তো বড় লাভ! অতএব যেভাবেই দুআ কবূল হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই কল্যাণ। সুতরাং যেভাবে চাওয়া হয় সবসময় সেভাবে কবূল হয় না বলে দুআ করে কোন লাভ নেই– এ কথা বলা সর্বৈব ভ্রান্তিকর। ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশে কাজ হয় না– এ কথাও সঠিক নয়। মানুষ যা কিছু ধর্ম-কর্ম করছে তা তো ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ শুনেই করছে। ছোট্ট থাকতে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, বড় ভাই-বোন ও মুরব্বীগণ নসীহত উপদেশ করেছেন, ভাল হতে বলেছেন, গুরুজনকে মান্য করতে বলেছেন, নামায পড়তে বলেছেন, লেখা-পড়ায় মনোযোগ দিতে বলেছেন ইত্যাদি। এসব নসীহত-উপদেশ শুনেই তো আমরা যতটুকু পেরেছি তদনুযায়ী আমল করেছি এবং ভাল পথে অগ্রসর হয়েছি। এসব উপদেশ-নসীহত না শুনলে হয়তো এই ভাল পথে এতটুকু অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব হত না। মানুষ যতটুকু দ্বীনের পথে অগ্রসর হয় তার পশ্চাতে কোন না কোন আলেম বা দ্বীনদার ব্যক্তির নসীহত- উপদেশের ভূমিকা থাকে। অতএব ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশে লাভ কী– এ বক্তব্যও সঠিক নয়। বই-পত্র লেখা দ্বারাও ওয়াজ-নসীহতের ভূমিকা পালিত হয়ে থাকে। বই-পত্র লেখা দ্বারাও দাওয়াত ও তাবলীগের ভূমিকা পালিত হয়ে থাকে। আরবীতে প্রবাদ আছে

القلم أحد اللسانين.

অর্থাৎ, কলম হল দুই জবানের একটি। অতএব বই-পত্র লিখে লাভ কী– এ বক্তব্যও সঠিক নয়। "তাল্‌বীসে ইবলীস", "সাইদুল খাতির", "শয়তানের ডায়েরী" প্রভৃতি বইয়ের ওছীলায় নফ্‌ছ ও শয়তান দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পরিমাণ আগের চেয়ে হ্রাস পায়নি তা কীকরে

www.maktabatulabrar.com

নিশ্চিতভাবে বলা যায়? এগুলো লেখার পূর্বে ইসলামী বই-পত্র পাঠকারীদের মধ্যে যে হারে লোক নফ্ছ ও শয়তান দ্বারা প্রতারিত হত এখন অন্তত তাদের মধ্যেও সে হার হ্রাস পায়নি তা কি কেউ জরিপ করে দেখেছে? এগুলো পাঠ করা দ্বারা যে কয়জন পাঠক নফ্ছ ও শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা পেয়েছে এগুলো লেখা না হলে সে কয়জন তো প্রতারিতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হত। এগুলো লেখা দ্বারা অন্তত তাদের সংখ্যা প্রতারিতদের তালিকা থেকে হ্রাস পেয়েছে। অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায় এগুলো লেখা দ্বারা লাভই হয়েছে। বস্তুত লেখালেখি কোন অবস্থাতেই বেকার নয়। লেখালেখি দ্বারা কিছু না কিছু লাভ হয়েই থাকে। সুতরাং আমি তোমার এ কথায় লেখা থেকে নিবৃত্ত হব না। আমি আমার এ কাংখিত লেখা সম্পন্ন করার চেষ্টা করেই যাব ইনশাআল্লাহ!

নফ্ছ : ঠিক আছে লিখতে পারেন। তবে পূর্বের চেয়ে আপনার ব্যস্ততা এখন অনেক বেড়ে গেছে। একটা সুন্দর লেখা দাঁড় করানোর জন্য যে পরিমাণ সময় ও এনার্জি দিতে হয় তা কি এখন আপনি দিতে পারবেন? না পারলে যেনতেনভাব লেখা সম্পন্ন করবেন, এতে লেখার জগতে আপনার গুডউইল নষ্ট হয়ে যাবে, পাঠক মহলে আপনার সুনাম হ্রাস পাবে। ভেবে দেখুন। ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নেয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি : বুঝলাম এটাও শয়তানের একটা কৌশল। যখন কোন লোক কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে, তখন শুরুতে শয়তানের প্রচেষ্টা থাকে সে কাজটি যেন লোকটা শুরুই করতে না পারে। অবশেষে যখন সে লোক কাজটি করারই সংকল্পে উপনীত হয়, তখন শয়তানের প্রচেষ্টা থাকে যেন সে কাজের মধ্যে রিয়া এসে যায়, ইখলাস আসতে না পারে। তাই আমি বুঝলাম আমার পূর্বেকার লেখা বই-পত্রের গুডউইলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং পাঠক মহলে আমার সুনামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে একদিকে শয়তানের চেষ্টা হল আমার এই নতুন লেখাটিও যেন গুডউইল রক্ষার উদ্দেশ্যে ও সুনাম অর্জনের নিয়তে হয়ে যায় এবং এভাবে আমার এই নতুন রচনাকর্মে শুরু থেকেই রিয়া এসে যায়, কর্মটি ইখলাস-শূন্য হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের রচনাকর্মের মধ্যে ইখলাস থেকে থাকলে সেই ইখলাসও যেন নষ্ট হয়ে রিয়া সে স্থান দখল করে নেয়। আর ব্যস্ততার যে দিকটা তুলে

www.maktabatulabrar.com

ধরা হয়েছে, তা এ কাজের প্রতিবন্ধক কোথায়? আমার ব্যস্ততার সিংহভাগ তো এই লেখালেখি ও রচনা নিয়েই।

নফ্ছ : তাহলে আপনি ইখলাসের সঙ্গেই কাজ শুরু করুন। আল্লাহর শোকর আদায় করুন। আপনার মধ্যে ইখলাস এসে গেছে।

আমি : মনে মনে ভাবলাম আলহামদু লিল্লাহ! শয়তানের প্ররোচনা উপেক্ষা করে ইখলাসের সঙ্গেই কর্মটি শুরু করতে যাচ্ছি। কিন্তু এ-ও বুঝলাম শয়তান সম্পর্কে যা শুনেছি যথার্থই শুনেছি। বুযুর্গানে দ্বীনের বাচনিক আমরা শুনেছি, যখন কেউ কোন নেক কাজ শুরু না করার শয়তানী ওয়াছওয়াছা উপেক্ষা করে এবং রিয়ার চেতনাকে প্রতিহত করে কাজ শুরুই করে দেয়, তখন শয়তান তার মনে ইখলাস এসে যাওয়ার চিন্তা এনে দেয়। এভাবেও সে ইখলাস নষ্ট করে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে থাকে। কেননা, প্রকৃত ইখলাস হল সম্পূর্ণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজ করা। ইখলাস আসল কি আসল না– এই চিন্তাও না থাকা। কেননা, ইখলাস এসে গেছে অর্থাৎ, রিয়া দূর করতে পেরেছি, শয়তানী ওয়াছওয়াছাকে প্রতিহত করতে পেরেছি– এই চিন্তাও এক ধরনের গায়রুল্লাহর চিন্তা তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা। এটাও কিছুটা রিয়া বিজড়িত চিন্তা। তাই ইখলাস এসেছে কি না– এদিকেও খেয়াল না দেয়া চাই। খেয়াল থাকা চাই সর্বতোভাবেই আল্লাহর প্রতি, চিন্তা থাকা চাই পূর্ণটাই আল্লাহ কেন্দ্রিক। এটাই হল নির্ভেজাল ও নিরংকুশ ইখলাস। এ জন্যই জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, "পূর্ণাঙ্গ ইখলাস হল ইখলাসের চিন্তাও না থাকা।" বুঝলাম আমার কর্মে ইখলাস এসে গেছে, অর্থাৎ, আমি মুখলিস তথা ইখলাসের অধিকারী হয়ে গেছি– এ চিন্তাও শয়তানের প্রক্ষিপ্ত একটা চিন্তা। এটাও শয়তানের শেখানো নফ্ছের একটা কথা।

নফ্ছ : ঠিক আছে নফ্ছের সব কথাই আপনি উপেক্ষা করতে পারলেন। এখন লিখুন। আমার কথায় না হোক নিজের ইচ্ছায়ই লিখুন এবং ভালভাবেই লিখুন। আপনি ইচ্ছা করলে ভালভাবেই লিখতে পারবেন। ভাল করে লেখার যোগ্যতা আপনার মধ্যে আছে।

আমি : এটাও একটা শয়তানী কথা। আমার মধ্যে মোটেই কোন যোগ্যতা নেই, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিটেফোটা কিছু আছে বলে মনে হলেও

তাতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আমার অল্প-বিস্তর কিছু লেখা কতক মানুষের কাছে ভাল বলে গৃহীত হয়ে থাকলেও তা আমার যোগ্যতায় হয়নি, আল্লাহর রহমতেই হয়েছে। এ সবকিছুর জন্য অহংকার বা গর্ববোধ নয় বরং আল্লাহর শোকর। বুঝলাম শয়তান আমার যোগ্যতার কথা তুলে ধরে আমাকে আত্মম্ভরী করে তোলার চেষ্টা করছে, এই নতুন রচনা কর্মে আল্লাহর উপর ভরসার কথা এবং আল্লাহ থেকে রহমত কামনা করার কথা বিস্মৃত হয়ে নিজের যোগ্যতার উপর ভর করে চলার মত বিকৃত মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করছে। হে আল্লাহ! আমরা যেন আত্মম্ভরিতায় মাথা উঁচু করতে প্ররোচিত না হই, তাওয়াজু ও বিনয়ে মাথা অবনত করে তোমার দাসত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে যেন উদ্বুদ্ধ হই।

ভিতর থেকে একটা কথা এল– শয়তানের সব প্রক্ষেপন উপেক্ষা করে এ লেখাটির জন্য সংকল্পই করে নিলাম। তবে ভাবনা এল কি জানি এই সংকল্পের পেছনেও শয়তানের দখল রয়েছে কি না। কারণ, এ লেখাটি শুরু করলে ৫–৬ খণ্ডে সমাপ্ত করার পরিকল্পনায় যে "ইসলামী ইতিহাস" সংকলনের কাজে হাত দিয়েছি, সেই সঙ্গে শুরু করেছি "ইসলামী ভূগোল ও মানচিত্রাবলী"–এর কাজ। এ লেখার পেছনে সময় ব্যয় করলে সেই গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও সংকলনের কাজ দুটো পিছিয়ে যাবে না তো? তাহলে এখন কোন্টাকে প্রাধান্য দিব? কোন্টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? কোন্টার ফায়দা বেশি, কোন্টা আগে করা চাই, কোন্টা পরে করা চাই? নাকি সবগুলোই একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া চাই?

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্নবোধক চিহ্ন! সিদ্ধান্ত গ্রহণে দিশেহারা হওয়ার মত অবস্থা। সবটাই যখন ভাল মনে হচ্ছে তখন কোন্টাকে প্রাধান্য দিব? সবটাই যখন গুরুত্বপূর্ণ ও ফায়দাজনক মনে হচ্ছে, তখন তুলনামূলক ভাবে কোন্টার গুরুত্ব বা ফায়দা বেশি তা নির্ণয় করা কি এত সহজ? এক এক প্রেক্ষিতে এক একটার গুরুত্ব ও ফায়দা কম বেশি বিবেচিত হয়ে থাকে। এই প্রেক্ষিতগুলোর মধ্যকার তারতম্য পরিমাপ করা কি গজ ফিতা দিয়ে পরিমাপ করার মত সহজ? এমতাবস্থায় কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হব? মনে হল আমি এখন দিশেহারা পরিস্থিতির শিকার। সত্যিই নফ্ছ ও শয়তানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক সময়ই এরকম দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। অনেক সময় একারণেও দিশেহারা হয়ে যেতে

www.maktabatulabrar.com

হয় যে, কোন্টা নফ্ছ ও শয়তানের কথা আর কোন্টা বুদ্ধি-বিবেকের ফয়সালা তা পার্থক্য করা জটিল হয়ে পড়ে। বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, এরূপ মুহূর্তে সচেতন দ্বীনী মুরব্বী থেকে মাশওয়ারা গ্রহণ পূর্বক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে যে কোন একটা পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হতে হয় কিংবা সবটা একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে সবটাই চালিয়ে যেতে হয়। সেমতে আমি তাওয়াক্কুলান আলাল্লাহ (আল্লাহর উপর ভরসা করে) উভয় কাজই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিশেষত এ লেখাটি শুরু করার ব্যাপারে মুরব্বীর মাশওয়ারা যেখানে রয়েছেই। বিগত (১৪৩০ হিজরী মুতাবেক ২০০৯ খৃষ্টাব্দ) হজ্জের সফরে মক্কার মসজিদে হারামের আন্ডারগ্রাউন্ডে বসে হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের সামনে এ লেখা সম্বন্ধে পরিকল্পনা পেশ করলে তিনি আশু এ লেখাটি শুরু করে দেয়ার ব্যাপারে আমাকে জোর মাশওয়ারা দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে দ্বীনী ও ইল্‌মী বিষয়ে মুরব্বী পর্যায়েরই ব্যক্তিত্ব মনে করি। যাহোক এসব কিছুর প্রেক্ষিতে আমি অন্যান্য লেখা ও রচনার সঙ্গে সঙ্গে এ লেখাটিও চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

ভিতর থেকে আরও একটা কথা এল– আপনি খুবই সতর্ক মানুষ। শয়তানের সব ধোঁকাই বুঝতে পারেন এবং যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সতর্কতা না থাকলে আপনি এত সুক্ষ্ম ওয়াছওয়াছা বুঝতে পারতেন না, ওয়াছওয়াছার শিকার হয়ে পড়তেন, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হতেন না। সতর্কতাই আপনাকে রক্ষা করেছে।

বুঝলাম এ-ও একটা শয়তানী কথা। সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে এবং শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে সদাসর্বদা সতর্ক থাকার হুকুমও রয়েছে, কিন্তু শুধু সতর্কতা দ্বারাই রক্ষা পাওয়া যায় না, যদি না আল্লাহ তাআলা তাঁর খাস রহমতে আমাদেরকে রক্ষা করেন। অতএব সতর্কতা দ্বারাই রক্ষা পেয়ে গেছি– এটা শয়তানী কথা। মনে পড়ে গেল এক বুযুর্গের একটা ঘটনা। একবার সে বুযুর্গের কাছে শয়তান আসল। বুযুর্গ দেখলেন উপরে শূন্যে বিরাট এক আসনে এক মহা বুযুর্গের আকৃতি নিয়ে একজন বসে আছেন। তিনি সে বুযুর্গকে সম্বোধন করে বলছেন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি! তোমার আর ইবাদত করার প্রয়োজন নেই।" এ ছিল শয়তান। উক্ত বুযুর্গ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে উঠলেন "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা

ইল্লা বিল্লাহ”। এবং বললেন, দুনিয়ার চোখে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কাজেই তুমি শয়তান। তখন শয়তান বলল, তোমার ইল্‌ম তোমাকে রক্ষা করেছে। বুযুর্গ বললেন, এটাও শয়তানী কথা। ইল্‌ম রক্ষা করতে পারে না, রক্ষা করেন আল্লাহ তাআলা। কোন সাধারণ মানুষ হলে মনে করত স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উপস্থিত হয়ে এরকম বলছেন, আমি তো কামেল হয়ে গেছি! এভাবে সে ধোঁকা খেত। কিন্তু উক্ত বুযুর্গ বুঝলেন এটা শয়তান। তাই তিনি “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” পড়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দিলেন।

আমারও মনে হল এখন “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” বা শয়তানকে তাড়াবার প্রসিদ্ধ বাক্য– “ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম” পড়ে নেই। তদুপরি লেখালেখির এ প্রসঙ্গটা নিয়ে দীর্ঘদিন নফ্‌ছ ও শয়তানের সঙ্গে বাহাছ চলছে। আর কতদিন নফ্‌ছ ও শয়তানের সঙ্গে বাহাছ করে কালক্ষেপন করব। নফ্‌ছ ও শয়তান এভাবে কথা এবং চিন্তার আবর্তে ফেলেও কালক্ষেপন করিয়ে নেক কাজ শুরু করাতে বিলম্ব ঘটিয়ে থাকে। কাজেই কালক্ষেপন করে শয়তানের আনুকূল্য না করা চাই।
কেউ যখন সব রকম ওয়াছওয়াছা ঝেড়ে ফেলে কোন নেক কাজ শুরু করবে বলেই স্থির করে নেয়, তখন সেটা শুরু করাতে বিলম্ব ঘটাতে পারলে ও শয়তান কিছুটা শান্তনা বোধ করে এই ভেবে যে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও তো তাকে কাজটা থেকে বিরত রাখতে পারলাম! আমার এ ক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে না তো? অতএব এই বাহাছের আবর্তে পড়ে আর কালক্ষেপন নয়। আমাকে এই কালক্ষেপনের চক্কর থেকে উঠে এসে কাজ শুরু করতে হলে এখনই শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। প্রয়োগ করলাম শয়তানকে তাড়াবার সেই প্রসিদ্ধ অস্ত্র। যে অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা দেয়া হয়েছে কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে–

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ, যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন উস্কানী তোমাকে পেয়ে বসে, তাহলে আল্লাহর কাছে (শয়তান থেকে) পানাহ চাও। (যেমন– পাঠ কর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম। তাহলে শয়তান ভেগে যাবে।) আল্লাহ সবই শোনেন সবই জানেন। (সূরা হা মীম আস–সাজদাহ: ৩৬)

www.maktabatulabrar.com

পাঠ করলাম “ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম”। শয়তান ভেগে গেল। সহযোগীর আকস্মিক অন্তর্ধানে নফ্‌ছও আপাতত ভ্যাবাচাকা খেয়ে থেমে গেল।

মুদাররিস বা শিক্ষকদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

যারা মাদ্রাসার মুদাররিস তথা শিক্ষক তাদের তালীম তথা শিক্ষাদান হওয়া চাই দ্বীনী ইলমের প্রচার প্রসার পূর্বক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন বিশেষ কোন কিতাব বা বড় কোন কিতাব পড়ানোর ওপর নির্ভরশীল নয়। বড় কিতাব বা বিশেষ কোন পড়ানোর মাধ্যমেও যেমন এই সন্তুষ্টি অর্জন হতে পারে, ছোট বা সাধারণ যেকোনো কিতাব পড়ানোর মাধ্যমেও তা হতে পারে। তাই কোন মুদাররিসের উপর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ থেকে ছোট বড় নির্বিশেষে যেকোনো কিতাব পড়ানোর দায়িত্ব আসুক খোলামনে তা পড়ানোই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে ইখলাসের চেতনা। কিন্তু শয়তান মুদাররিসদের এই ইখলাসের চেতনা থেকে সরানোর জন্য তাদেরকে ওয়াছওয়াছা দেয় বড় কিতাব না পড়ালে ছাত্ররা বড় হুজূর হিসেবে মূল্যায়ন করবে না, অন্য উস্তাদদের কাছেও ছোট উস্তাদ হিসেবে গণ্য হতে হবে, বাইরের কেউ যখন জিজ্ঞাসা করবে আপনি কী কিতাব পড়ান তখন যদি বড় কিতাব বা বিশেষ কোন কিতাবের নাম বলতে না পারি তাহলে তো তাদের কাছে আমি ছোট হয়ে যাব। এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করার জন্য দুটো কাজ করা চাই। যথা:
(১) এই চিন্তা করা চাই যে, বড় হিসেবে সম্মান পাওয়ার পদ্ধতি শুধু এই একটাই নয় যে, আমাকে বড় কিতাব পড়াতে হবে। আল্লাহ যদি আমাকে বড় হিসেবে সম্মান দিতে চান অন্য কোন পন্থায়ও তা দিতে পারেন। আর যদি না চান তাহলে কোনোভাবেই সম্মান আসবে না বরং সম্মান অর্জনের জন্য অসৎ পন্থা অবলম্বন করলে অসম্মানও আসতে পারে। কুরআনে কারীমের দুটো আয়াত সামনে রাখা চাই।

(১) ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.﴾

অর্থাৎ, তুমি যাকে চাও ইজ্জত দাও, যাকে চাও বে-ইজ্জত কর। তোমারই হাতে কল্যাণ। তুমি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (সূরা আলে ইমরান: ২৬)

(২) ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে অপমান দেন তাকে সম্মান দেয়ার কেউ নেই। অবশ্যই আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। (সূরা হজ্জ: ১৮)

(২) এই চিন্তা করা যে, নিজেকে নিজে বড় মনে করা ঠিক নয়। তবে অন্যদের দৃষ্টিতে যেন বড় ও সম্মানী প্রতিপন্ন হওয়া যায় তার জন্য হাদীছে যে দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা করা যায়। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا.» (أخرجه البزار وقال : وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا عقبة الأصم وهو رجل من أهل البصرة ليس به بأس .)

অর্থাৎ, হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে (যা দিয়েছ তার ওপর) শোকরকারী বানাও। আমাকে সবরকারী বানাও। আমাকে নিজের দৃষ্টিতে ছোট আর অন্যের দৃষ্টিতে বড় বানাও। (মুসনাদে বায্যার: হাদীছ ৪৪৩৯)

উপরোক্ত ওয়াছওয়াছা ছাড়াও মুদাররিসদের আরও যেসব ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে তার মধ্যে রয়েছে:

- আমাকে কোন্ গ্রেডের উস্তাদ গণ্য করা হচ্ছে। অমুক উস্তাদ আমার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সে অমুক গ্রেডের হতে পারলে আমাকে কেন তার চেয়ে নিচের গ্রেডের গণ্য করা হচ্ছে? আর নিচের গ্রেডের গণ্য হওয়ায় আমি বেতন- ভাতাও কম পাচ্ছি। এগুলো অন্যায়। এর প্রতিকার হতে হবে। এই চেতনা যে শয়তানের ওয়াছওয়াছা তার প্রমাণ হল– এই চেতনা থেকে প্রতিকারের নামে নিজের খাহেশ বাস্তবায়ন করতে যেয়ে মাদ্রাসায় ফেতনা লাগানো হয়। ফেতনা কীভাবে লাগানো হয় তার পদ্ধতি ও বিরবণ এরূপ– সেই উস্তাদকে ছোট প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়, তার বিরুদ্ধে সমালোচনা চালানো হয়, তার বদনাম রটানো হয়, অন্যায়ভাবে হলেও তার অযোগ্যতা প্রমাণের অপচেষ্টা চালানো

www.maktabatulabrar.com

হয় ইত্যাদি। কিছুতেই কিছু করতে না পারলে অগত্যা তার নামে চারিত্রিক কেলেংকারি রটিয়ে দিয়ে হলেও তাকে বিদায় দেয়ার সূত্র বের করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। নাউযু বিল্লাহ!

এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করার জন্য তিনটা বিষয় চিন্তায় উজ্জীবিত করা চাই।

(১) আমাকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উস্তাদদের গ্রেড নির্ধারণ ও তদনুযায়ী সবকিছু ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব দেয়নি। অতএব এখানে আমার মাথা ঢোকানো ঠিক নয়।

(২) নিজের ন্যায্য অধিকার বা নিজের উপযুক্ত প্রাপ্য অর্জিত না হলে সবর করা চাই আর আল্লাহর কাছে নিজের প্রাপ্যের জন্য দুআ করা চাই। যেমন এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «سَتَكُوْنُ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا. قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ.» (رواه البخاري برقم ٣٦٠٣)

অর্থাৎ, হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সামনে তোমরা দেখবে তোমাদের অধিকারের উপর অন্যের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। আরও অনেক অপছন্দনীয় জিনিস তোমরা দেখবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! তখন আমাদের কী করতে বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, তোমাদের যা করণীয় তা করবে, আর তোমাদের প্রাপ্যের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আবেদন জানাবে। (বোখারী)

(৩) অন্য কাউকে ছোট করার চেষ্টা করলে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাআলা আমাকে ছোট প্রতিপন্ন করতে পারেন। কারণ আল্লাহর নীতি হল তাঁর কোন বান্দার বেলায় আমি যা করব আল্লাহ আমার বেলায়ও তা করবেন। যেমন: এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, اِرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا، وَاغْفِرُوْا يُغْفَرْ لَكُمْ. (رواه أحمد بسند صحيح) (অর্থাৎ, অন্যের প্রতি দয়া কর তোমার প্রতি দয়া করা হবে। অন্যকে ক্ষমা কর তোমাকে ক্ষমা করা হবে।)

আর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. (رواه البخاري في كتاب الأدب) (অর্থাৎ, যে অন্যের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না। বুঝা গেল অন্যের প্রতি দয়া করলে আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন।) আর এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاري في حديث طويل في كتاب المظالم) (অর্থাৎ, যে অন্য মুসলমানের দোষ গোপন করে আল্লাহও তার দোষ গোপন রাখেন।) এ জাতীয় আরও অনেক হাদীছ রয়েছে। এসব হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয়– আল্লাহর নীতি হল কেউ তাঁর কোন বান্দার বেলায় যা করবে তিনিও তার বেলায়ও তা-ই করবেন।

- অমুক উস্তাদ আমার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে অমুক পদ দেয়া হয়েছে, আমাকে কেন সে পদ দেয়া হয় না। এভাবে আমাকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। এর প্রতিকার হওয়া চাই। এই চেতনা থেকে প্রতিকারের নামে নিজের খাহেশ বাস্তবায়ন করতে যেয়ে মাদ্রাসায় ফেতনা লাগানো হয়। ফেতনা কীভাবে লাগানো হয় পূর্বের অনুচ্ছেদে তার পদ্ধতি ও বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এবং এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করার জন্য কি করণীয় তা-ও পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের হাজিরা খাতায় আমার নাম অমুক অমুকের পরে লেখা হল কেন? এভাবে তাদেরকে বড় আর আমাকে ছোট প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এর প্রতিকার হওয়া চাই!
- অমুক উস্তাদকে অমুক বড় কিতাব দেয়া হয়েছে, আমি তার চেয়ে যোগ্য। অতএব আমার ঐ কিতাব পেতেই হবে, এর জন্য যা করার তা করতে হবে। এই চেতনা থেকে সেই উস্তাদের বিরুদ্ধে লাগা হয়। এই চেতনাও শয়তানেরই ওয়াছওয়াছা।

এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করার জন্য চিন্তা করা চাই আল্লাহ যদি আমার দ্বারা সেই কিতাব পড়ানো ভাল মনে করেন তাহলে তার ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তা এ মাদ্রাসায়ও হতে পারে অন্য কোন মাদ্রাসায়ও হতে পারে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন কিছু চান তার আনুষঙ্গিক সব উপকরণেরও সেভাবেই সমন্বয় ঘটান। إذا أراد الله شيئا. هيّأ له أسبابه

- দরসে পাঠদানের সময় বিশেষ বিশেষ তথ্যের হাওয়ালা এবং শরাহ শুরুহাতের নাম উল্লেখ না করাও শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকেই হয়ে থাকে। শয়তান মনে এই চিন্তা এনে দেয় যে, আমি যা কিছু বলছি তা কোন্ কোন্ কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছি সেসবের বরাত যদি উল্লেখ করি তাহলে ছাত্ররা জেনেই নিল আমি কোন কোন কিতাব থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাহলে আমার কোন কৃতিত্ব থাকল না। তাহলে ছাত্ররা আর আমার তাকরীরের প্রতি আগ্রহী থাকবে না, বরং মনে করবে উস্তাদ যা বলেন তা আমরাও সংগ্রহ করে নিতে পারি। আর যদি বরাত উল্লেখ না করি তাহলে আমার তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তারা কৌতুহলী থাকবে, আমার বক্তব্যের প্রতি তাদের আগ্রহ থাকবে যে, ছুটে গেলে আর পাওয়া যাবে না। বস্তুত এটা শয়তানেরই ওয়াছওয়াছা। উস্তাদ যদি ছাত্রদেরকে তথ্য ও তত্ত্বের বরাত উল্লেখ করেন, কোন্ বিষয় কোন্ কিতাবে ভাল লেখা হয়েছে তার বিবরণ প্রদান করেন, কোন্ শরাহর হাইছিয়াত কি তা খুলে বুঝিয়ে দেন, তাহলে কোন্ জাতীয় বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব কোন্ কোন্ কিতাব থেকে সংগ্রহ করা যায়, কোন্ কিতাবের হাইছিয়াত কি, সে বিষয়ে ছাত্রদের ধারণা জন্মে। এই ধারণা ছাত্রদের মুতালাআ করার আগ্রহ জন্মায়, এতে কিতাবাদি সম্বন্ধে শুরু থেকেই তাদের বসীরত পয়দা হয় যা তাদের যোগ্য হওয়ার পথ খুলে দেয়। ছাত্রদের মধ্যে যেন এমন ধারণা জন্মাতে না পারে, তাদের যোগ্য হওয়ার পথ যেন না খোলে তাই শয়তান ওয়াছওয়াছা দিয়ে উস্তাদদেরকে এ সমস্ত বিবরণ প্রদান থেকে বিরত রাখে।

এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলার জন্য উস্তাদদের মনে রাখা চাই ছাত্ররা কখনই এরূপ মনে করে না যে, উস্তাদের কাছে আসমান থেকে ওহী নাযেল হয় আর তিনি আমাদেরকে তা শেখান। সব ছাত্রই বোঝে উস্তাদ কোন না কোন কিতাব দেখেই বলে থাকেন। অনেক সময় ছাত্রদের মধ্যে যারা অল্প-বিস্তর মুতালাআ করে তারা স্পষ্টতই টের পায় উস্তাদ কোন্ কিতাবের সহযোগিতা নিয়ে বলছেন, সেক্ষেত্রে উস্তাদ বরাত উল্লেখ না করলে ছাত্ররা বরং উস্তাদের লুকোচুরি দেখে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে ওয়াছওয়াছা

মুরীদদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

১. মুরীদ হতে চাইলে শুরুতেই ওওয়াছওয়াছা হয় যার হাতে মুরীদ হব, তার কোনো করামত আছে কি না। কিছু একটা কারামত বা অলৌকিক কিছু না দেখলে তাকে কামেল মানুষ বিশ্বাসই হতে চায় না। এভাবে তার পক্ষে কোনদিনই হয়ত কারও হাতে বায়আত হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেক সময় মুরীদ হওয়ার পরও শায়েখের কোন কারামত ইত্যাদি না দেখার ফলে তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। অথচ কামেল হওয়ার জন্য কারামত থাকা শর্ত নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.)-এর একটা ঘটনা শুনুন। এক লোক হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। দশ বছর হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.)-এর খেদমতে থাকার পর একদিন রাতে চিন্তা করেন এই দশ বছর হযরত থেকে কোন কারামত দেখতে পেলাম না। না, এখানে আর থাকব না। আগামীকালই চলে যাব। পরদিন সকালে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) তাকে বললেন, বল দিলে কী কথা এসেছে। তিনি অকপটে বললেন, হযরত! দিলের মধ্যে এই কথা এসেছে যে, দশ বছর হযরত থেকে কোন কারামত দেখতে পেলাম না। না, এখানে আর থাকব না। আগামীকালই চলে যাব। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী কারামত আছে? তিনি বললেন, হযরত আমি ধ্যান করে কবরে প্রবেশ করে কবরবাসী সম্বন্ধে তথ্য জেনে আসতে পারি। তখন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ,) বললেন, তুমি তো ধ্যান করে কবরবাসীদের সম্বন্ধে তথ্য জানবে আর আমি এখানে বসে ডাক দিব, কবরবাসী উঠে এসে আমাকে তথ্য জানিয়ে যাবে। কিন্তু এটা কোন কামালিয়াত নয়। তুমি বল, এই দশ বছর আমার খেদমতে থেকেছ, আমার থেকে ফরয ওয়াজিব নয় কোন সুন্নাত মুস্তাহাব ছুটতে দেখেছ?[1] তিনি বললেন, না।

১। বস্তুত সুন্নাতে গায়র মুআক্কাদা বা মুস্তাহাব ছোটা কামেল হওয়ার পরিপন্থী নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) মূলত তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন কেউ কামেল কি না তা বোঝার জন্য তার থেকে কারামত বা অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেল কি না তা দেখার দরকার নেই। তাঁর আমল ঠিক কি না– এটাই দেখার বিষয়। এটা বোঝাতে গিয়েই তিনি নিজের সম্বন্ধে এভাবে বলে থাকবেন।

www.maktabatulabrar.com

তখন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ,) বললেন, এটাই হচ্ছে কামালিয়াত, এটাই হচ্ছে বুযুর্গী।

২. মুরীদ হতে চাইলে শুরুতেই আরও যেসব ওয়াছওয়াছা হয় তার মধ্যে আর একটা হল যার হাতে বায়আত হব তার নাম-ডাক কেমন আছে তা দেখা, তার মুরীদের সংখ্যা অনেক আছে কি না তা দেখা, নামী দামী প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তার মুরীদ আছে কি না তা দেখা ইত্যাদি। অথচ নাম-ডাক থাকা, মুরীদের সংখ্যা বেশি থাকা এবং তার মুরীদের মধ্যে প্রভাবশালী লোক থাকা ইত্যাদি কারও কামেল বা হক্কানী হওয়ার দলীল নয়। কারও কাছে মুরীদ হতে চাইলে যা দেখা দরকার তা হচ্ছে তিনি হক্কপন্থী লোক কি না, তিনি হক্কানী সিলসিলার শায়খ কি না, তিনি শরীয়ত সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তি কি না, তিনি আমলদার কি না, তার তালীম তালকীনে মুরীদদের ফায়দা হয় কি না অর্থাৎ, তার কাছে যারা মুরীদ হয়েছে মুরীদ হওয়ার পর তাদের তাকওয়া পরহেযগারী ও দ্বীনদারী বৃদ্ধি পেয়েছে কি না ইত্যাদি।

৩. মুরীদ হতে চাইলে আরও যেসব ওয়াছওয়াছা হয় তার মধ্যে এ-ও রয়েছে যে, যার হাতে বায়আত হব তিনি নির্দোষ, নিখুঁত মানুষ কি না। যদি তার জীবনে –অতীতে হলেও– কোন দোষ সম্বন্ধে জানতে পারে তাহলে তার হাতে আর বায়আত হতে চায় না, যদিও তিনি বর্তমানে মুরীদদেরকে ইসলাহ করার যোগ্যতায় উপনীত হয়ে থাকেন। এরূপ ওয়াছওয়াছা হলে মনকে বোঝানো চাই মানুষ ফেরেশতা নয়, তাই তার কিছু দোষ-ত্রুটি থাকতেই পারে। বায়আত হওয়ার জন্য ফেরেশতাদের মত নিষ্পাপ পীর-মাশায়েখ খুঁজলে জীবনে আদৌ বায়আত হওয়া ভাগ্যে জুটবে না। যেমন প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফুযায়েল ইবনে ইয়াজ (রহ.) বলেছেন, কেউ সম্পূর্ণ নির্দোষ নিষ্কলুষ বন্ধু খুঁজলে জীবনে কোনোদিন বন্ধু খুঁজে পাবে না।

৪. মুরীদ হওয়ার পরও মুরীদের মনে শায়েখ সম্বন্ধে নানান রকম ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে। কখনও হয়ত শায়েখ থেকে কোন সুন্নাত মুস্তাহাব পর্যায়ের কোন আমল ছুটতে দেখল, অমনি তার ভক্তি নষ্ট হয়ে গেল। অথচ সুন্নাতে গায়র মুআক্কাদা বা মুস্তাহাব ছোটা কামালিয়াত না থাকা বা নষ্ট হওয়ার দলীল নয়। ওজর থাকলে সুন্নাতে মুআক্কাদাও ছুটে

যাওয়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যেকোনো রকমের সুন্নাত বা মুস্তাহাব ছুটতে দেখলেই মুরীদের মনে শয়তান ওয়াছওয়াছা দেয় ইনি কামেল লোক নন, নইলে সুন্নাত মুস্তাহাব ছোটে কেন? এ ক্ষেত্রে শায়খের কোন ওজর আছে কি না তা ভাববারও সুযোগ শয়তান দেয় না।

৫. মুরীদ যিকির-আযকার, মা'মূলাত, নফল তাহাজ্জুদ ইত্যাদি শুরু করার পর অনেক সময় বিভিন্ন লতীফার বিভিন্ন নূর তার সামনে ভেসে উঠতে পারে। তা দেখেও অনেকে ওয়াছওয়াছার শিকার হয় যে বুঝি কামেল হয়ে গেছি। অথচ এগুলো কামেল হওয়ার কোন দলীল নয়। খেয়ালাতের কারণেও অনেক সময় নূর বা বিশেষ ধরনের কোন আলো দেখছে বলে মনে হতে পারে। অতএব কোন নূর দেখা আদৌ কামেল হওয়ার দলীল নয়। এগুলোর দিকে মোটেই খেয়াল না দেয়া চাই।

৬. অনেক সময় যিকির-আযকার ও মামূলাত শুরু করার পর কোন নূর ইত্যাদি কিছু না দেখলেও কিংবা ভিতরে বিশেষ কোন জয্‌বা বা হালাত অনুভূত না হলেও মুরীদ ওয়াছওয়াছার শিকার হয় যে, বুঝি তার যিকির-আযকার ও মামূলাত বেকার যাচ্ছে। অথচ যিকির-আযকার ও মামূলাতের দ্বারা নূর দেখা যাবে কিংবা বিশেষ কোন জযবা বা হালাত পয়দা হবেই এমন কোন অপরিহার্যতা নেই। মনে রাখতে হবে নূর, জযবা, হালাত– এগুলো যিকির-আযকার ও মামূলাতের উদ্দেশ্য নয়। যিকির-আযকার ও মামূলাতের উদ্দেশ্য হল কলবের ময়লা পরিষ্কার করা, কলবকে শক্তিশালী করা, কলবে নেক কাজের প্রতি আগ্রহ এবং গোনাহের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি করা। সর্বোপরি কলবকে সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে অভ্যস্ত করে তোলা।

৭. মাঝে মধ্যে যিকির-আযকার বা মামূলাত ছুটে গেলে অনেকের ওয়াছওয়াছা হয় যে, যখন নিয়মিত যিকির-আযকার ও মামূলাত আদায় করতে পারি না, তখন আর এগুলো করে লাভ কী? এভাবে সম্পূর্ণরূপে যিকির আযকার ও মামূলাত থেকে সে দূরে সরে পড়ে। তাই মাশায়েখে কেরাম বলেন, নিয়মিত যিকির-আযকার ও মামূলাত আদায় করা হয়ে না উঠলেও মাঝে মধ্যে যে আদায় করা হচ্ছে এটাও তো এক ধরনের নিয়মিত করা। অতএব মাঝে মধ্যে ছুটে গেলেও হতাশ হয়ে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে নেই। মনে রাখতে হবে মানুষের আগ্রহ, জযবা, ইচ্ছা

www.maktabatulabrar.com

ইত্যাদির মধ্যে কমবেশি হয়েই থাকে, এগুলোর মধ্যে জোয়ার-ভাটা হয়েই থাকে। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই মাঝে মধ্যে যিকির-আযকার ও মামূলাত ছুটতেই পারে, এজন্য হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকা চাই এবং নিয়ত ও হিম্মত রাখা চাই যেন নিয়মিত আদায় করা যায়।

৮. কোন সমস্যা বা বিপদ-আপদে শায়েখের কাছে দুআ চাইলে যদি সমস্যা না কাটে বা বিপদ-আপদ দূর না হয়, তাহলেও অনেক মুরীদের মনে ওয়াছওয়াছা আসে বুঝি শায়খ কামেল লোক নন। অথচ দুআ কবূল হওয়ার ক্ষেত্রে শায়েখের কোন হাত নেই। শায়েখ সমস্যা দূর করার কিংবা বিপদ-আপদ কাটানোর মালিক নন। আল্লাহ তাআলা যদি কারও সমস্যা দূর না করার কিংবা বিপদ-আপদ না কাটানোর সিদ্ধান্ত করেন এবং তার মধ্যে বান্দার কোন না কোনভাবে মঙ্গল নিহীত থাকে, তাহলে শায়খ কেন কেউই দুআ করে তা পাল্টাতে পারবে না। শায়েখ খোদা নন যে, যা ইচ্ছা তা-ই করে ফেলবেন।

৯. অনেক মুরীদের শায়খ থেকে খেলাফত পাওয়ার জন্য নানান রকম ফন্দী-ফিকিরের ওয়াছওয়াছা হয়। সেই ওয়াছওয়াছাবশত মুরীদ শায়েখের অতিমাত্রায় প্রশংসা করতে শুরু করে, শায়েখের প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি জাহির করতে শুরু করে, শায়েখের অনুকূলে বিভিন্ন রকম কল্পিত স্বপ্ন শায়েখকে শোনায়। এসবের পিছনে উদ্দেশ্য থাকে যেন শায়েক তাকে তাড়াতাড়ি খেলাফত দিয়ে দেন। কিন্তু মুরীদ এ কথা চিন্তা করে দেখে না যে, খেলাফত পেলেই কি বিরাট কিছু পাওয়া হল? এই খেলাফতের সার্টিফিকেট দেখিয়ে কি কবর, হাশর, মীযান, পুলসিরাত কোথাও বাড়তি কোন সুযোগ পাওয়া যাবে? নিশ্চয় না। মনে রাখতে হবে কোন শায়েখ কাউকে খেলাফত দিলে তার অর্থ এই নয় যে, যাকে খেলাফত দেয়া হয়েছে সে কামেল হয়ে গেছে। শায়েখ যখন তরীকতের সঙ্গে কারও মুনাছাবাত হয়ে গেছে বুঝতে পারেন এবং একথা বুঝতে পারেন যে, সে অন্যকে তালীম তালকীন করার যোগ্যতা অর্জন করেছে তখনই তাকে খেলাফত দিয়ে থাকেন। সে কামেল হয়ে গেছে বোঝার উপর খেলাফত প্রদান নির্ভরশীল নয়। অতএব খেলাফত পাওয়া আদৌ কামেল হওয়ার দলীল নয়।

১০. অনেক সময় মুরীদের ওয়াছওয়াছা হয় যে, শায়খ অমুককে কেন খেলাফত দিলেন? ও লোকটা তো ভাল নয়, ওর এই দোষ সেই দোষ! ওয়াছওয়াছা হয় যে, আসলে শায়েখের মধ্যে ভাল-মন্দ বুঝার যোগ্যতা নেই, কিংবা বিশেষ কোন স্বার্থে শায়েখ তাকে খেলাফত দিয়েছেন, অতএব এই শায়েখকে বর্জন করা উচিত। এই ভেবে সে শায়খ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেক সময় সমূলে তরীকতের লাইন থেকেই বিচ্যুত হয়ে যায়। এই ওয়াছওয়াছার প্রতিকার পূর্বের আলোচনায় এসে গিয়েছে। পূর্বের অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কাউকে কামেল বোঝার উপর খেলাফত প্রদান নির্ভরশীল নয়। শায়েখ যখন তরীকতের সঙ্গে কারও মুনাছাবাত হয়ে গেছে বুঝতে পারেন এবং একথা বুঝতে পারেন যে, সে অন্যকে তালীম তালকীন করার যোগ্যতা অর্জন করেছে তখনই তাকে খেলাফত দিয়ে থাকেন। কাজেই শায়েখ কাউকে খেলাফত দিয়েছেন এর অর্থ আদৌ এ নয় যে, তিনি তাকে কামেল হিসেবে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন। তদুপরি পীর বা শায়েখ গায়েব জানেন না, তিনি কারও জাহিরী হালাত দেখেই বিচার-বিবেচনা করে থাকেন, তার বিচার-বিবেচনায় ভুলও হতে পারে। তাই শায়েখ কাকে খেলাফত দিলেন, কাকে এজাযত দিলেন– এসবের জন্য শায়েখের ব্যাপারে কুধারণা না করা চাই। শয়তানই কুধারণা সৃষ্টি করে দিয়ে শায়খ থেকে তথা তরীকতের লাইন থেকে বিচ্যুত করার কৌশল নিয়ে থাকতে পারে।

ছাত্রদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

ছাত্রদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়, তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. আমরা এখন ছাত্র। ছাত্রদের দশ খুন মাফ। এই ওয়াছওয়াছা থেকে ছাত্ররা বে-পরোয়া হওয়ার চেতনা লাভ করে। কোন ছাত্র কোন অন্যায় করলে সমাজের অনেককেও বলতে শোনা যায় আরে ও ছাত্রমানুষ ওকে ছেড়ে দাও। তিনি বোঝাতে চান ছাত্রদের অন্যায় কোন অন্যায় নয়, ছাত্রদের অন্যায় ধরতে নেই। অথচ ছাত্রদের অন্যায় অন্যায় নয়, ছাত্রদের অন্যায় ধরতে নেই –এটা

www.maktabatulabrar.com

কুরআন-সুন্নাহর কোন কথা তো নয়ই যুক্তিসম্মত কথাও নয়। বরং যুক্তিতে বলে ছাত্রদের অন্যায় বেশি করে ধরা দরকার। কেননা ছাত্র-বয়স তাদের শেখার সময়, এটা তাদের সংশোধনের সময়, তাই এখন তাদের দোষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধরা দরকার, যাতে তাদের শিক্ষা অর্জন হয়, ভুল-বিচ্যুতি সম্বন্ধে এখন থেকেই তারা সচেতন হয় এবং তাদের সংশোধন হয়ে যায়।

২. ছাত্রসমাজ হচ্ছে শক্তি, তারা হচ্ছে প্রতিবাদী কণ্ঠ, ছাত্রসমাজই যুগে যুগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। এসব কথা থেকে ছাত্রসমাজ পড়ালেখা বাদ দিয়ে আন্দোলনের জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ছাত্রসমাজকে আন্দোলনে লাগানোর জন্য ছাত্রদেরকে এসব রক্ত-গরম-করা কথা শোনায়। এসব কথায় ছাত্রসমাজ ধোঁকায় পড়ে যায়, তারা আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে এবং লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়। ছাত্রসমাজকে লেখাপড়া থেকে দূরে সরানোর জন্য শয়তানই হয়তো এসব কথা শিখিয়েছে। বস্তুত ছাত্রজীবন কর্মজীবন নয়, ছাত্রজীবনকে একান্তই একাডেমিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ছাত্রজীবনকে কোনোভাবেই কর্মমুখী করে তোলা যাবে না। লেখাপড়াই ছাত্রদের একমাত্র দায়িত্ব– এসব চিন্তা জাগ্রত রাখলেই সমাজের কিছু লোকের উপরোক্ত রক্ত-গরম-করা কথামালা সত্ত্বেও ছাত্ররা আন্দোলনমুখী হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

৩. ক্লাসে শিক্ষকের পাঠদানের সময় অনেক ছাত্রের ওয়াছওয়াছা হয়, এখন পড়া শুনতে ভাল লাগছে না, এখন মেজাযটা ভাল না, কিংবা এখন মাথাটা ভাল লাগছে না। আচ্ছা পরে নিজে পড়ে বুঝে নেব। এই ওয়াছওয়াছায় তারা শিক্ষকের পাঠদানের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। পরে নিজেরা পড়ে যখন তারা ভালমত বুঝতে পারে না, তখন ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে হতাশা জাগে যে, আমাদের মেধা দুর্বল, আমাদের দ্বারা লেখাপড়া হবে না! এভাবে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। শয়তান লেখাপড়া থেকে আউট করার জন্যই হয়তো ক্লাসের সময় আছর করে মন মেজায বিগড়ে দিয়েছে, তাই তার শিক্ষকের পাঠদান শুনতে ভাল লাগছে না। অতএব ক্লাসে শিক্ষকের

পাঠদান শুনতে ভাল লাগছে না- এরূপ বোধ হলেই শয়তানের ওয়াছওয়াছা হচ্ছে মনে করে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য পাঠ করবে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। তবে হাঁ শাস্থ্যগত কারণেও ভাল না লাগতে পারে। যদি সত্যিকারভাবেই কারণ সাস্থ্যগতই হয়ে থাকে, তাহলে সাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা চাই।

৪. ক্লাসে ফাঁকি দেয়ার ওয়াছওয়াছাও অনেক ছাত্রের হয়ে থাকে। প্রথম দিকে শয়তান বোঝায় আচ্ছা এই ক্লাসগুলোর পড়া পরে নিজে বুঝে নিলেই তো হবে। এই ওয়াছওয়াছায় তারা ক্লাস ফাঁকি দেয়। পরে নিজে পড়ে যখন তারা ভালমত বুঝতে পারে না, কিংবা অনেক ক্লাস ছুটে যাওয়ায় অত পড়া আর আয়ত্ব করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, বুঝ দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে হতাশা জাগে যে, আমাদের মেধা দুর্বল, আমাদের দ্বারা লেখাপড়া হবে না! এভাবে তারা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। শয়তান লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করার জন্যই হয়তো ক্লাস ফাঁকি দেয়ার চেতনা মনে এনে দিয়েছে, আর পরে নিজে পড়ে নিলে চলবে এই ওয়াছওয়াছা দিয়েছে। অতএব ক্লাস ফাঁকি দেয়ার চিন্তা মনে উদয় হলেই শয়তানের ওয়াছওয়াছা হচ্ছে মনে করে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য পাঠ করবে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"।

৫. ক্লাসে ফাঁকি দিলে যেন উস্তাদের শাসানী খেতে না হয়, তার জন্য অনেক ছাত্র ভুয়া অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নিয়ে থাকে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ছুটি নিয়ে থাকে। মাথায় ব্যাথা, পেটে ব্যাথা এসব অজুহাত তো কমন, অনেক সময় ছুটি নেয়ার জন্য ছাত্ররা এমনসব অজুহাতও দেখায় যা রীতিমত হাস্যকর। যেমন: উদাহরণ স্বরূপ ছুটির আবেদন কেন করল খুব খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, তার মামাতো বোনের মেয়ের জন্মদিন তাই তাকে ছুটি নিতে হচ্ছে। কিংবা তার চাচাত বোনের ননদের ছেলের আকীকা, তাই তাকে ছুটি নিতে হচ্ছে। চিন্তা করে দেখুন কত দূরের সব কারণে ছুটির আবেদন। এগুলো কি আদৌ কোন প্রয়োজন? পড়ালেখা বাদ দিয়ে এ জাতীয় কাজে যাওয়া কি আদৌ কোন ছাত্রের মানসিকতা হতে পারে? শয়তানই পড়ালেখা থেকে দূরে সরানোর জন্য এসব অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে মনের মধ্যে

www.maktabatulabrar.com

প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে তুলে ধরে। আর ছাত্ররা সেসবের জন্য পাগলপারা হয়ে ওঠে। ছাত্রদের লা হাওলা পড়া উচিত।

৬. বাসায় পড়া ফাঁকি দেয়া এবং বাইরে গিয়ে আড্ডা ইত্যাদির সুযোগ বের করার জন্য শয়তান ছাত্রদেরকে খুব সহজ কৌশল শিখিয়ে দেয়। সে মোতাবেক মা বাবাকে কোচিংয়ে যাচ্ছি বা অমুকের কাছে নোট আনতে যাচ্ছি কিংবা মাদ্রাসার ছাত্র হলে মাদ্রাসায় তাকরার আছে বা নসীহতের মজলিস আছে ইত্যাকার ভুয়া ওজুহাত দেখিয়ে বাসার বাইরে চলে যায়। ছাত্রদের মনে রাখা দরকার গার্জিয়ানরাও এগুলো বোঝেন, তারাও তো এ বয়স পার হয়েই এসেছেন। কিংবা তারা অনেক সময় যাচাইও করে থাকেন। কিন্তু তারা বলেন না এই ভেবে যে, মুখের উপর ওদেরকে অপরাধী সাবস্ত করে ফেললে পরে ওরা আমাদের সামনে মুখ দেখাবে কী করে? কিংবা তাতে যদি আরও বেশি নষ্ট হয়ে যায় এই ভেবে যে, গার্জিয়ানের কাছে আমি তো খারাপ প্রতিপন্ন হয়েই গেছি, তাহলে এখন আর রাখঢাকের কী প্রয়োজন? তাই গার্জিয়ানরা এসব ভেবে মুখে না বললেও অন্তরে একটা অসুখকর উপলব্ধি শিকার হন। ফলে ঐ ছাত্রদের প্রতি তাদের আদর, স্নেহ ও আন্তরিকতায় ঘাটতি দেখা দেয়। এভাবে ঐ ছাত্ররা বঞ্চিত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্বামীদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

১. অনেক স্বামীর ওয়াছওয়াছা হয় আল্লাহ আমাদেরকে পুরুষ বানিয়েছেন, আমাদেরকে কর্তৃত্বকারী বানিয়েছেন, স্ত্রীদেরকে আমাদের অধীনস্থ বানিয়েছেন। অতএব ওরা আমাদের চেয়ে ছোট, আমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের। ওরা দাসীর মত আমাদের খাটবে। এই চেতনা থেকে তারা স্ত্রীদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে, তাদের প্রতি নানান রকম জুলুম-অত্যাচার চালায়। এই ওয়াছওয়াছার প্রতিকার হল- স্বামীদেরকে মনে রাখতে হবে আল্লাহ তাআলা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ত্রীদেরকে স্বামীদের অধীনস্থ বানালেও তাদের অধিকার কিন্তু স্বামীদের চেয়ে কম রাখেননি, বরং স্বামীর যেমন স্ত্রীর উপর অধিকার রয়েছে, স্ত্রীরও স্বামীর উপর অধিকার রয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

অর্থাৎ, তাদেরও (স্ত্রীদেরও) অধিকার রয়েছে যেমন তাদের উপর (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে, নিয়ম-নীতি অনুযায়ী। (সূরা বাকারা: ২২৮)

২. অনেক স্বামী এমন আছে বাইরে গেলে তার ওয়াছওয়াছা হয় ইত্যবসরে বিবি আবার অন্য কারও সঙ্গে লাইন-ফাইন, ইয়ে-সিয়ে করে কি না। বা অন্য কোন পুরুষ আমার অনুপস্থিতির সময়ে আমার ঘরে আসা-যাওয়া করে কি না। এই ওয়াছওয়াছার প্রতিকার হল এ কথা চিন্ত করা যে, বিনা দলীল-প্রমাণে কারও প্রতি কুধারণা করা ঠিক নয়। কুরআনে কারীমে এরকম ধারণাকে গোনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একথাও চিন্তা করা দরকার যে, আমি আমার বিবি সম্বন্ধে এই কুধারণা করলে বিবিও তো আমার সম্বন্ধে এই কুধারণা করতে পারে যে, আমি বাইরে গিয়ে অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ইয়ে সিয়ে করি কি না। বিবি আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা করুক আমি যেমন তা চাই না এবং তা করা ঠিক মনে করি না, তদ্রূপ বিবি সম্বন্ধেও আমার এমন ধারণা করা ঠিক নয়।

৩. অনেক স্বামীর ওয়াছওয়াছা হয় আমার অগোচরে বিবি অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ রাখে কি না। এই ওয়াছওয়াছা বশত বিবির মোবাইলের কললিস্ট চেক করে দেখে। অথচ কললিস্ট দেখে অনেক সময় বিভ্রান্তিও হয়। একজন লোকের কথা জানি। সে তার স্ত্রীর ব্যাপারে সন্দেহ করত যে, তার মামা শ্বশুরের ছেলে অর্থাৎ, স্ত্রীর মামাত ভাইয়ের সঙ্গে বোধ হয় তার গোপন সম্পর্ক রয়েছে। মাঝে মাঝেই স্ত্রীর মোবাইলের কললিস্ট চেক করে ঐই মামাত ভাইয়ের মোবাইল থেকে কল আসে দেখতে পেত। এটা দেখে তার সন্দেহ প্রকট আকার ধারণ করে। অথচ অনেক দিন পর সে জানতে পারে যে, আসলে ঐ মোবাইল থেকে তার মামীই মাঝে মাঝে ফোন করে থাকে। অর্থাৎ, মা তার ছেলের মোবাইল থেকে ফোন করে থাকে। আর এমনটা হওয়া তো নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই বলছিলাম, মোবাইল ফোনের কললিস্ট দেখেও বিভ্রান্তি হতে পারে। বস্তুত সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কারও প্রতি সন্দেহ করতে নেই। শয়তান

www.maktabatulabrar.com

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তাদেরকে অশান্তিতে ফেলতে চায়। বনী আদমের অশান্তি দেখলে শয়তানের খুব আনন্দ লাগে কিনা!

৪. একজন স্বামীর কথা শুনেছি তার ওয়াছওয়াছা হয় তার অনুপস্থিতিতে বিবি কারও সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয় কি না। এই সন্দেহে সে বাইরের থেকে বাসায় ফিরেই বিবির গালে মুখে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখে কোন রকম লাল চিহ্ন-টিহ্ন ইত্যাদি আছে কি না। আবার ভিজা সায়া নাড়া দেখলে তাতে শুকে দেখে বীর্যের গন্ধ-টন্ধ বোধ হয় কি না। নাউযু বিল্লাহ! মুখে লাল চিহ্ন-টিহ্ন দেখাও কি ঐ কর্মের নিশ্চিত কোন দলীল? মশার কামড়েও তো লাল দাগ হয়ে যেতে পারে, চুলকালেও তো লাল দাগ হয়ে যেতে পারে, নখের আঁচড়েও তো লাল দাগ পড়তে পারে। আর ভিজা সায়ায় কোন গন্ধ যদি বোধ হয়ও সেটা তো তারই বীর্যের পুরণো গন্ধও হতে পারে। তাই আবারও বলছি, সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কারও প্রতি সন্দেহ করতে নেই, তাতে গোনাহ হয়। স্ত্রীর প্রতি বিনা কারণে সন্দেহে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়, শয়তানের বাসনা পূর্ণ হয়। এমনতর বাজে চিন্তা মাথায় এলে লা হাওলা ... পড়া উচিত।

স্ত্রীদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

১. স্বামী বাইরে গেলে স্ত্রীর ওয়াছওয়াছা হয় ইত্যবসরে স্বামী আবার অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে লাইন-ফাইন, ইয়ে-সিয়ে করে কি না। বিশেষত স্বামীর যদি বাসায় ফিরতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে একটু দেরি হয়, তাহলে এমন ধারণা প্রবলই হয়ে যায়। এই ওয়াছওয়াছার প্রতিকার হল এ কথা চিন্তা করা যে, বিনা দলীল-প্রমাণে কারও প্রতি কুধারণা করা ঠিক নয়। কুরআনে কারীমে এরকম ধারণাকে গোনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্ত্রীর একথাও চিন্তা করা দরকার যে, আমি আমার স্বামী সম্বন্ধে এমন কুধারণা করলে স্বামীও তো আমার সম্বন্ধে এমন কুধারণা করতে পারে যে, তার বাইরে থাকার সময়ে আমি কোন পর পুরুষের সঙ্গে ইয়ে সিয়ে করি কি না বা কোন পর পুরুষ আমার ঘরে যাতায়াত করে কি না। স্বামী আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা করুক তা যেমন আমি

চাই না এবং তাকে ঠিক মনে করি না, তদ্রূপ স্বামী সম্বন্ধেও আমার এমন ধারণা করা ঠিক নয়।

২. অনেক স্ত্রীর ওয়াছওয়াছা হয় আমার অগোচরে স্বামী অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ রাখে কি না। এই ওয়াছওয়াছা বশত স্বামীর মোবাইলের কললিস্ট চেক করে দেখে। অথচ মোবাইলের কললিস্ট দেখে অনেক সময় বিভ্রান্তিও হয়, পূর্বের পরিচ্ছেদে উদাহরণসহ যার বিবরণ পেশ করেছি।

৩. অনেক সময় স্বামী মোবাইলে কারও সঙ্গে কথা বলতে থাকলে স্ত্রীর ওয়াছওয়াছা হয়। সে আড়াল থেকে চুপি চুপি মোবাইলের কথোপকথোন শুনে আঁচ করার চেষ্টা করে থাকে, কোন মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে না তো। এতেও অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি হয়। যেমন: স্বামীকে হয়তো অফিসের কোন কলিক মহিলা অফিসের কোন বিষয়ে ফোন করেছে আর বিবি এদিকে কোন্ মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ হচ্ছে ভেবে মাথা গরম করে বসে আছে। তাই আবারও পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করছি, সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কারও প্রতি সন্দেহ করতে নেই। শয়তান স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তাদেরকে অশান্তিতে ফেলতে চায়। বনী আদমের অশান্তি দেখলে শয়তান তো আনন্দে বগল বাজায়।

৪. অনেক সময় স্বামী শাস্থ্যগত কারণে বা মন-মেজায ভাল না থাকার কারণে স্ত্রীকে সাময়িক আদর-সোহাগ কম করলে বা যৌন-ব্যবহার কম করলে তাতে অনেক স্ত্রীর ওয়াছওয়াছা হয় যে, স্বামী কি তাহলে অন্য কোথাও ইয়ে টিয়ে করে নাকি? না হলে এগুলো কমে গেল কেন? এই ওয়াছওয়াছায় সে স্বামীর প্রতি সন্দেহ নিয়ে সেভাবে আচরণ শুরু করে দেয়। অথচ স্ত্রীর ভেবে দেখা উচিত স্বামীর শাস্থ্যগত কোন সমস্যা চলছে কি না, কিংবা তার কোন মানসিক পেরেশানী আছে কি না। তাছাড়া যৌন-ব্যবহার ও আদর-সোহাগের বিষয়টা এমনিতেও তো এমন যার মধ্যে জোয়ার ভাটা চলে থাকে, অন্যান্য খাদ্য-খাবারের প্রতি চাহিদা ও ক্ষুদার ক্ষেত্রে যেমনটা হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলো ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেই স্ত্রী ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে সক্ষম হবে।

www.maktabatulabrar.com

৫. অনেক স্ত্রীর ওয়াছওয়াছা হয় স্বামীর মাল আত্মসাৎ করলে বুঝি গোনাহ হয় না। এই ওয়াছওয়াছায় তারা স্বামীর অগোচরে স্বামীর টাকা-পয়সা নিজের বাপের বাড়ির লোকদেরকে পাচার করে বা স্বামীর অগোচরে স্বামীর টাকা-পয়সা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। অথচ স্বামীর টাকা-পয়সা, অর্থকড়ি তার অনুমতি ব্যতীত সরানো বা লুকানো কোনক্রমেই জায়েয নয়। সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চাইলে তা-ও স্বামীর অনুমতিক্রমেই হতে হবে।

ব্যবসায়ীদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

১. ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান যে ওয়াছওয়াছা হয় তা হচ্ছে নকল করার ওয়াছওয়াছা, অন্যের নাম করা মালামাল নকল করে দ্রুত সম্পদ গড়ে তোলার ওয়াছওয়াছা। কিংবা নকল মালামাল বিক্রি করে বেশি লাভ করার ওয়াছওয়াছা। অথচ ব্যবসায়ীরা যদি মনে রাখতেন যে, নকল করা ও নকল মাল বিক্রি করায় পাপ হয় আর পাপের পন্থায় সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে বরকত হয় না, সে সম্পদ শান্তি বয়ে আনে না বরং বিভিন্ন রকম অশান্তি ও বিপদ ডেকে আনে, ব্যবসায়ীরা যদি এটা মনে রাখতেন, তাহলে তারা নকল করা ও নকল মাল বাজারজাত করা থেকে বিরত থাকতে পারতেন।

২. ব্যবসায়ীদের আর একটা ওয়াছওয়াছা হয় মালের দোষ-ত্রুটি থাকলে তা না বলে ক্রেতাকে গছিয়ে দেয়ার ওয়াছওয়াছা। অনেক সময় মালের যে গুণাগুণ নেই মিথ্যামিথ্যি সেসব গুণের কথা বলে মাল কাটতি করার চেষ্টা করা হয়। এভাবে মালের দোষ গোপন রেখে কিংবা মিথ্যা গুণাগুণ বলে মাল কাটতি করে সাময়িক লাভবান হওয়া গেলেও তার ভবিষ্যত ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, ক্রেতা যখন বুঝতে পারে তাকে ঠকানো হয়েছে, তার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে, তখন সে ভবিষ্যতে আর ঐ ব্যবসায়ী থেকে মাল ক্রয় করে না। এভাবে ব্যবসায়ী ভবিষ্যতের আরও বহু দিনের ব্যবসার মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়। বস্তুত মালের দোষক্রটি থাকলে বলে দেয়া এবং সত্য বলা দ্বারা ক্রেতার আস্থা অর্জিত হয়, সেই আস্থার ভিত্তিতে ঐ ক্রেতা ভবিষ্যতে আরও বহুবার তার কাছে আসে, এমনকি অন্যদেরকেও তার কাছে আসতে উদ্বুদ্ধ করে এই বলে যে,

অমুক ব্যবসায়ী খাঁটি লোক, সে কাউকে ঠকায় না, কারও সাথে প্রতারণা করে না। তাই সত্য বলা দ্বারা একবার ব্যবসার মুনাফা কম হলেও ভবিষ্যতে বহু দিনের মুনাফা পাওয়ার এবং অনেকের থেকে মুনাফা পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। এ জন্যই হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

অর্থাৎ, যদি তারা সত্য বলে এবং (দোষ-ত্রুটি থাকলে) স্পষ্ট বলে দেয়, তাহলে তাদের ব্যবসায় বরকত হয়, আর যদি গোপন করে ও মিথ্যা বলে তাহলে তাদের ব্যবসার বরকত মোচন হয়ে যায়। (বোখারী: হাদীছ নং ২০৭৯)

৩. ব্যবসায়ীদের আর একটা ওয়াছওয়াছা হয় কোন মালে দোষ-ত্রুটি থাকলে সেটাকে ভাল মালের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে রাখা যাতে ক্রেতা তা ধরতে না পারে। এরই কারণে দেখা যায় একটা ফলের কোন এক পাশে দোষ থাকলে সে পাশকে নিচের দিকে রেখে ভাল পাশটা উপরের দিকে রেখে দেয়া হয়। এই ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার উপায় হল ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে এটা এক ধরনের প্রতারণা ও পাপ। আর পাপ পন্থায় কখনও ব্যবসায় বরকত হয় না।

৪. ব্যবসায়ীদের আর একটা ওয়াছওয়াছা হয় যে ক্রেতা মালের দাম জানে না এমন ক্রেতা থেকে বেশি মূল্য রাখার ওয়াছওয়াছা। এই ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার উপায় হল ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে এভাবে সাময়িক লাভ বেশি হয় মনে হলেও অন্য এই ভাইকে ঠকানো হচ্ছে। আর আল্লাহর নিয়ম হল অন্য ভাইয়ের সঙ্গে আমি যেমন মুআমালা করব আমার সঙ্গেও আল্লাহ তেমনি মুআমালা করবেন। অতএব এভাবে অন্যকে ঠকালে পরিমাণে আমারও ঠক হবে।

৫. ব্যবসায়ীদের আর একটা ওয়াছওয়াছা হয় মালে ওজন কম দেয়ার ওয়াছওয়াছা। ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে মাপে বা ওজনে কম দেয়া গোনাহে কাবীরা। আর পূর্বেও বলা হয়েছে পাপের পন্থায় আদৌ

ব্যবসায়ে বরকত হয় না। কুরআনে কারীমে সূরা মুতাফ্ফিফীন-এর শুরুতেই বলা হয়েছে,

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ﴾.

অর্থাৎ, ঐসব লোকদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে যারা মানুষ থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরোপুরি নেয় অথচ অন্যদেরকে মেপে বা ওজন করে দেয়ার সময় কম দেয়।

৬. ব্যবসায়ীদের আর একটা ওয়াছওয়াছা হয় মালে ভেজাল দেয়ার ওয়াছওয়াছা। এই ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার উপায় হল ব্যবসায়ীকে চিন্তা করতে হবে যে, মালে ভেজাল দেয়া প্রতারণা ও গোনাহ। এ পন্থায় আদৌ ব্যবসায়ে বরকত হয় না।

৭. ব্যবসায়ীদের আর একটা ওয়াছওয়াছা হয় পাশের ব্যবসায়ী যেন ব্যবসা করতে না পারে, সে যেন ব্যবসা থেকে আউট হয়ে যায়। এ জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করা হয়। কখনও ক্রেতাদেরকে বোঝানো হয় পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ী মূল্য বেশি রাখে বা ভাল মাল রাখে না। কখনও পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীর নির্ধারিত ক্রেতাকে অল্প মূল্যে মাল দেয়ার অফার দেয়া হয়। এভাবে নিজে সাময়িক ঠকে হলেও তা করা হয় শুধু এই চিন্তায় যে, পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ী এভাবে দিতে না পেরে এক সময় সে এখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিবে, তারপর সে ইচ্ছামত ক্রেতাদের থেকে দাম নিয়ে অতীতের ক্ষতি পুশিয়ে নিবে। ইত্যাদি।

৮. ব্যবসায়ীদের আর একটা ওয়াছওয়াছা হয় ব্যবসাকে বড় করার জন্য ব্যাংক থেকে সুদী লোন নেয়ার ওয়াছওয়াছা। তাদের ওয়াছওয়াছা হয়– হাজার ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে সুদী লোন নিয়ে তাদের ব্যবসাকে বড় করছে, আমি লোন না নিলে আমার ব্যবসা ছোটই থেকে যাবে। কাজেই ব্যবসাকে বড় করতে হলে আমাকে লোন নিতে হবে। এই ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে ব্যবসা বড় করাতেই সফলতা নয়। যদি বড় ব্যবসা করে অনেক টাকা-পয়সা উপার্জন করেও সুখ শান্তি পাওয়া না গেল, তাহলে সেই বড় ব্যবসা

www.maktabatulabrar.com

করে লাভ কী? পক্ষান্তরে ব্যবসা ছোট থাকলেও যদি আয়- উপার্জনে বরকত হয়, যা উপার্জন হয় তাতেই মনে সুখ-শান্তি থাকে, তাহলে অবশ্যই সেই ছোট ব্যবসাই উত্তম। তাহলে এবার শুনুন আল্লাহ পাক কি বলছেন। আল্লাহ পাক বলছেন, সুদী কারবারে বরকত নেই। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ সুদ (তথা সুদী কারবার-এর বরকত)কে মোচন করে দেন। (সূরা বাকারাহ: ২৭৬)

অনেক সময় ব্যবসায়ীদের এই ওয়াছওয়াছা হয় যে, সূদী কারবার করে অমুসলিমরা বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য হাত করে ফেলেছে। এ অবস্থায় মুসলমানরা সুদকে এড়িয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চাইলে তারা বড় বড় ব্যবসা করতে পারবে না, ফলে মুসলমান জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে পিছিয়ে থাকবে। এভাবে অমুসলিম জাতি যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে মুসলমান জাতি সেখানে পিছিয়ে থাকবে, মুসলমান জাতির উন্নতি হবে না। এই ওয়াছওয়াছার প্রতিকার হল− ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতি কাকে বলে তা ভাল করে বুঝতে হবে। শুধু ব্যবসা বড় হলেই কি ইসলামের দৃষ্টিতে তা উন্নতি? উন্নতির সঠিক ব্যাখ্যা শুনুন। উন্নতি হল উঁচুতে পৌঁছা বা সমৃদ্ধির নাম। এখন দেখতে হবে এই উঁচুতে পৌঁছা বা সমৃদ্ধি দ্বারা কী উদ্দেশ্য? একটা ভবন শুধু গজ ফিতার মাপে উঁচু হলেই কি সেটা উন্নত ভবন বলে স্বীকৃতি পাবে যদি তার মধ্যে ভবনের মূল উদ্দেশ্য তথা বসবাসের ব্যবস্থা মানসম্পন্ন না হয়, ভবন টেকসই না হয়? নিশ্চয় না। একটা বিল্ডিংয়ে শুধু ইট সিমেন্ট বালু বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলেই কি ইট সিমেন্ট বালুতে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সেটা উন্নত বিল্ডিং বলে স্বীকৃতি পাবে যদি তার মধ্যে বিল্ডিংয়ের মূল উদ্দেশ্য তথা বসবাসের ব্যবস্থা মানসম্পন্ন না হয়, বিল্ডিং টেকসই না হয়? নিশ্চয় না। একজন মানুষ যদি শুধু আক্ষরিক অর্থে উঁচু হয় যেমন: মনে করুন এই যুগে সাত আট ফুট লম্বা হয় তাহলে এই উঁচু হওয়ার দ্বারা কি সে উন্নত মানুষ বলে স্বীকৃতি পাবে যদি তার মধ্যে মানুষের মূল জিনিস তথা মনুষত্বের অভাব থাকে? নিশ্চয় না। কিংবা

www.maktabatulabrar.com

যদি কোন মানুষের শরীরে পাঁচ দশ মণ গোসত থাকে তাহলে কি শুধু এই গোসতে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সে উন্নত মানুষ বলে স্বীকৃতি পাবে যদি তার মধ্যে মানুষের মূল জিনিসের অভাব থাকে? নিশ্চয় না। তাহলে বুঝা গেল প্রত্যেক জিনিসের যে মূল উদ্দেশ্য বা মৌলিকত্ব তাতে মানসম্পন্ন হওয়া এবং তাতে সমৃদ্ধ হওয়াই হচ্ছে সেই জিনিসের উন্নতি। আর মূল উদ্দেশ্যে বা মৌলিকত্বে পিছিয়ে থাকাই হচ্ছে তার অবনতি। আর একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। আমরা জানি রাস্তা-ঘাটের উদ্দেশ্য হচ্ছে চলাফেরার সুবিধা সৃষ্টি করা। অতএব যদি রাস্তঘাটের শুধু সংখ্যাই বৃদ্ধি করতে থাকা হয়, কিংবা শুধু রাস্তাঘাটের দৈর্ঘ-প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটানো হয়, রাস্তাগুলোতে চলাফেরার অনুপযোগিতা বাড়তেই থাকে, তাহলে কেউ বলবে না রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে, বরং বলবে রাস্তাঘাট বেড়েছে বটে তবে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়নি, বা বলবে, রাস্তাঘাট বাড়ছে কিন্তু রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হচ্ছে না।

অতএব প্রতীয়মান হল মূল উদ্দেশ্যে বা মৌলিকত্বে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে উন্নতি আর মূল উদ্দেশ্যে বা মৌলিকত্বে পিছিয়ে যাওয়াই হচ্ছে অবনতি। সুতরাং কোন মানুষ যদি ঈমান- আকীদা, আমল-আখলাক ও আখেরাত বর্জন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যত বড় ব্যবসা-বাণিজ্যই হোক না কেন তাকে উন্নতি আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। কারণ তাতে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যে সে পিছিয়ে যায়।

রাজা-বাদশাদের যেসব ওয়াছওয়াছা হয়

আল্লামা ইবনুল জাওযী "তালবীছে ইবলীছ" কিতাবে শয়তান রাজা-বাদশাদের যেসব ওয়াছওয়াছা বা ধোঁকা দেয় তা সবিস্তারে লিখেছেন। সেই ধোঁকা বা ওয়াছওয়াছাগুলোর মধ্যে রয়েছে−

- শয়তান তাদেরকে এই ধোঁকা দেয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নইলে এত মানুষের মধ্যে তোমাদেরকে নির্বাচন করে রাজত্ব প্রদান করতেন না। (এই ধোঁকার প্রতিকার হল এই জানা যে,) আল্লাহ শুধু তার প্রিয়পাত্রকেই রাজত্ব দান করেন না, বরং পাপিষ্ট এবং তার দুশমনকেও রাজত্ব দান করে থাকেন। যেমন ফেরাউন ও নমরূদকে

রাজত্ব দেয়া হয়েছিল। (অথচ তারা ছিল পাপিষ্ঠ ও আল্লাহর দুশমন।) আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন এরূপ পাপিষ্ঠদের প্রতি রহমত করা তো দূরের কথা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেনও না।

- শয়তান তাদেরকে এই ধোঁকা দেয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রভাব ও প্রতাপ নিয়ে থাকা চাই। এই চেতনা থেকে তারা অহংকারী হয়ে ওঠে, আলেম উলামা থেকে বা জ্ঞানীদের থেকে কিছু শিক্ষা নেয় না। ফলে জালেম ও মূর্খদের সাহচর্যে থেকে জাহেল ও মূর্খসুলভ আচরণ করে, যা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।
- শয়তান তাদেরকে এই ধোঁকা দেয় যে, তোমার অনেক শত্রু। এই ভয় থেকে তারা এত পরিমাণ দেহরক্ষী ও পাহারাদার নিযুক্ত করে যে, মজলূম ও অসহায় ব্যক্তিরা তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছতে পারে না। (এই ধোঁকা থেকে পরিত্রাণের উপায় হল এই চিন্তা করা যে,) হাদীছ শরীফে আছে– আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত করেন আর সে মানুষের অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে নেয় তাহলে আল্লাহ তাআলাও তার অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিবেন। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ তাআলা এরূপ শাসকদের অভিযোগ শুনবেন না।
- শয়তান তাদেরকে এই ধোঁকা দেয় যে, রাষ্ট্রীয় তহবীলে তোমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে, অতএব তোমরা যা ইচ্ছা তা খরচ করতে পার। (এই ধোঁকা থেকে পরিত্রাণের উপায় হল– তাদেরকে চিন্তা করতে হবে) রাষ্ট্রীয় তহবীল তাদের কাছে জনগণের আমানত। তারা তার রক্ষক মাত্র।
- অনেক রাষ্ট্রপ্রধানকে শয়তান এই বলে ধোঁকা দেয় যে, তোমার রাষ্ট্রে সর্বপ্রকার শান্তি ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজমান। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সর্বত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান রয়েছে। শয়তান তাদেরকে অভিভূত করে রাখে।
- রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রজাদের কাছ থেকে এমনভাবেও ট্যাক্স আদায় করে যা অনেক ক্ষেত্রে জুলুমে পরিণত হয়। (অথচ তারা চিন্তা করে দেখে না এভাবে যে তারা আল্লাহর কাছে জালেম হিসেবে উপস্থিত হবে।)

www.maktabatulabrar.com

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যমানায় জনৈক কর্মকর্তা তার কাছে লিখে পাঠালেন যে, এক ব্যক্তি সরকারী প্রাপ্য দিচ্ছে না, তাকে শাস্তি দেয়া ব্যতীত উক্ত প্রাপ্য উসূল করা যাবে না। (সে তাকে হত্যা করার দিকে ইংগিত দিয়েছিল।) এর জবাবে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) লিখে পাঠালেন যে, সে আল্লাহর দরবারে খেয়ানত নিয়ে হাজির হোক– এটা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় এ বিষয় থেকে যে, আমি তার খুনের জুলুম নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হব। (এ থেকে ঐসব রাষ্ট্রপ্রধানদের শিক্ষা নেয়া চাই যারা প্রতিপক্ষের লোকজনকে কারণে অকারণে খুন পর্যন্ত করে থাকে।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমান- আকীদা বিষয়ক ওয়াছওয়াছা প্রসঙ্গ

www.maktabatulabrar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমান-আকীদা বিষয়ক ওয়াছওয়াছা প্রসঙ্গ

আল্লাহ আছেন তার প্রমাণ প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

নফ্‌ছ ও শয়তানের পক্ষ থেকে বহু ব্যাপারেই বহু রকম ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে ওয়াছওয়াছা হয় তা হচ্ছে আল্লাহ আছেন কি– এই ওয়াছওয়াছা। আপনি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা, পরোপকার, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি যেকোনো ভাল কাজ করতে গেলে সেই ভাল কাজ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ওয়াছওয়াছা তো হবেই, এক ফাঁকে এই ওয়াছওয়াছাও হবে যে, যার আযাবের ভয়ে আমি এটা করতে যাচ্ছি কিংবা যার থেকে পুরস্কার পাওয়ার নিয়তে এটা করতে যাচ্ছি সেই আল্লাহ আদৌ আছেন কি? (নাউযু বিল্লাহ!) যেকোনো ভাল কাজের ইরাদা করলেই এক ফাঁকে এই ওয়াছওয়াছা হবে। মনে করুন "নফ্‌ছ ও শয়তানের সঙ্গে মোকাবেলা" বিষয়ক এই বইটি পড়ার ইচ্ছা করেছেন, আপনার মনের মধ্যে প্রশ্ন উচ্চারিত হবে "নফ্‌ছ ও শয়তানের সঙ্গে মোকাবেলা" নামের বইটি পড়ে তুমি নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে বাহাছে বিজয়ী হওয়ার মত যুক্তি-তর্ক ও কৌশলাদি শিখতে চাচ্ছ। শয়তানের সঙ্গে জিততে চাচ্ছ, কিন্তু তা কি তুমি পারবে? দ্বীন-ধর্মের সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হল আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহীদের বিষয়। এই আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদ প্রমাণ করার ব্যাপারেই কি যুক্তি-তর্কে তুমি শয়তানের সাথে জিততে পারবে?

www.maktabatulabrar.com

এ প্রশ্নের জবাবে আপনি নফ্‌ছ ও শয়তানকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর প্রসিদ্ধ ঘটনাটি শুনিয়ে দিন, হয়তো নফ্‌ছ ও শয়াতন লা-জওয়াব হয়ে যাবে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)–এর ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। একবার কতিপয় নাস্তিক গোছের লোক হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)কে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমরা আমাকে একটা বিষয়ে একটু ভাবতে দাও। কতিপয় লোক আমাকে এই মর্মে একটা সংবাদ দিল যে, একটা সমুদ্রে ব্যবসার মালামাল বোঝাই একটা নৌকা কোন মাঝি ছাড়াই আপনা আপনি চলছে, সমুদ্রের ঢেউ চিরে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। কারও কোনোরূপ পরিচালনা ছাড়াই ইচ্ছামত সেটি তার গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে। একথা শুনে তারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)কে বলল, কোন বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারে না। তখন ইমামে আযম হযরত আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, তাহলে এই মহা উর্ধ্বজগত ও অধঃজগত এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এই বিশাল সৃষ্টিরাজির কোনো সৃষ্টিকর্তা থাকবে না তা কীকরে হয়? তখন লোকগুলো লা- জওয়াব হয়ে যায়। (ফাতহুল মুলহিম, ১ম খণ্ড)

এই ঘটনাটি শোনানোর পরও শয়তান লা-জওয়াব না-ও হতে পারে। এ ব্যাপারে আরও অনেক প্রশ্ন তুলতে পারে। সম্ভাব্য সেরকম কয়েকটা প্রশ্ন ও তার জওয়াব উল্লেখ করছি। শয়তান বা শয়তানের দোসরদের পক্ষ থেকে আপনার সামনে সেসব প্রশ্ন এলে আপনি সেভাবে জওয়াব দিতে পারেন।

প্রশ্ন: ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যেও বিষয়টির খোলাসা হবে না। কারণ, ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যের সারকথা হল– কোনোকিছুই যখন নির্মাণকারী ব্যতীত হতে পারে না, সবকিছুর যখন নির্মাতা থাকে, তখন এই বিশাল সৃষ্টিজগতেরও একজন নির্মাতা তথা সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই থাকতে হবে। অতএব অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। কিন্তু এই বক্তব্যেও বিষয়টির খোলাসা হবে না এ কারণে যে, কোনোকিছুই যখন একজন সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত হতে পারে না তাহলে তো বলতে হবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহও একজন সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত হতে পারেননি, তারও একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তাহলে তো সৃষ্টিকর্তা একজন রইলেন না। এটাই তো যুক্তিতে বলে।

জওয়াব: এ বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয় বরং তা দু'ভাবে অযৌক্তিক।

এক. আল্লাহকে যখন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা মানা হল, তখন তাঁর সৃষ্টিকর্তা খোঁজার কোন অবকাশ নেই। কারণ, তাঁর সৃষ্টিকর্তা থাকলে তো তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকলেন না বরং তিনি তখন সাব্যস্ত হবেন সৃষ্ট। আর সৃষ্ট কখনও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। অতএব তাঁকে যখন একবার সৃষ্টিকর্তাই মানা হল, তখন আর তাঁর সৃষ্টিকর্তা দেখার বা থাকার কোন অবকাশ নেই। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা মানার অর্থই হল তাঁর আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। সৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা থাকে, সৃষ্টিকর্তার কোন সৃষ্টিকর্তা থাকে না। এটাই যুক্তির কথা। অতএব সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা খোঁজা অযৌক্তিক। তোমার বক্তব্যে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা খোঁজা হচ্ছে, অতএব তোমার বক্তব্য অযৌক্তিক।

দুই. এ বক্তব্য অযৌক্তিক এ কারণেও যে, কাউকে এই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা মানলে সেই সৃষ্টিকর্তারও একজন সৃষ্টিকর্তা মানতে হবে। সেই সৃষ্টিকর্তারও একজন সৃষ্টিকর্তা মানতে হবে। সেই সৃষ্টিকর্তারও একজন সৃষ্টিকর্তা মানতে হবে। এভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা মানতে থাকার ধারা অব্যাহত থাকবে, কোনোদিন মূল সৃষ্টিকর্তায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। কোন বিষয়ে এরূপ অনন্ত ধারার পেছনে পড়া অযৌক্তিক। কেননা, যুক্তি হয়ে থাকে সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য, আর এরূপ অনন্ত ধারা কোন সমাধানে উপনীত করে না বরং অসমাধানের দিকেই নিয়ে যেতে থাকে। অতএব সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা খোঁজার মত অনন্ত ধারার পশ্চাতে পড়া যৌক্তিক নয় বরং অযৌক্তিক।

প্রশ্ন: এ বক্তব্যের পরও একটু খটকা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে যে, তাহল– আল্লাহ হলেন কী করে?

জওয়াব: প্রশ্নই শুদ্ধ নয়। "আল্লাহ হলেন কীকরে" কথাটিই ঠিক নয়। আল্লাহ হননি বরং আছেন, সদাসর্বদা আছেন এবং সদা সর্বদা থাকবেন। "হলেন" কথাটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি আগে ছিলেন না, পরে হয়েছেন। যিনি সদা সর্বদাই আছেন, যিনি কাদীম (নিত্য) সত্তা, তার ক্ষেত্রে "হলেন" কথাটা প্রযোজ্য নয়। অতএব আল্লাহ হলেন কী করে কথাটাই শুদ্ধ নয়। প্রশ্ন ভুল।

www.maktabatulabrar.com

প্রশ্ন: এটা কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে এক রকম জওয়াব হয় বটে, মনের খটকা কিন্তু তাতে দূর হয় না। খটকা তবুও থেকেই যায়।

জওয়াব: এ খটকা দূর করার মত ব্রেন কোন মাখলূক তথা সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি, মানুষকেও দেয়া হয়নি। আর তা দেয়া সম্ভবও নয়। কারণ, কোন সসীমের মধ্যে কোন অসীমকে ঢোকানো যায় না। মাখলূকের ব্রেন সসীম, মানুষের ব্রেনও সসীম। আর আল্লাহর সত্তা অসীম। অতএব মানুষ বা অন্য কোন মাখলূকের সসীম ব্রেনের মধ্যে আল্লাহর অসীম সত্তার আদ্যোপান্ত সবকিছু ঢোকানো সম্ভব নয়। এই সসীম ব্রেন দিয়ে আল্লাহর অসীম সত্তার সবকিছু পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝা সম্ভব নয়। এটা এমনই একটা মোটা বিষয়, যেমন মোটা বিষয় হল হ্যোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোট্ট একটি শিশির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের অথৈ পানিরাশি ঢোকানো সম্ভব নয়। আল্লাহর সত্তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝা সম্ভব নয় বলেই মানুষকে আল্লাহর সত্তা নিয়ে এমনভাবে চিন্তায় মগ্ন হতে নিষেধ করা হয়েছে। এক রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন,

»تَفَكَّرُوْا فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِيْ ذَاتِ اللهِ «. (رواه أبو الشيخ في العظمة، قال الحافظ في فتح الباري : موقوف وسنده جيد)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছু নিয়ে চিন্তা- ভাবনা কর, আল্লাহর সত্তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তায় মগ্ন হয়ো না। কাজেই আল্লাহ কীভাবে হলেন– এর সমাধান বুঝার মত ক্ষমতাই মানুষের নেই, এ জন্যই সে চিন্তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আপনি আপনার মনকে বোঝান মানব মস্তিস্কের পক্ষে আল্লাহর সত্তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝা সম্ভব হবে না, অতএব এই খটকাও দূর হবে না এজন্যই আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?– এ রকম ওয়াছওয়াছা মনে এলেই হাদীছে তিনটি আমল শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বয়ান করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ». (صحيح مسلم برقم ٣٦٢)

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের কারও কাছে এসে বলবে (অর্থাৎ, এ চেতনা উদ্রেক করবে) যে, অমুকটা কে সৃষ্টি করল, অমুকটা কে সৃষ্টি করল? (তুমি হয়তো তার জবাবে বলবে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কারণ, একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।) অবশেষে এক পর্যায়ে সে বলবে (অর্থাৎ, চেতনা উদ্রেক করে দিবে), তাহলে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করল কে? এ পর্যায়ে উপনীত হলে "আউযু বিল্লাহ... পাঠ করবে (অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহ কামনা করবে।) এবং (ঔই চিন্তা থেকে) বিরত হবে। আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে তখন "আমানতু বিল্লাহ" (আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম) পাঠ করে নিবে। (অর্থাৎ, ঈমানকে নবায়ন করে নিবে।) [সহীহ মুসলিম]

এসব রেওয়ায়েতে এ ধরনের ওয়াছওয়াছার সময় সর্বমোট ৩টি আমলের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১. আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম পড়ে নেয়া।

২. আমানতু বিল্লাহ (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম) পড়ে নেয়া।

৩. উক্ত চিন্তা থেকে বিরত হয়ে অন্য কোন চিন্তা বা কাজে লিপ্ত হওয়া।

সেমতে তিনটি আমলই আপনি সম্পন্ন করুন, শয়তান ভেগে যাবে। কীভাবে ভেগে যাবে তার বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

মানুষ কেন তার ব্রেন দিয়ে আল্লাহকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম নয়

আউযুবিল্লাহ পড়ার কারণে শয়তান ভেগে গেল। কিন্তু রয়ে গেল তার এজেন্ট নফ্ছ। এবার নফ্ছ আর একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে কিংবা কখনও সরাসরি শয়তানও মনের মধ্যে প্রশ্ন তুলতে পারে।

প্রশ্ন: মানুষ কেন তার ব্রেন দিয়ে আল্লাহকে বুঝতে পারবে না, মানুষের ব্রেন সসীম হতে যাবে কেন? এই মানুষ আজ কতকিছু বুঝে চলেছে! মহাজগতের কত রহস্য উদঘাটন করে চলেছে!! আজ মানুষ কতকিছু পারে!!!

খেয়াল করুন এবার নফ্ছ অন্য বিষয়ের দিকে মোড় নিল। এটাকেই বলে পয়েন্ট আউট করা। সব বাতেলেরই নিয়ম হল কোন বাহাছে হেরে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে উঠলে হেরে গেছে! হেরে গেছে!!– এমন আওয়াজ বুলন্দ হওয়ার ও করতালী বেজে ওঠার পূর্বেই সে চলমান প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বক্তব্য অন্য দিকে নিয়ে যায়। যাতে তার হেরে যাওয়ার শ্লোগান ও

www.maktabatulabrar.com

করতালী অন্তত তাকে শুনতে না হয় এবং তার হেরে যাওয়াটা অন্তত ভরা মজলিসে বাচনিক স্বীকৃতি পেতে না পারে। এমনতর অবস্থায় উপনীত হওয়ার কারণেই নফ্ছ এখানে পয়েন্ট আউট করে অন্য দিকে সরে গেল। তবুও যে বিষয়টি সে উত্থাপন করেছে, সংক্ষেপে হলেও তার জবাব দিন।

জওয়াব: জবাব দিতে গিয়ে যা বলবেন তা উল্লেখ করার আগে মানুষের ব্রেনের দৌড় কতটুকু সে সম্বন্ধে একটু বলে নেয়া যাক। মনে করুন– যদি বলা হয় ১ কোটি নক্ষত্র, তাহলে এটা মানুষের মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে আসবে এবং মানুষ তা বুঝবে। যদি বলা হয় ১ কোটি কোটি নক্ষত্র, তবুও তা মানুষের মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে আসবে এবং মানুষ বুঝবে যে, ১ কোটি পরিমাণকে কোন এক স্থানে রাখলে এবং এভাবে ১ কোটি পরিমাণ করে ১ কোটি স্থানে রাখা হলে যে পরিমাণ হয় সেটাই হল ১ কোটি কোটি। অর্থাৎ, কোটি শব্দকে দু'বার উচ্চারণ করলে যে সংখ্যা হয় তা মানুষের মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে আসবে এবং তা মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে। যদি বলা হয় ১ কোটি কোটি কোটি নক্ষত্র, অর্থাৎ, "কোটি" শব্দকে তিনবার উচ্চারণ করা হয়, তাহলে মানুষের কাছে সংখ্যাটি অস্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদিও বুঝবে যে, ১ কোটি কোটি সংখ্যক পরিমাণ নক্ষত্রকে এক কোটি স্থানে রাখলে যে পরিমাণ হয়, সেটাই হল ১ কোটি কোটি কোটি নক্ষত্র। তবে সংখ্যাটি কিন্তু পূর্বের ন্যায় অতটা স্পষ্ট হবে না বরং বেশ কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে আসবে। এরপর যদি কোটি শব্দটিকে চার বার উচ্চারণ করে বলা হয়, ১ কোটি কোটি কোটি কোটি নক্ষত্র, তাহলে কিন্তু কানে শুধু কয়েকটা "কোটি" শব্দই প্রবেশ করবে, সংখ্যার পরিধিটা ব্রেনে মোটেই ঢুকবে না। আর যদি ১০/১২ বার "কোটি" শব্দটি উচ্চারণ করা হয়, তাহলে তার পরিধি ব্রেনে আনতে হলে তো ব্রেনের দশ বারটা নয় তেরটা বাজবে! এ–ই হল মানুষের ব্রেন ও ব্রেনের চিন্তা শক্তির দৌড়।

ব্রেনের চিন্তা শক্তির দৌড় আরও একটু পরীক্ষা করে দেখুন। একটু চিন্তা করে দেখুন তো পৃথিবীর চতুর্পাশ্বে চাঁদ তার অক্ষ রেখায় নিজ স্থানে অনবরত ঘুর্ণন করে চলেছে, সাথে সাথে তার কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করছে। পৃথিবী তার অক্ষ রেখায় প্রতি ঘন্টায় ১০৩৭ মাইল বেগে আবর্তন করছে এবং তার উপগ্রহ চাঁদকেসহ নিজের ৫৮ কোটি মাইল দীর্ঘ কক্ষপথে সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রতি সেকেন্ডে ১৮২-১ মাইল গতি

নিয়ে প্রচণ্ড বেগে পরিক্রমণ করছে। এভাবে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো প্রভৃতি সূর্যের অন্যান্য গ্রহাদি নিজ নিজ উপগ্রহাদিসহ সূর্যকে কেন্দ্র করে তাদের মহাদীর্ঘ কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহ (তথা গোটা এই সৌরজগত) নিয়ে তার ১ লক্ষ আলোকবর্ষ দীর্ঘ ছায়াপথের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করছে –যে পরিক্রমণ ২০ কোটি বছরে একবার সম্পন্ন হয়– আবার এই মহা বিশাল ছায়াপথ সর্পিল ভংগিতে তার চেয়ে মহা বিশাল এরিয়া জুড়ে বেঁকে বেঁকে এন্ড্রোমিডা নামক আর একটি ছায়াপথের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এভাবে মহাজগতের সবকিছু আরও মহাকিছুকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করছে। আপনি এই সবকিছুর গতি, ঘূর্ণন, আবর্তন ও পরিক্রমণকে এক সংগে আপনার চিন্তায় আনতে সক্ষম কি? নিশ্চয় না। একসাথে এতসব ঘূর্ণনের চিন্তা মস্তিষ্কে আনতে গেলে রীতিমত আপনার মস্তিষ্কেই ঘূর্ণন শুরু হবে। এ-ই হল মানুষের ব্রেন ও ব্রেনের চিন্তা শক্তির দৌড়। এতসব কিছু পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝা তো দূরের কথা, একটি লবণ কণায় যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে তা সব ব্রেনে আনতে গেলে নাকি বড় মাথাওয়ালা বিজ্ঞানীদের মত হাজার হাজার মাথার প্রয়োজন। এ-ই হল মানুষের ব্রেনের অবস্থা।

তাই নফ্‌ছের বক্তব্যের জওয়াবে যা বলবেন তাহল– এ-ই যেখানে ব্রেনের দৌড়, সেখানে যদি কেউ নিজেকে মহাজগতের সবকিছু তার ব্রেনের মধ্যে আনতে সক্ষম মনে করে, তাহলে নির্ঘাত এ বলা ছাড়া আর কোন কথা নেই যে, সে বোকার স্বর্গেই বাস করছে। আর মহাজগত তো সসীম, তা-ই যদি আয়ত্বে আনা ব্রেনের দৌড়ে না কুলোয়, তাহলে কেউ আল্লাহর অসীম সত্তার সবকিছু ব্রেনের মধ্যে পুরতে পারবে বলে মনে করলে তো সে মহা বোকার স্বর্গে বাস করছে। এমন মহা বোকা সাজার পথে যেন কেউ অগ্রসর হতে না যায়, এজন্যই বলা হয়েছে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে– এমন প্রশ্ন কারও মনে জাগ্রত হলে সে যেন এ সম্বন্ধে তার চিন্তাকে আর অগ্রসর করতে না যায়। সৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে স্রষ্টার সীমানায় প্রবেশের দুঃসাহস না করাই বুদ্ধিমত্তা। আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ নেয়ার দরকার নেই।

www.maktabatulabrar.com

অতএব নফ্‌ছ ও শয়তানকে বলুন, মানুষ কি এই সসীম মহাজগতেরই সবকিছুর রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে? বৈজ্ঞানিক পরিচয়ের যে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মহাজগতের অনেক কিছুর রহস্য উদঘাটন করেছেন, তারাই তো বলছেন, “মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে যত বালুকণা রয়েছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক রয়েছে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র।” মানুষ এর কয়টির রহস্য আজ পর্যন্ত উদঘাটন করতে পেরেছে? যে কয়টির রহস্য উদঘাটিত হয়েছে, তাও কি পূর্ণাঙ্গ বা সবটুকু অকাট্য? তাহলে মানুষ মহাবিশ্বের কতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছে? বৈজ্ঞানিকদেরই কথামতে মহাজগতের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তু হল মহাজগতের সবকিছুর ৫%, অবশিষ্ট সব হল অদৃশ্যমান, যা বৈজ্ঞানিকদের কাছে কৃষ্ণশক্তি (মহাজগতের ৭০%) বা কৃষ্ণবস্তু (মহাজগতের ২৫%) নামে অভিহিত। এই কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণবস্তু সম্বন্ধে তথা সৃষ্টির ৯৫% সম্বন্ধে কিছুই না জানার কথা তারা অকপটে স্বীকার করছেন। অতএব দেখা গেল বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান মহাজগতের ৫%–এর ছিটেফোটা অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাহলে বৈজ্ঞানিকগণ মহাবিশ্বের কতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছেন? সুতরাং মানুষ অনেক কিছু বোঝে– একথা বলাটা কি আদৌ বাস্তব সম্মত? যারা মহাজগত সম্বন্ধে ধারণা রাখে না, তারা বৈজ্ঞানিকদের বাচনিক মহাজগতের দু' চারটে ছিটে-ফোটা তথ্য শুনেই মনে করে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক কিছু জানেন, অনেক কিছু পারেন। অথচ সেই বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু এরকম মনে করেন না বা তার দাবিও করেন না।

বহু মানুষ আছে যারা দু'চারটে কথা শিখতে পারাকেই মনে করে অনেক কিছু শেখা। তারা “অনেক”–এর পরিমাণকে খুব ছোট্ট করে ফেলেছে। এক বুড়ির ঘটনা শুনুন। বুড়িটির ধারণায় দারোগাই ছিল সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘ মানুষ। বুড়িটি একদিন শুনল, পদ্মা নদী অনেক গভীর। কথাটি শুনে বুড়ি বলল, কত গভীর! দারোগাও কি তাতে ঠাই পাবে না? ভেবে দেখুন তো এই বুড়িটির কাছে “ অনেক গভীর”–এর পরিধি কতটুকু! এই বুড়িকে পদ্মার প্রকৃত গভীরতা বোঝানোর কোনো উপায় আছে কি? তেমনি যারা একটু কিছু পারাকেই অনেক কিছু পারা বলে মনে করে, তাদের কাছেও “পারা”–এর পরিধি তেমনই ক্ষুদ্র। এ ব্যাপারে আর একটি ছোট্ট গল্প শোনাই। গল্পটি বলেছিলেন আমাদের উস্তাদ গওহরডাঙ্গা

মাদ্রাসার সবছাত্রের কাছে প্রিয় এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব (রহ.)। "কলাখালী হুজুর" নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ক্লাসে খুব গল্প বলতেন। খুব শিক্ষ্যণীয় সব গল্প। একবার আমাদের এক ক্লাসে এই "পারা" সম্পর্কে তিনি একটি গল্প বলেছিলেন। বরিশাল অঞ্চলের এক গ্রাম্য ব্যক্তি অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে চক্ষু বিস্ফারিত করে টেনে টেনে বলছে, "মোগো বাড়ির বড় গ্যাদা কত কিছু পারে েে ে, গাল দিয়া বিড়ি খাইয়া া া া নাক দিয়া ধুমা ছাড়ে েে ে!"

প্রশ্ন: একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন– এর বিপরীত বক্তব্য যখন শয়তান গেলাতে না পারবে তখন মনের মধ্যে এই ওয়াছওয়াছাও এনে দিতে পারে যে, আসলে সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন বটে তবে সৃষ্টিকর্তা স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয় বরং এই প্রকৃতিই হচ্ছে শ্রষ্ঠা। প্রকৃতির দ্বারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

জওয়াব: প্রকৃতি বলতে বোঝায় এই মাটি, পানি, আলো বাতাস ইত্যাদিকে। এগুলোর তো কোন বোধশক্তি বা জ্ঞান নেই। এগুলো কীকরে শ্রষ্ঠা হতে পারে? এই মহাবিশ্ব ও তার সবকিছুকে সৃষ্টি করতে এবং এ সবকিছু পরিচালনা করতে কোন বোধশক্তি বা জ্ঞানের প্রয়োজন নেই তা একমাত্র কোন বদ্ধ পাগলই বলতে পারে। নফ্ছ শয়তানকে বলে দিন, "আমি প্রকৃতিকে খোদা মেনে বদ্ধ পাগল প্রতিপন্ন হতে রাজি নই।"

নফ্ছ ও শয়তানকে এত কথা শোনানোর পর আপনি হয়তো মনে মনে ভাববেন আল্লাহ আছেন তার প্রমাণ প্রসঙ্গে যথেষ্ট বক্তব্য রাখতে পেরেছি। এরপর বোধ হয় নফ্ছ ও শয়তান এ ব্যাপারে অন্তত আর সামনে অগ্রসর হবে না। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় সে আর আমাকে প্রতারিত করার চেষ্টা করবে না। কিন্তু শয়তান আপনার ভাবনার কথাটি বুঝে ফেলবে। এ এক অদ্ভূত! বিষয়, শয়তান সব চিন্তাই টের পায়। মনের সব কথাই সে জানতে পারে। শয়তান কীকরে মনের সব কথা টের পায় এবং বুঝতে পারে সে সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে "শয়তান মনের কথা বোঝে কীকরে?" শিরোনামে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

যাহোক শয়তান মানুষের মনের কথা ও মনের চিন্তা-চেতনা টের পায়। সেমতে আপনি যে-ই মনে মনে ভাববেন নফ্ছ ও শয়তানের সামনে আল্লাহ আছেন তার প্রমাণ প্রসঙ্গে যথেষ্ট বক্তব্য রাখতে পেরেছি, এরপর

www.maktabatulabrar.com

বোধ হয় নফ্ছ ও শয়তান এ ব্যাপারে অন্তত আর সামনে অগ্রসর হবে না, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় সে আর আমাকে প্রতারিত করার চেষ্টা করবে না, শয়তান আপনার এ ভাবনার কথাটিও বুঝে ফেলবে। তাই আবার শয়তান মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। প্রশ্ন তুলবে–

প্রশ্ন: আল্লাহ আছেন তা কী করে বিশ্বাস করা যায়? কেউ কি আল্লাহকে দেখেছেন? না দেখে বিশ্বাস করা কি অন্ধ বিশ্বাস নয়?

জওয়াব: হাঁ দেখেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন। মেরাজের রাতে তিনি স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছেন। শুধু আল্লাহকে নয়, জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদি যা কিছু আমরা না দেখে বিশ্বাস করি সেসব কিছু তিনি স্বচোখে দেখে এসেছেন। এই সবকিছু তাঁকে দেখানো হয়েছিল, যাতে কেউ বলতে না পারে এবং সন্দেহ করতে না পারে যে, ঈমানের কথা যা কিছু আমরা শুনি যেমন: আল্লাহ্ আছেন, জান্নাত আছে, জাহান্নাম আছে ইত্যাদি, এসব কিছু প্রকৃতপক্ষে আছে কি না? কেউ তো কোন দিন দেখেনি! এখন আর এরকম সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কারণ, এগুলো আছে তা এমন একজন দেখে এসে বলেছেন, যাকে দুনিয়ার কেউ মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। ঘোর শত্রু পর্যন্ত যাকে মিথ্যুক বলতে পারেনি। আমাদের মত লক্ষ মানুষকে যদি দেখানো হত, আর আমরা দেখে এসে বলতাম, তবুও মানুষ অস্বীকার করতে পারত যে, হয়তো পরিকল্পিতভাবে আমরা মিথ্যা বলছি। কিন্তু এমন একজনকে দেখানো হয়েছে, যাকে কেউ মিথ্যুক বলতে পারেনি এবং পারবেও না। আমাদের মত লক্ষ কোটি মানুষের দেখার চেয়ে তাঁর একার দেখার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি। তিনি দেখে এসে বলেছেন, অতএব এটাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অন্ধ বিশ্বাস হতে পারে না। আমাদেরই মধ্যকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু দেখার পর সেটাতে বিশ্বাস করাকে আদৌ অন্ধ বিশ্বাস বলা যেতে পারে না।

এ বক্তব্য পেশ করার পর এ প্রসঙ্গে আর কোন ওয়াছওয়াছা না আসারই কথা। কিন্তু তবুও আসতে পারে। যেমন, আপনার মনের মধ্যে এল–

প্রশ্ন: সরাসরি নিজে না দেখলে তো মনের মধ্যে কিছু খটকা বা খুঁতখুতানি থেকেই যায়, অন্য যে কেউ যতই দেখুক না কেন।

জওয়াব: এরূপ প্রশ্ন বা ওয়াছওয়াছা আসলে বলুন, এটা ভুল কথা। নিজে না দেখলেই খটকা থাকবে– এমন না-ও হতে পারে। আমরা পৃথিবীর অনেক দেশ, অনেক কিছু নিজেরা দেখিনি, কিন্তু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে শুনে বিশ্বাস করি, তাতে তো কোন খটকা বোধ করি না। আমাদের মধ্যে বহু মানুষ রয়েছে যারা জীবনে কোন দিন মক্কা, মদীনা, লন্ডন, আমেরিকা, চীন, জাপান, ইরান, তুরান– কতসব দেশ বা শহর দেখেনি। মানুষে দেখে বলে তারা তাই শুনে বিশ্বাস করে। এতে তো কোন খটকা বোধ করে না? অতএব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত সর্বজন স্বীকৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্বের ঈমান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি স্বচক্ষে দেখে এসে বলার পরও যদি কারও মনে সেসব সম্বন্ধে কোন খুঁতখুতানি থাকে, তাহলে সেটা তার চিন্তার অপক্কতা বলেই বিবেচিত হবে। সে লোক বিষয়টাকে এভাবে চিন্তা করে দেখেনি বলেই তার মধ্যে খুঁতখুতানি থেকে যাচ্ছে। সে এটাও ভেবে দেখেনি যে, ঈমান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে খুঁতখুতানি বোধ করা তার স্ববিরোধিতাও। কারণ, একদিকে সে নিজে না দেখা স্বত্ত্বেও অন্যের দেখার ভিত্তিতে হাজার লক্ষ বিষয়ে স্বাচ্ছন্দে বিশ্বাস পোষণ করে চলছে, অপর দিকে ঈমান-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে শুধু নিজে দেখেনি এর ভিত্তিতে সন্দেহ পোষণ করে যাচ্ছে। অতএব এরূপ স্ববিরোধপূর্ণ ও অপক্ক চিন্তা থেকে সৃষ্ট খুঁতখুতানি ধর্তব্যের পর্যায়ে আসতে পারে না।

বস্তুত বিশ্বাস করার জন্য নিজের দেখা বা অন্যের দেখা কোনটারই দরকার হয় না। নিজের মধ্যে "মন" আছে, এটা কে না বিশ্বাস করে? প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে। কিন্তু মন কেমন তা কি সে নিজে দেখেছে না অন্য কেউই দেখেছে? মনের আকার- আকৃতি কেমন, মনের রং কেমন, সাইজ কি, কোন্ ধাতু দিয়ে গঠিত– এর কোনটা কি কেউ জানে বা দেখেছে? তবুও মানুষ তা বিশ্বাস করে শুধু এর ভিত্তিতে যে, মন আছে তা টের পাওয়া যায়। তদ্রূপ পৃথিবীর প্রত্যেকটা বস্তু, প্রত্যেকটা ছন্দ-পতন থেকে টের পাওয়া যায় যে, এর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। এভাবে টের পাওয়ার পরও বিশ্বাসে কোন খুঁতখুঁতানি থাকলে তাতে কিছু আসে যায় না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

www.maktabatulabrar.com

﴿وَفِي الْأَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ، وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করতে চায় তাদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে। আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে)। তবুও কি তোমরা দেখবে না? (সূরা যারিয়াত: ২০–২১)

এতকিছুর পর আল্লাহকে না দেখার কারণে কোনই খুঁতখুঁতানি থাকার কথা নয়। তবুও কারও মধ্যে যদি কিছু খুঁতখুঁতানি অনুভূত হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেটা শয়তানেরই প্রক্ষেপন। শয়তানই তাকে বলছে, তোর ভিতর তো খুঁতখুঁতানি রয়ে গেল, আর তাই সে মনে করছে আমার মধ্যে খুঁতখুঁতানি রয়েছে, যদিও বাস্তবে তার মধ্যে কোনই খুঁতখুঁতানি নেই। শয়তানের বলার কারণেই এমনটি মনে হচ্ছে। অন্যের বলার কারণেও যে নিজের মধ্যে সমস্যা আছে বলে বোধ হয়– এমন একটা গল্প মনে পড়ল। সরল গোছের একজন শিক্ষক ক্লাসে পড়াতে গিয়েছেন। দুষ্ট প্রকৃতির ছাত্ররা পূর্বেই পরিকল্পনা করে রেখেছে আজ তারা পড়বে না। পরিকল্পনা মোতাবেক উস্তাদজী ক্লাসে যেতেই একজন ছাত্র বলে উঠল, উস্তাদজী আপনি কি অসুস্থ? উস্তাদজী বললেন, না তো। আর একজন ছাত্র বলে উঠল, জি উস্তাদজী আপনার চেহারায় কেমন অসুস্থতার ভাব দেখা যাচ্ছে। আর একজন বলে উঠল, চোখটাও কেমন লালচে মনে হচ্ছে। এভাবে কয়েকজন একের পর এক উস্তাদজীর চেহারায় অসুস্থতার বিভিন্ন লক্ষণের কথা উল্লেখ করল। অবশেষে উস্তাদজী বললেন, হাঁ কয়েকদিন যাবতই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। নানান ব্যস্ততায় শরীরের দিকে খেয়াল দেয়ারও সুযোগ ঘটেনি। আচ্ছা, আজ না হয় ক্লাসটা বন্ধই থাকুক। তিনি সোজা বাসায় ফিরে গেলেন। কাঁতরাতে কাঁতরাতে ঘরে গিয়ে উঠলেন। বিবি এগিয়ে এসে বলল, এ-ই তো কেবল সুস্থ মানুষটি বাসা থেকে গেলে, এরই মধ্যে এমন অসুস্থ হয়ে পড়লে? বেচারা স্বামী বলে উঠল, হাঁ আমার রোগ-ব্যধি হলে তো তোমার চোখে ধরা পড়ে না, ছাত্রদের চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে। এই বুড়োটা মরলেই আর একটা জওয়ান তাজা ছেলের সাথে নিকে বসতে পারবে! বিবি বলল, তুমি সরল মানুষ বুঝতে পারনি, দুষ্ট ছেলেরা হয়তো ক্লাস না করার জন্যই এমনটা বলেছে, আর তাদের বলার কারণেই তুমি অবাস্তব ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছ। তাই বলছিলাম,

এতকিছুর পরও কারও মনে আল্লাহ সম্বন্ধে খুঁতখুঁতানি অনুভূত হলে তার বুঝে নেয়া উচিত এটা শয়তানেরই শেখানো কথা যে, তার মধ্যে খুঁতখুঁতানি রয়ে গেছে, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে খুঁতখুঁতানি নেই। তাকে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম পড়তে হবে এবং মনকে বোঝাতে হবে যে, আসলে কোনই খুঁতখুঁতানি নেই, আমার অন্তরে ঠিকই দ্ব্যর্থহীন বিশ্বাস রয়েছে। মনকে এরূপ বললে সে অনুভব করবে যে, তার অন্তর খুঁতখুঁতানি মুক্ত হয়ে গেছে।

আল্লাহর ব্যাপারে খুঁতখুঁতানি না থাকলেও যেমন ভিত্তিহীনভাবে নফ্‌ছ ও শয়তান মনের মধ্যে খুঁতখুঁতানি থাকার অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়, এরূপ অনেক ব্যাপারেই নফ্‌ছ ও শয়তান মনের মধ্যে ভিত্তিহীন অনুভূতি দাঁড় করায়। তখন মনকে বলতে হয় আসলে এটা নেই। এরূপ বললে সেই ভিত্তিহীন অনুভূতি মন থেকে মুছে যায়। যেমন আপনি নামাযে দাঁড়িয়েছেন। মনের মধ্যে অহেতুক তাড়াহুড়োর মনোভাব জাগবে। মনে হবে কত কাজ রয়ে গেছে! নামায পড়ে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, এক কাপ চা না খেলে তো আর চলছেই না, একটা পান মুখে পুরতে না পারলে তো মস্তিষ্ক সজীবই হচ্ছে না, চুরোটে একটা টান দিতে না পারলে তো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল, দোকানে কত কাষ্টমার ভিড় করে আছে, অফিসে কত লোক কাজ নিয়ে বসে আছে, জরুরী মুতালাআ রয়েছে, লেখার মত কত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মাথার মধ্যে রয়েছে, এখনই লিখে নেয়া চাই, একটু হিসেব বাকি রয়েছে, ওটা শেষ করতে পারলেই আজকের কাজের ঝামেলা মিটে যায়, মহিলা হলে মনে হবে একটু রান্নার কাজ বাকি রয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে এগুলো প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যস্ততাই নয়। এ বিষয়গুলো এমন যা পাঁচ দশ মিনিট পরে করলেও তেমন কোন অসুবিধে হয় না। মনকে বলুন, আচ্ছা! ধীরে সুস্থে নামাযটা আদায় করতে না হয় পাঁচ মিনিট বিলম্ব হবে, তাতে এমন কোনই ক্ষতি হবে না। এগুলো পাঁচ মিনিট পরে করলেও চলবে। মনকে আরও বলুন, প্রকৃতপক্ষে আমার কোনই ব্যস্ততা নেই, অহেতুকই আমি ব্যস্ততা অনুভব করছি। এরূপ চিন্তা করলে দেখবেন সত্যিই আপনার মন থেকে ব্যস্ততার অনুভূতি বিলীন হয়ে গেছে।

www.maktabatulabrar.com

তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

আল্লাহ আছেন তার প্রমাণ প্রসঙ্গে এতকিছু বলার পরও যদি নফ্‌ছ ও শয়তানের পক্ষ থেকে আপনার মনে এরূপ প্রক্ষেপন হয় যে, তবুও আল্লাহকে যদি সকলেই স্বচক্ষে দেখতে পেত, এমনিভাবে ঈমান-সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ই যদি সকলেই স্বচক্ষে দেখতে পেত, তাহলে তো কারও মধ্যেই অস্পষ্টতা থাকত না। মু'মান বিহী (ঈমান-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, যেমন আল্লাহর সত্তা, জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব, পুলসিরাত, মীযান, হাউযে কাউছার ইত্যাদি।) গায়েব বা অদৃশ্য থাকার কারণেই তো মনের মধ্যে এতসব অস্পষ্টতা বিরাজ করে। যদি এসব গায়েব না হয়ে দৃশ্যমান হত, তাহলে তো কোনোই অস্পষ্টতা থাকত না। যদি আল্লাহর সত্তা গায়েব না হত, সকলেই তাঁকে এই চোখে দেখতে পেত, তাহলে একদিকে অস্পষ্টতা কেটে যেত, অপরদিকে দেখে ইবাদত করতে মনোনিবেশও ভাল হত। এখন না দেখে ইবাদত করা হয় বলে মনোযোগ অন্য দিকে চলে যায়। দেখলে দৃষ্টি তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ থাকত, মনোযোগ অন্যত্র যেত না।

মনের মধ্যে এরূপ প্রক্ষেপন হলে প্রথমত বলুন, দেখলেই মনোযোগ অন্যদিকে যেত না– একথা বাস্তব নয়। এই কুরআন কিতাব কতকিছু দেখে দেখে পাঠ করতে থাকার সময়ও তো মনোযোগ অন্যত্র চলে যায়। ড্রাইভার খোলা চেখে সবকিছু দেখে দেখে গাড়ি চালানোর সময়ও তো মনোযোগ অন্যত্র যাওয়ায় এক্সিডেন্ট করে। বহু সময়ই তো এমন হয় যে, একজনের দিকে তাকিয়ে তার সাথে কথা বলছি, কিন্তু মন চলে গেছে অন্যত্র। অতএব আল্লাহকে দেখা গেলে মনোযোগ তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ থাকত, অন্যত্র যেত না– একথাটা বাস্তব নয়। দ্বিতীয়ত বলুন, আল্লাহর সত্তা হল অসীম এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তি হল সসীম। আর সসীম শক্তি দিয়ে অসীমকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অতএব দুনিয়ার এই চোখে আল্লাহ তাআলার সত্তাকে দেখা সম্ভব নয়। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.﴾

অর্থাৎ, দৃষ্টি তাকে দেখতে সক্ষম নয়, তিনি সব দৃষ্টিকে দেখেন। তিনি তো সুক্ষ্ম, সর্বজান্তা। (সূরা আনআম: ১০৩)

যদি নফ্ছ ও শয়তান বলে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে তো তাঁকে দেখার মত ক্ষমতা মানুষের চোখে দিতেও পারতেন। তিনি তো সবকিছু করতে সক্ষম, তিনি পারেন না– এমন কোন বিষয় আছে কি?

তাহলে আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলা সবকিছু পারেন, তবে পারেন বলেই সবকিছু করেন না। অযৌক্তিক কোন কিছু তিনি করেন না। আল্লাহর সত্তাসহ ঈমান-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি মানুষকে দেখানো হলে তো ঈমান বিল গায়েব তথা না দেখে বিশ্বাস করা থাকত না, তখন তো সেটা দেখা বিষয়ে ঈমান হত। তাতে তো বিশ্বাসের পরীক্ষা হত না। না দেখে বিশ্বাসের মধ্যেই বিশ্বাসের পরীক্ষা হয়। তিনি তো দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষার জন্যই পাঠিয়েছেন। অতএব তাঁকে দেখার ক্ষমতা না দেয়ার মধ্যেই যৌক্তিকতা বিদ্যমান।

যদি নফ্ছ ও শয়তান বলে, তাহলে অন্তত আল্লাহর একটা প্রতিকৃতি বানিয়ে তাঁকে সামনে রেখে ইবাদত করার অনুমতি থাকলে কেমন হত? তাতে অন্তত ইবাদতে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকার ফায়দাটা পাওয়া যেত। না-দেখা সত্তার ইবাদত করা হয় বলেই মনোযোগ বিচ্যুত হয়ে থাকে, দৃশ্যমান হলে মনোযোগ তার প্রতিই নিবদ্ধ থাকত।

তাহলে আপনি বলুন, একথার জবাব তো পূর্বেই দেয়া হল। তারপরও প্রতিকৃতি বানানোর কথা বলে কি তুমি আমাদেরকে মূতিপূজারীদের মত হতে বলছ। নাউযু বিল্লাহি মিন্ যালিক! মূর্তিপূজারীদেরও তো এই যুক্তি যে, আসল খোদা নিরাকার, তাকে দেখা যায় না, অতএব তার মূর্তি বা প্রতিমা বানিয়ে তাকে দেখে ইবাদত কর। কিন্তু তারা এটা বোঝে না যে, এতে তো মনোনিবেশ হয় মূর্তির প্রতি, আসলের প্রতি নয়। সামনে সাকার বা দৃশ্যমান কিছু না থাকলেই যেখানে অদৃশ্য সত্তার প্রতি মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়, সেখানে সামনে সাকার কিছু থাকলে তো অদৃশ্য সত্তার প্রতি মনোযোগ যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তখন তো সর্বতোভাবেই শুধু দৃশ্যমান সত্তার প্রতিই মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে। তাহলে দেখা যাবে আসলের উদ্দেশ্যে বানানো হল প্রতিকৃতি কিন্তু প্রতিকৃতিই শেষতক আসলের স্থান দখল করে নিল। সেই প্রতিকৃতি বা মূর্তিকে নিয়েই এমন ব্যস্ত থাকা হল যে, আসল খোদা মন থেকে হারিয়ে গেলেন লক্ষ যোজন দূরে।

www.maktabatulabrar.com

এমন একটা উপলব্ধি থেকেই হয়তো কবিগুরু রবি ঠাকুর বলেছিলেন,

মুগ্ধ ওহে স্বপ্নঘুরে,
যদি প্রাণের আসন কোণে
ধুলায় গড়া দেবতারে,
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে
চিরদিনের প্রভূ তবে,
তোদের মনে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে,
কতনা যুগ যুগান্তরে

অতএব শত শত কোটি, হাজার হাজার কোটি ইবাদতকারী কোটি কোটি প্রতিকৃতি বানিয়ে নিলে তাওহীদ বা একত্বের দশা কি হবে তা তো বিবেচনার বিষয়! তদুপরি তাতে একমাত্র আসলকে নিয়ে চলার মত মজা থাকবে কোথায়? জনৈক উর্দূ কবি সুন্দরই বলেছেন,

ایک سے جب دو ہوئی تو فرو یکتائی نہیں + اس لئے تصویر جاناں ہم نے کینچو ائی نہیں

অর্থাৎ, এক থেকে যদি দুই হয়ে যায়, তাহলো তো এক-এর এক থাকার মজাই শেষ হয়ে যায়। তাই তো আমি প্রেমাষ্পদের ছবি বানাতে যাইনি।

আল্লাহ পাক এমনই প্রেমাষ্পদ যে, তাঁর স্থানে অন্য কেউ কোনোভাবে এসে যাক তা তিনি মোটেই বরদাশত করেন না। আল্লাহর প্রতিকৃতি বানানো হলে সেই প্রতিকৃতির প্রতি যতটুকু মনোনিবেশ নিবদ্ধ হবে, ততটুকু থেকেও আল্লাহ পাক বঞ্চিত হতে চান না। তিনি চান তাঁর প্রেমিকদের সব রকম নিবেদন সর্বতোভাবে শুধু তাঁরই জন্য হোক একান্ত। তিনি হতে চান তাঁর প্রেমিকদের একমাত্র ও একান্ত প্রেমাষ্পদ, যাতে কেউ কোনোভাবে থাকবে না শরীক। একেই তো বলে প্রেমাষ্পদ, একেই তো বলে প্রেমিক। প্রেমের স্বভাবই এ-ই। প্রেম কোনোভাবে কোনো শরীকানা সহ্য করে না। প্রেম চায় প্রেমিক একাত্ম হয়েই প্রেমাষ্পদের ধ্যান করুক, শুধু তাঁরই জন্য হোক তার সব কিছু নিবেদিত। এই একাত্মতাই হল তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব। তাওহীদ বা একাত্মতা না হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় না। যেমন প্রেমাষ্পদকে খুশি করা যায় না তার প্রতি একাত্ম হওয়া ব্যতীত। নানান ঘাটে গমনকারী

প্রেমিককে কোন প্রেমাস্পদ পছন্দ করে না। এভাবে প্রেমাস্পদের মন পাওয়া যায় না। এ জন্যই কবি খুব সুন্দর করে বলেছেন,

دریں راہ حاصل جز یک دلے نیست + دو دل بودن بجز بے حاصلے نیست

অর্থাৎ, প্রেমের এ পথে এক মন হওয়া ব্যতীত কিছু অর্জন হয় না। দুই মন হলে বঞ্চনা বৈ কিছুই জোটে না।

একাধিক খোদা থাকলে কী অসু বিধা?

এই তাওহীদের আলোচনা আসলেই নফ্‌ছ ও শয়তান বলতে পারে একাধিক খোদা থাকলে অসুবিধে কি? আপনি উল্টো জিজ্ঞেস করতে পারেন, সুবিধেটা কি? নিশ্চয় কোন সুবিধের দিক সে দেখাতে পারবে না। কারণ, দুনিয়াতে সকলেই স্বীকার করে যে, এক হাতে চললেই সবকিছু ভাল থাকে, ভাল চলে, ঠিকঠাক মত চলে। গাড়ি-ঘোড়া, মেশিনপত্র, যন্ত্রপাতি, বইপত্র, খাতা-কলম ইত্যাদি মালিকের এক হাতে চললেই ভাল থাকে, ভাল চলে। তাই একাধিক খোদা থাকলে সুবিধে কি হত তা শয়তান দেখাতে পারবে না। তারপরও শয়তান মনের মধ্যে প্রশ্ন তুলতেই থাকবে যে, একাধিক খোদা থাকলে অসুবিধে কি? তাহলে তার জওয়াবে আপনি খুব সহজে বলতে পারেন, একাধিক খোদা থাকলে অসুবিধে কি হত তা বুঝতে খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার হয় না, এই আমাদের দেশের দুই নেত্রীর দিকে তাকালেই তা সহজে বুঝে আসে। উভয়জন ক্ষমতায় নেই, একজন ক্ষমতায় আর একজন ক্ষমতার বাইরে। একজন আরেকজন থেকে দূরে। এই দূরে থেকেই দু'জনের মধ্যে যে পরিমাণ ঢিলেঢিলি চলতে থাকে, তাতে দু'জনই যদি একসাথে ক্ষমতার মসনদে আসীন থাকত, তাহলে যে দস্তুরমত চুলোচুলি ও কিলাকিলি হত তা হলফ করেই বলা যায়। আর তেমন হলে দেশের বারটা কীভাবে বাজত তা বুঝতে কোন ব্যাখ্যার দরকার হয় না। একাধিক খোদা থাকলে দুনিয়ারও এরকম বারটা বাজত। এ বিষয়টাই কুরআনে কারীমে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

﴿لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا.﴾

অর্থাৎ, যদি আসমান জমিনে এক আল্লাহ না হয়ে একাধিক ইলাহ হত, তাহলে আসমান জমিনের দশা খারাপ হয়ে যেত। (সূরা আম্বিয়া: ২২)

www.maktabatulabrar.com

ছবি, প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন রকম স্মৃতিস্তম্ভ প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

আমি একবার মনে মনে ভাবছিলাম– ছবি তোলা ও প্রতিকৃতি বানানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেসব কারণে, তার মধ্যে একটা বিশেষ কারণ কি এ-ও যে, ছবি তুললে বা প্রতিকৃতি বানালে সেই ছবি বা প্রতিকৃতির প্রতি কিছুটা হলেও মনোনিবেশ নিবদ্ধ হবে। এভাবে যতটুকু মনোনিবেশ ছবি বা প্রতিকৃতির প্রতি নিবদ্ধ হবে আসল ব্যক্তি (যার ছবি/প্রতিকৃতি) ততটুকু মনোনিবেশ থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহর ছবি বা প্রতিকৃতি হলে তার প্রতি মনোযোগ প্রদান তো আল্লাহর প্রতি মনোযোগের ক্ষেত্রে শরীকানার শামিল হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে তো ছবি বা প্রতিকৃতি হয়ে দাঁড়াল শিরক অনুপ্রবেশের এক সূক্ষ্ম চোরা গলি। বোধ হয় এ জন্যই যারা ছবি কিংবা মূর্তি/প্রতিকৃতি বানায় কেয়ামতের দিন তাদেরকে সেই ছবি বা মূর্তি/প্রতিকৃতিতে জীবন সঞ্চারের জন্য বলা হবে যে, আমার সাথে শরীকানার মত কাজ করেছিলে, আমার শরীক তৈরি করেছিলে তোমরা, শরীকরা আমার ইবাদতে শরীক হয়েছে আর সেই শরীকদেরকে তৈরি করেছিলে তোমরা, সেমতে তোমরা হলে বড় শরীক, যেন শরীকদের স্রষ্টা। তাহলে এখন ওগুলোর মধ্যে জীবন সঞ্চার করে দেখাও কতটুকু তোমাদের ক্ষমতা, কেমন স্রষ্টা তোমরা! যদি এর ক্ষমতা না-ই থাকবে, তাহলে এমন কাজ করেছিলে কেন? হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

« إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.»

অর্থাৎ, এই ছবি/প্রতিকৃতি নির্মাতাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা এই যা তৈরি করেছিলে তাতে জীবন সঞ্চার কর। (মুসলিম: হাদীছ নং ২১০৭)

ছবি, মূর্তি/প্রতিকৃতিতে ভক্তি নিবেদন তো কিছু ধূলোবালি একত্র করে তার প্রতি ভক্তি নিবেদন বৈ কিছু নয়। একটা ঘটনা শুনুন। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২১ তারিখ অন্যান্য ২১ ফেব্রুয়ারীর মতই ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হল। যারা ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ মীনারে সরাসরি ফুল মাল্য যা কিছু নিবেদন করার তা করল। পরের দিন একটা বহুল প্রচলিত দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় শেরপুর থেকে তোলা একটা ছবি দেখলাম। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন বালক বালিকা রাস্তার পাশে

কয়েকটা ইটের টুকরো দাঁড় করিয়ে তাতে মনের আবেগ মিশ্রিত করে ফুল মাল্য প্রদান করছে। সাংবাদিক সাহেব এটাকে খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে মূল্যায়ন করে রিপোর্ট করেছেন। আমার মনে হল জাহিলী যুগের মানুষদের সম্বন্ধে শুনেছি তারা পথে ঘাটে মনে চাইলে কিছু ধূলোবালি একত্র করে তাতেই পূজা নিবেদন আরম্ভ করে দিত। এমনসব কাণ্ডকারখানার কারণেই তাদেরকে অন্ধ যুগের মানুষ বলে গালি দেয়া হয়। কিন্তু শেরপুরের এই চিত্রে তার চেয়ে খুব একটা ব্যতিক্রম কী পাওয়া গেল?

যাহোক বলা হচ্ছিল, আল্লাহর ছবি বা প্রতিকৃতি বানালে আল্লাহর প্রতি মনোযোগিতায় আল্লাহর শরীকানা হয়ে যায়। এটা সুক্ষ্মভাবে শিরকের সূচনা করে। এভাবে আল্লাহকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিতও করা হয়। এমনিভাবে গুরুজনের ছবি বা প্রতিকৃতি হলে যতটুকু ভক্তি তাদের ছবি বা প্রতিকৃতির প্রতি নিবেদিত হয় গুরুজন ততটুকু ভক্তি থেকে বঞ্চিত হন, অথচ অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের ভক্তির পূরোটা পাওয়াই ছিল তাদের প্রাপ্য অধিকার। স্নেহাস্পদের ছবি বা মূর্তি হলে যতটুকু স্নেহ তার ছবি/প্রতিকৃতির প্রতি নিবেদিত হয়, সেই স্নেহাস্পদ ততটুকু স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়, অথচ মুরব্বী ও গুরুজনদের স্নেহের পূরোটা পাওয়াই ছিল তাদের প্রাপ্য অধিকার। প্রেমাস্পদের ছবি বা প্রতিকৃতি হলে যতটুকু প্রেম সেই ছবি বা প্রতিকৃতির প্রতি নিবেদিত হয় প্রেমাস্পদ ততটুকু প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়, অথচ প্রেমিকদের অখণ্ড প্রেম পাওয়াই ছিল তাদের প্রাপ্য অধিকার। এভাবে ছবি বা প্রতিকৃতি গুরুজন, স্নেহাস্পদ ও প্রেমাস্পদ সকলের অধিকার কিছুটা হলেও কেড়ে নেয়। ছবি বা প্রতিকৃতিই তখন গুরুজনের ভক্তিতে, স্নোহস্পদের স্নেহে এবং প্রেমাস্পদের প্রেমে শরীক হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি ছবি/প্রতিকৃতিকে নিয়েই এমন ব্যস্ত থাকা হল যে, আসল ব্যক্তি মন থেকে সম্পূর্ণই হারিয়ে গেল, যেমনটা মূর্তিপূজারী অংশীবাদীদের বেলায় দেখা যায়, তাহলে তো ছবি/প্রতিকৃতিই হল তাদের সব বঞ্চনার উৎস। অতএব সারকথা বলা যায়– ছবি বা প্রতিকৃতি দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে শির্‌কের সূচনা হয় আর কোন কোন ক্ষেত্রে তা দ্বারা অধিকার লংঘিত হয়। এ দৃষ্টিভংগীতে বিচার করলে ছবি বা প্রতিকৃতি একাধারে খোদার অধিকার ও মানুষের অধিকার উভয়টি লংঘিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বিধায় নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিসংগত।

www.maktabatulabrar.com

যদি নফ্‌ছ ও শয়তান আপনাকে বলে, ছবি বা প্রতিকৃতির মধ্যে ভাল দিকও তো রয়েছে। মৃত গুরুজন ও মৃত আপনজনদের ছবি বা প্রতিকৃতি দেখলে তো তাদের কথা স্মরণ হয়, তাদের জন্য কিছু করার চেতনা জাগ্রত হয়।

তাহলে আপনি বলতে পারেন, ছবি বা প্রতিকৃতির মধ্যে খারাবের যে দিকগুলো রয়েছে তার ভিত্তিতেই তা খারাপ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কোন জিনিসে ভাল ও মন্দ দুটো দিক থাকলে সেই খারাবের পরিমাণ যদি বেশি বা মারাত্মক হয়, তাহলে সেটা গর্হিত বিবেচিত হতে আর অন্য কিছু চিন্তায় আনার দরকার হয় না। তদুপরি কথিত ভাল দিকটার বাস্তবতা যদি প্রকৃতপক্ষেই শূন্যের কোটায় থাকে, তাহলে তো সেদিকটার ভিত্তিতে বিবেচনার প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। ছবি বা প্রতিকৃতি দেখলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বেশি কিছু করা হয়– কথিত এ দিকটার কোন বাস্তবতা নেই, এটা বাস্তবতা-বিরোধী কথা। পূর্বসূরীরা মুরব্বীদের জন্য বেশি করত না কি ছবি/প্রতিকৃতি দেখে এই যুগের লোকেরা বেশি করে? এই যুগে যারা নিষ্ঠার সাথে ছবি/প্রতিকৃতি সংস্কৃতির চর্চা করে, তারা ছবি দেখে মৃত আপনজনদের স্মরণ করে সত্য, কিন্তু তাদের জন্য করার মত কিছুই করে না। যা-ও বা করে তা কোন কাজের কিছু নয়। কেউ তো ছবি/প্রতিকৃতির সামনে হাত জোড় করে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, যাতে মৃত ব্যক্তির তো কোন উপকার হয়ই না, উপরন্তু তা দ্বারা সে নিজে শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত কর্মে লিপ্ত হয়। কেউ তো ছবি/প্রতিকৃতির গলায় ফুলের মালা দেয়, কিন্তু এতে কি মৃতের কোন উপকার হয়? আমাদের তো এমন কিছু করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মার উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ছবি/প্রতিকৃতির গলায় মালা ঝোলানো দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মার কী উপকার সাধিত হয়ে থাকে? কিছুই না। যদি তা-ই হয়, এতে তাদের কোনো উপকার সাধিত না হয়, তাহলে তাদের উদ্দেশে কিছু করার নামে নিস্ফল ও অবান্তর কিছু করা দ্বারা কি তাদের মূল্যায়ন হল, না তাদের সাথে উপহাস হল? তাই বলছিলাম, যারা ছবি বা প্রতিকৃতি রাখে তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য বেশি কিছু করে– এ কথা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়। বরং যেসব দ্বীনদার ব্যক্তি ওসব ছবি বা প্রতিকৃতি না রাখে তারাই বেশি কিছু করে থাকে। তারা পাঁচ ওয়াক্ত

নামাযের পর পিতা-মাতা ও গুরুজনদের জন্য দুআ করে থাকে, সবসময় তাদের জন্য দান-খয়রাত ও ঈসালে ছওয়াব করে থাকে। ছবি বা প্রতিকৃতি রাখে এ গোছের লোকেরা মৃত আপনজনদের জন্য খুব বেশি কিছু করলেও সেটা হল বৎসরান্তে একটা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে ক্ষান্ত হওয়া। অথচ বিশুদ্ধ মতানুসারে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলে ছওয়াব তো নয়ই বরং উল্টো গোনাহ হয়। যেহেতু মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বেদআত, আর বেদআত হল গোমরাহী। অতএব বেদআত চর্চা করা গোনাহে কাবীরা। একটা দীর্ঘ হাদীছের একাংশে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». (رواه مسلم وأبو دواد واللفظ لأبي داود)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা নতুনসৃষ্ট বিষয় হল বিদ'আত। আর সব বিদ'আত হল গোমরাহী। (আবূ দাউদ ও মুসলিম)

সুতরাং মৃত আপনজনের ছবি বা প্রতিকৃতি রাখলে তা দেখে তাদের কথা স্মরণ হবে, ফলে তাদের জন্য বেশি কিছু করা হবে– এ যুক্তি আদৌ বাস্তবসম্মত নয়।

যদি নফ্‌ছ ও শয়তান আপনাকে বলে, যারা বিদেশ বিভুইয়ে বসবাস করে, তারা আপনজনের ছবি দেখে মনের তৃষ্ণা নিবারণ করে থাকে, ছবি তাদের আপনজনের সাক্ষাত বঞ্চিত অন্তরে শান্ত্বনার এক বিরাট উপকরণ। তাদের জন্য ছবি নিষিদ্ধ হওয়া তো তাদের আত্মাকে বঞ্চিত করার মত একটা পাষণ্ডতা!

তাহলে আপনি বলতে পারেন, ছবি দেখে মনের তৃষ্ণা নিবারণ না করলে তো যোগাযোগ করে সেই তৃষ্ণা নিবারণ করত। এখন ছবি দেখে তৃষ্ণা নিবারণ হওয়ায় যোগাযোগ রাখার স্পৃহায় কিছুটা হলেও ভাটা পড়ে, ফলে আপনজন সেই পরিমাণ যোগাযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। আর খোদা না করুক যদি সেই বিদেশ বিভুইয়ে বসে কোন গায়র মাহরাম নারীর ছবি দেখে আর সেই ছবি দেখার ফলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়ে যায় (বিবির ছবি দেখলেও অনুরূপ হতে পারে) তাহলে তো সেই চাপ সরাতে অবৈধ পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তাহলে তো বিবির আরও বঞ্চনা।

www.maktabatulabrar.com

তাইতো বলছিলাম, ছবি বা প্রতিকৃতি মানুষের অধিকার বঞ্চনার উৎস। আর ছবি দেখে অশান্ত মনে শান্ত্বনা লাভের প্রসঙ্গে কথা হল– বিদেশ বিভুইয়ে বসে আপনজনের ছবি দেখলে কি মনের শান্ত্বনা লাভ হয় না মনের অশান্তি আরও বেড়ে যায়? প্রথমত একটু শান্তনা লাভ হলেও পরে কিন্তু মনের অস্থিরতাই বৃদ্ধি পায়। ওরকম ছবি দেখতে দেখতে তো মন তাদের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এরকম ব্যাকুল হওয়া অনেককে তখন ভিটে মাটি বিক্রি করে সংগ্রহ করা বিদেশে যাওয়ার অর্থটুকু উপার্জন হওয়ার পূর্বেই দেশে রিটার্ন ব্যাক করতে দেখা যায়। তাহলে ছবি দেখে লাভ হল না লোকসান হল? সামান্য ঐটুকু শান্ত্বনা কি তাদের বিরাট স্থায়ী অশান্ত্বনার কারণ হয়ে দাঁড়াল না?

যদি নফ্‌ছ ও শয়তান আপনাকে বলে যে, অনেক মানুষ বৈবাহিক জীবনের প্রথম পর্যায়ের অনেক স্মৃতি অডিও/ভিডিও–এর মাধ্যমে স্থির চিত্রে বা চলচ্চিত্রে ধারণ করে রাখে, পরবর্তী জীবনে সেগুলো দেখে মনে আনন্দ লাভ করে থাকে। তাদের জন্য তো ছবি হারানো জীবনের আনন্দ পুনরুদ্ধারের একটা উপায়। এজন্যই তো এখন প্রগতিশীল সমাজ অডিও ভিডিও সবকিছুর মধ্যমে পুরাতন স্মৃতি ধরে রাখে।

তাহলে আপনি বলতে পারেন, পুরনো জীবনের চিত্র দেখার মধ্যে ক্ষতিও আছে। পুরণো চিত্রে বিবির টানাটানা চেহারা ও যৌবনকালের নিটোল নিটোল দেহ-বল্লরী দেখার পর বর্তমান অবস্থার লোলচর্ম দেখলে হাল অবস্থার প্রতি অস্পৃহভাব জাগতে পারে। আর একবার যদি কোনভাবে স্ত্রীর হাল অবস্থার প্রতি অস্পৃহভাব মনে এসে যায়, তাহলে তো বিবি এই শেষ বয়সে ছিটেফোটা যতটুকু আদর-আহ্লাদ পাচ্ছিল তা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে। তাই আবার পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয় যে, ছবি বা প্রতিকৃতি হল মানুষের অধিকার বঞ্চনার উৎস। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। এভাবে হারানো জীবনের আনন্দ পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে এখনকার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর যদি আগের চিত্র দেখে ওরকম আর একটা নিটোল নিডৌল সংগিনী লাভের চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরঘুর করতে আরম্ভ করে, আর সেই চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটেই যায়, তাহলে তো পুরণো বিবির আনন্দের সীমা থাকবে না, সতীনের সাথে মহানন্দে (?) যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে! রয়ে গেল প্রগতিশীলদের পুরাতন স্মৃতি ধরে

রাখার কালচার প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারে কথা হল– যারা নিজেদেরকে প্রগতিশীল বলে দাবী করে, তাদের পক্ষে তো পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করাই অসংগতিপূর্ণ। তারা কি ভেবে দেখে না যে, পেছনের দিকে ফিরে তাকানো প্রগতিশীলতার পরিপন্থী! প্রগতিশীল হতে গেলে নাকি পেছনের সবকিছুকে গলা ছেড়ে গালি দিতে হয়, পুরণো সবকিছুকে জীবনের অঙ্গন থেকে ঝেড়ে মুছে ওয়াশিং পাউডার দিয়ে ক্লিন করে নিতে হয়? নইলে তো প্রগতিশীল হওয়া হল না, সেকেলেই থেকে যাওয়া হল! তাহলে প্রগতিশীলদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখা কি অসংগত হবে যে, নিজেদেরকে প্রগতিশীল বলে দাবী করার পর পুরণো স্মৃতি ধরে রাখার এই স্ববিরোধিতা কেন?

যদি নফ্‌ছ ও শয়তান আপনাকে বলে যে, ছবি বা প্রতিকৃতির মধ্যে কি কোনোই ইতিবাচক দিক নেই? আজকাল জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অবদান রাখা ব্যক্তিদের স্মরণে অনেক রকম প্রতিকৃতি বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে রাখা হয়, সেসব প্রতিকৃতি বা স্মৃতিস্তম্ভ দেখে সকলের মধ্যে ওরকম জাতীয় পর্যায়ের অবদান রাখার চেতনা উজ্জীবিত হয়। জাতি সেসব প্রতিকৃতি বা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পন করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। ঐসব ঐতিহাসিক দিবস আসলে জাতির মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। এগুলো কি কোনোই ফায়দা নয়?

তাহলে আপনি বলতে পারেন, হে শয়তান! তুমি কিছু লোককে এরকম বুঝাতে পেরেছ বলেই তো আজ এমনটা হচ্ছে। তাদেরকে তো এভাবে ভেবে দেখারই সুযোগ দিচ্ছ না যে, প্রতিকৃতি বা স্মৃতিস্তম্ভে ফুল অর্পন করা দ্বারা কি আসলেই ঘটনা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়ে থাকে। শ্রদ্ধা পাওয়ার ব্যক্তি রইল কোথায় আর ফুল দেয়া হল কোথায়? ব্যক্তি রইল একখানে, আর অন্যত্র ফুলের তোড়া অর্পন করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মহড়া দেয়া হল– এটা অসংগতিমূলক ও হাস্যকর হয়ে যায় কি না তা কি একবারও ভেবে দেখার সুযোগ তাদেরকে দিয়েছো? তাদের কবরের কাছে গিয়ে ফুল অর্পন করলেও অন্তত এই অসংগতির দায় কিছুটা হলেও হয়তো এড়ানো যেত। তবে পুরোপুরি এড়ানো যেত না এ কারণে যে, কবর একটা ভিন্ন জগত আর ফুল দেয়া হয় একটা ভিন্ন জগতে। কাজেই একান্তই যদি ফুল দিতেই হয়, তাহলে কবরের কাছে ফুল না দিয়ে এই জগতের অন্য যে কোন স্থানে ফুল দিলেও চলত এবং তা

www.maktabatulabrar.com

একই কথাই হত। তা যখন করা হয় না, তখন ফুল প্রদানের এই মহড়াই সমূলে বাদ দিলে হয়। যদি কেউ বলতে চান যে, যেখানে ফুল অর্পন করা হয় সেখানে তাদের আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করে ফুল অর্পন করা হয়ে থাকে, তাহলে বলা যেতে পারে, প্রত্যেকে যার যার ঘরে তাদের আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করে নিজ নিজ ঘরেই ফুলের মাল্য ঝুলিয়ে রাখতে পারেন, তাতে উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হবে, নিজের ঘরের শোভা বর্দ্ধনও ঘটবে, আবার এত মূল্যবান ফুলের তোড়াগুলো অরণ্যে নিবেদন হওয়া থেকেও রক্ষা পাবে। আর রইল এসবের মাধ্যমে জাতির মধ্যে ওরকম অবদান রাখার চেতনা জাগ্রত করার দিক, সেটা অন্যভাবেও হতে পারে। তাদের সংশ্লিষ্ট ইতিহাস ব্যাপকভাবে আলোচনার দ্বারা সেটা হতে পারে, তাদের অধস্তনদের জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন করা দ্বারাও সেটা হতে পারে। যুক্তিসংগত আরও কত পন্থায় তা হতে পারে। কিন্তু সে পন্থাগুলো কি আদৌ গ্রহণ করা হয়। এমনও দেখা যায় যারা জাতির জন্য অবদান রাখে, তাদের স্মৃতিস্তম্ভে দেয়া হয় ফুলের ডালি অথচ তাদের অধস্তনদের হাতে থাকে ভিক্ষার ঝুলি।

যদি নফ্‌ছ ও শয়তান আপনাকে বলে যে, তাহলে এসব স্মৃতিস্তম্ভের বিরুদ্ধে আপনাদের আলেম সমাজ সোচ্চার হন না কেন? যেমন ফটো ছবি ও মূর্তির বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার? এ অন্যায়ের ব্যাপারে তারা নীরব কেন? অন্যায়ের ব্যাপারে নীরব থাকাও তো পাপ। তারাই তো বলেন,

اَلسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ.

অর্থাৎ, ন্যায় কথা বলা থেকে যে নীরব থাকে, সে হল বোবা শয়তান।

তাহলে আপনি বলতে পারেন, এবার কি তাহলে আলেম সমাজকে পুলিশের ঠেঙ্গানী খাওয়ার দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছ? যেকোনোভাবে বনী আদমকে কষ্টের দিকে ঠেলে দিতে পারলেই তো তুমি আনন্দে বগল বাজাতে পার। মস্তান সন্ত্রাসীদেরকে উস্কানী দিয়ে অপরাধের দিকে অগ্রসর কর, তারপর যখন তারা পুলিশের গুতানী খায়, রিমান্ডের বর্বর নির্যাতনে ক্লিষ্ট হতে থাকে, তখন তোমার কোন পাত্তা থাকে না, তুমি তখন চুপিসারে কেটে পড়। তখন তো তুমি পুলিশের লোকজনকে নির্যাতন না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে আস না এই ভেবে যে, এ বেচারারা তো আমার কথাতেই এ

পথে এসেছিল। কাজেই তাদের উপর আপতিত এই বিপদ সাধ্যমত কিছুটা হলেও প্রতিহত করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন,

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ.﴾

অর্থাৎ, (মুনাফেকরা) শয়তানের মত। শয়তান বলে তোমরা কুফরী কর, তারপর যখন তারা কুফরী করে তখন এই বলে কেটে পড়ে যে, তোমার এ ব্যাপারে আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। (সূরা হাশর: ১৬)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ.﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইফ্‌ছুফ: ৫) আর শত্রুর কাজ তো যেকোনো উপায়ে শত্রুতা চরিতার্থ করা। শত্রুর প্রতি কেউ দয়া করে না, শয়তানও তাই তার শত্রু বনী আদমের প্রতি কখনও দয়া করবে তা হতে পারে না।

উল্লেখ্য– শয়তান মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কীভাবে কেটে পড়ে তার বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে "শয়তান মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কীভাবে কেটে পড়ে?" শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

আর শয়তান যে এখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও তাতে ফুলের ডালি দেয়ার অন্যায়ের প্রতিবাদে আলেমদের সোচ্চার না হওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছিল, সে ব্যাপারে বলতে পারেন, তাহলে কি তুমি বোঝাতে চাচ্ছ যেহেতু আলেম সমাজ এ ব্যাপারে সোচ্চার নন তাই এটা অন্যায় নয়? তা অন্যায়ের ব্যাপারে নীরব থাকা কখন পাপ কখন পাপ না, কোন্ পরিস্থিতিতে কতটুকু নীরব থাকার অবকাশ আছে, কোন্ পরিস্থিতিতে সোচ্চার হওয়া দরকার, কখন নীরব থাকতে হয়– এসবের নিয়ম-কানুন, মাসলা-মাসায়েল আলেম সমাজ ভাল করেই জানেন, তাদেরকে তা শেখানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। নিশ্চয়ই আলেম সমাজকে একটা উৎকট ঝামেলায় ফেলানোর মতলবে তুমি এ কথা বলছ। আলেম সমাজের সাথে তোমার শত্রুতার মাত্রা বেশি তা এ কথা থেকেও বুঝা যাচ্ছে।

www.maktabatulabrar.com

জান্নাত, জাহান্নাম ও কবর আযাব প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

আল্লাহর অস্তিত্বের দলীল নিয়ে কথা বলতে বলতে নফ্‌ছ ও শয়তান বহুদূর নিয়ে গেল। মূর্তি পূজা, ছবি, প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ– কত বিষয়ের দিকে নিয়ে গেল। প্রায়শঃই এমন হয় নফ্‌ছ ও শয়তান এক কথার চিন্তা থেকে অন্য কথার চিন্তায় চলে যায়। দেখবেন নফ্‌ছ ও শয়তানের সাথে এক বিষয়ে বাহাছ শুরু হয়েছে, কিন্তু আলোচনা বেশিক্ষণ সে বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে দিক থেকে দিগন্তরে চলে গেছে। বিশেষত ইবাদত-বন্দেগী করতে শুরু করলে সেই ইবাদত-বন্দেগী কেন করা হচ্ছে এ চিন্তা উদিত হবে। তখন মনের মধ্যে আসবে আল্লাহর জন্য করা হচ্ছে, কবর আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য করা হচ্ছে, জান্নাত হাছিল করার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। এ চিন্তা আসার সাথে সাথে নফ্‌ছ ও শয়তানের পক্ষ থেকে প্রশ্ন আসবে আসলেই আল্লাহ আছেন কি? আসলেই কবরের আযাব বলে কিছু আছে কি? আসলেই জান্নাত জাহান্নাম আছে কি? প্রায়শই ইবাদত-বন্দেগীর সময় নফ্‌ছ ও শয়তানের পক্ষ হতে এ প্রশ্নগুলো এসে থাকে। এগুলো হল নফ্‌ছ ও শয়তানের কমন (common) প্রশ্ন বা কমন ওয়াছওয়াছা। কমন প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ হওয়া নিতান্তই ব্যর্থ ছাত্র সাব্যস্ত হওয়ার পরিচায়ক। আমরা এমন ব্যর্থ ছাত্র সাব্যস্ত হতে যাবে কেন? তাই এসব কমন প্রশ্নের জবাব অতি অবশ্যই জানা থাকতে হবে।

এখন এসব কমন প্রশ্নের জবাবের বিষয়ে আলোচনায় আসা যেতে পারে। এর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব থাকার বিষয়ে পূর্বে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। রইল কবরের আযাব বলে কিছু আছে কি, আসলেই জান্নাত জাহান্নাম আছে কি– এসব প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য কি হওয়া চাই? অনেক সাধারণ মুসলমানও এসব প্রশ্নের জবাব নিজ নিজ এ্যাঙ্গেলে দিতে পারেন। আমি যখন পশ্চিম নাখালপাড়া বাইতুল আতীক জামে মসজিদে ইমামত করতাম, সেসময় একজন মুসল্লী আমাকে বলেছিলেন, হুজূর! মনের মধ্যে অনেক সময়ই ওয়াছওয়াছা আসে যে, কবরের আযাব যদি প্রকৃতপক্ষে না-ই থাকে, জাহান্নামের আযাব যদি প্রকৃতপক্ষে না-ই থাকে, জান্নাত যদি প্রকৃতপক্ষে না-ই থাকে, তাহলে ইবাদত-বন্দেগীর পেছনে এত কষ্ট করা তো বেকার যাবে! তাহলে কেন ইবাদত-বন্দেগীর পেছনে

এত কষ্ট করা? আমি তাকে বলেছিলাম, মনের মধ্যে এসব প্রশ্ন এসে থাকে নফ্‌ছ ও শয়তানের পক্ষ হতে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নফ্‌ছের এসব প্রশ্নের জবাবে আপনি কী বলেন? তিনি বলেছিলেন, আমি বলি, এগুলো আছে কি নেই এই সন্দেহে ইবাদত-বন্দেগী করলাম না, কিন্তু যদি থাকে তাহলে কী হবে? (নাউযু বিল্লাহ) যদি এসব না থাকে তাহলে তো ইবাদত-বন্দেগী করায় যা একটু কষ্ট হয়েছে তার বেশি আমার কোন ক্ষতি নেই, আর যৎসামান্য যা কিছু কষ্ট হয়েছে, তার জন্যও কোন দুঃখ হবে না, কারণ তখন তো তোমার কথামত আমরাই থাকব না। জান্নাত জাহান্নামই যদি না থাকে, তাহলে আমরাও তো থাকব না, বিলীন হয়ে যাব, তাহলে দুঃখ করার জন্য আমাদের মনও থাকবে না। কিন্তু যদি জান্নাত জাহান্নাম থাকে আর ইবাদত-বন্দেগী না করে থাকি, তাহলে কী উপায় হবে? তখন তো অনন্তকালের কষ্টে ভুগতে হবে। একথা বলার পর নফ্‌ছ চুপ হয়ে যায়।

আমি বললাম, আপনার বক্তব্যে নফ্‌ছ ও শয়তান চুপ হয়ে যায় বটে, তবে আপনার বক্তব্যে কিন্তু জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব ইত্যাদি ঈমান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে "যদি" কথাটি ব্যবহৃত হয়। আর "যদি" কথাটি সন্দেহ জ্ঞাপক, ঈমানের ক্ষেত্রে যা গর্হিত। এ হিসেবে আপনার কথাটি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে খুব একটা ভাল নয়, তবে সন্দেহ না থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে এমন বলাতে আপত্তি নেই। কারণ, প্রতিপক্ষ নফ্‌ছ ও শয়তানের ওয়াছওয়াছাকে এ পন্থায় হলেও যে প্রতিহত করা যায় সে হিসেবে পন্থাটি বাহ্য দৃষ্টিতে খারাপ নয়। প্রতিপক্ষ (নফ্‌ছ ও শয়তান) বলে, যদি এসব না থাকে তাহলে ... আর আপনি বলেন যদি থাকে তাহলে ... একে বলে প্রতিপক্ষের কথা দিয়ে প্রতিপক্ষকে দমন করা। বাহাছে বিজয়ী হওয়ার এ-ও একটা তরীকা বা কৌশল। আমাদের বাগধারায় বলা হয় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। যাহোক এভাবে বাহাছে বিজয়ী হয়ে থাকেন ভাল কথা। তবে এরূপ ক্ষেত্রে মুখে "যদি" বললেও অন্তরে কিন্তু দ্ব্যর্থহীন বিশ্বাস রাখা চাই যে, জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই রয়েছে। নতুবা হতে পারে ঐ "যদি"-র মধ্য দিয়েই শয়তান ঈমানী বিষয়ে আপনার মধ্যে একটু হলেও সন্দেহের লেশ ঢুকিয়ে দিল বা রেখে দিল। শয়তান অতি ধুরন্ধর শত্রু বিধায় তার ব্যাপারে এমনতর সুক্ষ্মভাবেও সতর্ক থাকা চাই।

www.maktabatulabrar.com

ঐ মুসল্লীর কথিত ভাষায় জবাব দিলেই যে নফ্‌ছ ও শয়তান এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষান্ত হয়ে যাবে তা নাও হতে পারে। এ ব্যাপারে মনের মধ্যে আরও ২টা কমন ওয়াছওয়াছা উত্থাপিত হয়ে থাকে। (১) জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব আসলেই আছে কি? কেউ কি দেখেছে? (২) মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সর্বনিম্ন জান্নাতীকে কমপক্ষে এই দুনিয়ার দশ গুণ পরিমাণ স্থান দেয়া হবে। এত জায়গা কোথায়? নিম্নে এই দুটো বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা পেশ করা গেল।

জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব আসলেই আছে কি?

জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব আসলেই আছে কি? কেউ কি দেখেছে? না দেখে বিশ্বাস করা কি অন্ধ বিশ্বাস নয়? এ ওয়াছওয়াছার জবাব হল- হাঁ আসলেই আছে, কেউ দেখেনি এমন নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন। আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সকলের পক্ষ হতে তাঁকে দেখানো হয়েছে। মেরাজের রাতে তিনি শুধু আল্লাহকে নয়, জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদি যা কিছু আমরা না দেখে বিশ্বাস করি সেসব কিছু তিনি স্ব-চোখে দেখেছেন। এমন একজন দেখে এসে বলেছেন, যাকে দুনিয়ার কেউ মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। ঘোর শত্রু পর্যন্ত যাকে মিথ্যুক বলতে পারেনি। আমাদের মত লক্ষ মানুষকে যদি দেখানো হত, আর আমরা দেখে এসে বলতাম, তবুও মানুষ অস্বীকার করতে পারত যে, হয়তো পরিকল্পিতভাবে আমরা মিথ্যা বলছি। কিন্তু এমন একজনকে দেখানো হয়েছে, যাকে কেউ মিথ্যুক বলতে পারেনি এবং পারবেও না। আমাদের মত লক্ষ কোটি মানুষের দেখার চেয়ে তাঁর একার দেখার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি। তিনি দেখে এসে বলেছেন, অতএব এটাতে বিশ্বাস স্থাপন করা অন্ধ বিশ্বাস হতে পারে না।

জান্নাতে এত জায়গা কোথায়?

যদি ওয়াছওয়াছা হয় সর্বনিম্ন জান্নাতীকে কমপক্ষে এই দুনিয়ার দশ গুণ পরিমাণ স্থান দেয়া হবে। এত জায়গা কোথায়? এ ওয়াছওয়াছার প্রথম জবাব হল এটা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছে এসেছে সর্বশেষে যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তাকে আল্লাহ তাআলা বলবেন,

«اِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا.»

অর্থাৎ, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়ার সমপরিমাণ ও তার দশ গুণ। (মুসলিম: হাদীছ নং ৩০৮)

এ গেল হাদীছের বক্তব্য দিয়ে জবাব। হাদীছের জবাব তো নিশ্চয়ই শয়তান মানবে না। তাহলে দ্বিতীয় জবাব হল বিজ্ঞানীদের বক্তব্য দিয়ে জবাব। বিজ্ঞানীরা বলে, সারা পৃথিবীতে যত বালুকণা আছে তার তুলনায় একটা বালুকণা যত ক্ষুদ্র, মহাবিশ্বের সামনে পৃথিবী তার চেয়েও ক্ষুদ্র। আর বিজ্ঞানীদের ভাষায় যে মহাবিশ্ব জান্নাত তার চেয়েও বড়। তাহলে সর্বনিম্ন জান্নাতীকে দশ দুনিয়া পরিমাণ কেন দশ হাজার দুনিয়া পরিমাণ জায়গা দিলেও জান্নাতের জায়গা ফুরাবে না। বিজ্ঞানীদের আর একটা তথ্য শুনুন। বেশ কিছু বছর পূর্বে বিজ্ঞানীরা একটা নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার করেছিল, যার নাম দিয়েছিল তারা "কোয়াসার"। এটা ছিল তখনকার আবিষ্কৃত সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র। বিজ্ঞানীদের ভাষায় সেটা এক হাজার কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ এতদূরে যে, আলোর গতিতে (প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তথা প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার গতিতে) কোন যানবাহন যদি দুনিয়া থেকে চলা শুরু করে, তাহলে সেই নক্ষত্র পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগবে এক হাজার কোটি বছর। আরও মনে রাখুন কুরআনে কারীমের ভাষ্যমতে প্রথম আসমানকে গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সাজানো হয়েছে। তাহলে এই কোয়াসার নামক নক্ষত্রও প্রথম আসমানের নিচে। তার কত উপরে প্রথম আসমান তা-ও আমাদের জানা নেই। তারপর দ্বিতীয় আসমান, তারপর তৃতীয় আসমান, এভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমান। সপ্তম আসমানের উপরে জান্নাত। তাহলে জান্নাতের এরিয়া যে কত বিশাল বিস্তীর্ণ তা আমাদের কল্পনায়ও আনা সম্ভব নয়। এভাবে চিন্তা করলে মনে হয় সর্বনিম্ন জান্নাতীকে দশ দুনিয়া কেন দশ লক্ষ দুনিয়া পরিমাণ এবং অন্যদেরকে তাদের মর্যাদা অনুপাতে আরও বেশি পরিমাণ দিলেও হয়তো জান্নাতের জায়গা ফুরাবে না। সুবহানাল্লাহ!

নবী, মুজিযা এবং কাশ্‌ফ ও কারামত প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

নবীর কাছে বাস্তবেই ওহী আসত কি?

ওয়াছওয়াছা: নবীর কাছে বাস্তবেই ওহী আসত কি? ওহী আসত তার প্রমাণ কী?

www.maktabatulabrar.com

উত্তর: ওহী না আসলে জ্ঞানের মহাভাণ্ডার এই কুরআন তিনি কীকরে বললেন? তিনি তো জীবনে কোনদিন কারও থেকে কোন বিদ্যা শিক্ষা করেননি। আর সে যুগও এমন ছিল না যে, সব বিষয়ে বইপত্র পাওয়া যেত যা পড়ে নিজের জ্ঞান সমৃদ্ধ করা এবং তা জাহির করা সম্ভব ছিল। তিনি বিশ্বের সামনে যে কুরআন পেশ করেছেন, তা কোন মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। কুরআনে কারীমে চ্যালেঞ্জও দেয়া হয়েছে, যদি তোমরা মনে কর এই কুরআন মুহাম্মাদের রচনা করা তাহলে এরকম পুরো একটা কুরআন নয় বরং এই কুরআনের ছোট্ট একটা সূরার মত রচনা করে দেখাওতো সেটা কুরআনের মানের হয় কি না। এই চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি, যা প্রমাণ করে এই কুরআন মানব-রচিত নয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃকও রচিত নয় বরং এটা ওহীর মাধ্যমেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসেছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যে ওহী আসত, তিনি যে নবী ছিলেন তার প্রমাণ এ ছাড়াও আরও অনেক রয়েছে। উলামায়ে কেরাম এরকম প্রমাণ প্রায় তিন হাজারের মত গণ্য করেছেন। সীরাতের কিতাবাদিতে সেগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

আধুনিক যুগে নবী আসেন না কেন?

ওয়াছওয়াছা: আধুনিক যুগে নবী আসেন না কেন? এই আধুনিক যুগে নবী এলে এবং তিনি আধুনিক মারণাস্ত্রের মোকাবেলায় বিজয়ী হয়ে দেখাতে পারলে আমাদের ঈমান অনেক মজবূত হত।

উত্তর: "আধুনিক যুগ" কথাটার কোন স্টান্ডার্ড পরিচিতি নেই। এটা একটা আপেক্ষিক জিনিস। একই যুগ তার পূর্বের তুলনায় আধুনিক আবার তার পরের তুলনায় সেকেলে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বের লোকেরা মনে করত তাদের যুগ আধুনিক যুগ। অথচ বিজ্ঞানের উন্নতির বিচারে এখন সে যুগকে সেকেলে বলে মনে হয়। আগামী দুই একশ বা পাঁচশ বছর পর হয়তো আমাদের এই যুগকেও চরম সেকেলে মনে করা হবে। তাই আধুনিক যুগের যুক্তিতে এই যুগে নবী পাঠালে সামনেও তো আধুনিক যুগের যুক্তিতে আবারও নবী পাঠাতে হবে। এবং কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে

নবী পাঠানো অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলে আল্লাহ যে চান একজন শাশ্বত নবী পাঠাতে –যার নবুয়তের পূর্ণাঙ্গতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রেক্ষিতে তাঁর নবুয়তকে সর্বব্যাপী ও কেয়ামত তক সব যুগের জন্য ব্যাপক করে দেয়া হবে– তার কী উপায় হবে?

রয়ে গেল আধুনিক মারণাস্ত্রের মোকাবেলা করে দেখালে ঈমান মজবূত হওয়ার বিষয়। এ প্রসঙ্গে কথা হল– আসলে বড় কোন নিদর্শন দেখলেই যে ঈমান মজবূত হবে বা ঈমান আনা ভাগ্যে জুটবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। হাতের ইশারায় চাঁদ দু' টুকরো করে দিতে দেখেও তো বহু লোকের ভাগ্যে ঈমান আনা জুটল না, ঈমান মজবূত হওয়া তো আরও পরের কথা। তখন তো তারা সেটাকে যাদু বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। যদি মেনে নেয়া হয় যে, এখন একজন নবী এসে প্রতিপক্ষের পারমাণিক অস্ত্রের মুখেও বিজয়ী হয়ে গেলেন তাহলে যে সেটারও একটা অপব্যাখ্যা দাঁড় করানো হবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? মনে করুন নবীর মুজিযায় একটা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হল না, তখন তো কেউ সেটাকে মুজিযা না মেনে এমনও অপব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারবে যে, আসলে মোজেযা টোজেযা কিছুই না, ওই বোমাটার হয়তো কারিগরি কোন ত্রুটি ছিল ফলে তা বিস্ফোরিত হয়নি। তাই বলছি মুজিযা দেখেই যদি ঈমানকে মজবূত করতে হয় তাহলে নবীর যুগে যেসব মুজিযা ঘটেছে সেগুলো দেখাই যথেষ্ট। সেগুলো সম্বন্ধে জেনেও যার ঈমান মজবূত হচ্ছে না, তার যে পরবর্তী কোন মুজিযা দেখলে ঈমান মজবূত হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আর আল্লাহরও মানুষের ঈমানের জন্য এত ঠেকা পড়েনি যে, তিনি এতসব মুজিযা দেখানো সত্ত্বেও যারা সেগুলো না মেনে বরং আরও মুজিযার দাবি করতে থাকবে তিনি তাদেরকে তা দেখাতে থাকবেন।

নবী রসূলদের মুজেযা কি ভুয়া

ওয়াছওয়াছা: নবী রসূলদের মুজেযা ভুয়া, যাদুকররাও এমন অলৌকিক অনেক কিছু দেখাতে পারে। মুজিযা ও যাদুর মধ্যে কী পার্থক্য?

উত্তর: অলৌকিক কিছু মানেই মুজিযা নয়। যাদুকররা অলৌকিক যা কিছু দেখায় সেটা মুজিযা নয়। বস্তুত আসবাব বা উপকরণের সহযোগিতায় এবং শয়তানের সহযোগিতা নিয়ে অদ্ভূত যা কিছু দেখানো হয় সেটা হচ্ছে যাদু। যাদুকররা অদ্ভূত যা কিছু দেখায় তা এই শ্রেণীর। পক্ষান্তরে কোন

আসবাব বা উপকরণের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে নবী রসূলগণ থেকে অদ্ভূত যা কিছু প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় মুজিযা। যাদুকররা কখনই মুজিযার সমকক্ষ কিছু দেখাতে সক্ষম নয়। যদি সক্ষম হত তাহলে সেই কুরআন নাযেল হওয়ার যুগেই তো বলা হয়েছিল কুরআন হচ্ছে রসূলের এক জীবন্ত মুজিযা, কেউ কুরআনের সমকক্ষ রচনা করে দেখাতে পারবে না। তাহলে যাদুকররা এখন কুরআনের সমকক্ষ রচনা করে দেখাক। আল্লাহর নবী হযরত সালেহ আলাইহিস মুজিযা দেখিয়েছিলেন পাহাড় ফেটে উটনী বের হয়ে এসেছিল এবং সেটি দীর্ঘদিন যাবত স্বাভাবিক জীবন-যাপন করেছিল। যাদুকররা পারলে এরূপ করে দেখাক তো। যাদুকররা হয়তো এটা সেটা কিছু দিয়ে উটনীর মত একটা কিছু দেখাতে পারবে, কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, সে উটনী কখনই স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হবে না, কারণ সেটা হবে তুকতাক। বুঝা গেল যাদু আর মুজিযার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মূলত যাদু আর মুজিযার মধ্যে রয়েছে বহু পার্থক্য। সীরাত ও আকাঈদের কিতাবে সেগুলো বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। যারা সেগুলো জানে না, তারাই বলে মুজিযা আর যাদুর মধ্যে কী পার্থক্য?

বুযুর্গদের কাশ্‌ফ ও ইলহাম কি ভুয়া

ওয়াছওয়াছা: বুযুর্গদের কাশ্‌ফ ও ইলহাম ভুয়া, পাপীদেরও এটা হতে পারে।

উত্তর: পাপীদেরও যখন হতে পারে বলা হচ্ছে তাহলে তো বুঝা গেল এর অস্তিত্ব আছে, সমূলেই তো ভুয়া নয়। যার থেকে কাশফ বা ইলহাম হচ্ছে তিনি যদি বুযুর্গ হন তাহলেই তো সেটাকে আমরা কাশ্‌ফ ও ইলহাম বলি, আর বুযুর্গ না হলে সেটাকে আমরা কাশ্‌ফ ও ইলহাম বলি না। যারা বুযুর্গ নয় এমনকি মুসলমানও নয়, আত্মিক সাধনার মাধ্যমে –হোক তা গলত সাধনা– তাদের কাছেও অদৃশ্য জগতের অনেক কিছু বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

এখন বুযুর্গদের কারামত দেখা যায় না কেন?

ওয়াছওয়াছা: এখন বুযুর্গদের থেকে কারামতের প্রকাশ ঘটে না কেন? জোনায়েদ বাগদাদী, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম প্রমুখ অতীতের বুযুর্গদের

www.maktabatulabrar.com

কত কারামাত বর্ণনা করা হয়, এখন বুযুর্গদের থেকে সে জাতীয় করামাত প্রকাশ পায় না কেন, তাহলে তো সেগুলো দেখে মানুষ ঈমানকে মজবূত করতে পারত?

উত্তর: এখন বুযুর্গদের থেকে কারামত একেবারেই দেখা যায় না এ কথা ঠিক নয়। যারা বুযুর্গদের সঙ্গে ওঠাবসা করেন তারা কমবেশ কারামতের প্রকাশ এখনও দেখতে পান। তবে হাঁ কারামত প্রকাশের হার ও মাত্রা আগের চেয়ে কমে গেছে। কারণ কারামত প্রকাশ করা হত যে প্রয়োজনে সে প্রয়োজন আর অবশিষ্ট থাকেনি। বস্তুত মানুষের ঈমান মজবূত করানোর জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন বুযুর্গের মাধ্যমে অলৌকিক অনেক কিছু তথা অনেক কারামত-এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তারপর এক সময় আল্লাহ দেখলেন এ পর্যন্ত এতসব কারামতের প্রকাশ ঘটেছে যা ঈমানকে মজবূত করার জন্য যথেষ্ট। তাহলে এখন আর কারামত ঘটানোর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। তাই তখন থেকে বুযুর্গদের মাধ্যমে কারামতের প্রকাশ ঘটা কমে গেছে। আল্লাহর তো মানুষের ঈমানের জন্য এত ঠেকা পড়েনি যে, তিনি এতসব কারামতের প্রকাশ ঘটানো সত্ত্বেও সেগুলো সম্বন্ধে জেনেও মানুষ ঈমানকে মজবূত করবে না বরং আরও কারামতের অপেক্ষায় থাকবে আর আল্লাহ তার প্রকাশ ঘটিয়েই যেতে থাকবেন।

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব নিয়ে ওয়াছওয়াছা

ওয়াছওয়াছা: ফেরেশতা আছে কি? ফেরেশতা আছে তার প্রমাণ কি?

উত্তর: ফেরেশতা আছে তার শত শত প্রমাণ রয়েছে। কয়েকটা প্রমাণ লক্ষ করুন।

- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরেশতাদের দেখেছেন। মেরাজের রাতে তিনি অসংখ্য ফেরেশতা দেখেছেন। পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাসহ অনেক ফেরেশতা দেখেছেন। অসংখ্যবার তিনি হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে দেখেছেন। দুইবার তাঁকে তাঁর আসল রূপেও দেখেছেন। একবার দুনিয়াতে, আরেকবার মেরাজের রাতে সপ্তম আসমানে সিদরাতুল মুনতাহা-র কাছে। এ মর্মে কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى.﴾

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, সে তাকে আরও একবার দেখেছে, সিদরাতুল মুনতাহার কাছে, যার নিকটে জান্নাতুল মাওয়া। (সূরা নাজ্‌ম: ১৪-১৫)

যদি শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই ফেরেশতাদের দেখে থাকতেন, তাহলে তার একার দেখাই ফেরেশতাদের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপরও তিনি শুধু একা নন, সাহাবায়ে কেরামও ফেরেশতাদের দেখেছেন। বুযুর্গানে দ্বীনের অনেকের থেকেও ফেরেশতাদের দেখার ঘটনা বর্ণিত আছে। এরূপ কয়েকটি ঘটনা:

- "হাদীছে জিব্রীল" নামক প্রসিদ্ধ হাদীছ যা বোখারী মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে, উক্ত হাদীছে এসেছে- একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন লোক এলেন। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ধবধবে সাদা, চুল কুচকুচে কাল, অর্থাৎ মনে হচ্ছিল লোকটি বেশ পরিপাটি, অন্য কোন স্থান থেকে সফর করে আসেননি। সফর করে এলে তো তার পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে ময়লাযুক্ত, চুল থাকবে ধুলোবালি মাখা উস্কু-খুস্কু। তাহলে লোকটি স্থানীয় হওয়ার কথা, অথচ সাহাবায়ে কেরাম কেউ তাকে চিনছিলেন না। এ কারণে লোকটির প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ওৎসুক্য জেগেছিল কে ইনি? লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, কেয়ামতের আলামত সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছিলেন। অবশেষে লোকটি মজলিস থেকে উঠে গেলেন। তার মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পরপরই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, দেখতো লোকটি কোথায় গেল? তাকে ফিরিয়ে আন। সাহাবায়ে কেরাম তার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়লেন, কিন্তু লোকটির কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইনি হলেন হযরত জিব্রাঈল (আ.), মানুষকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি এসেছিলেন। এ হাদীছে স্পষ্টত সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক ফেরেশতা দেখা বর্ণিত হয়েছে।

- সাহাবায়ে কেরাম বদর যুদ্ধে পাগড়ি পরিহিত ফেরেশতাদের দেখেছেন, যারা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে তারা বদর যুদ্ধে দেখেছেন শত্রু সেনার কল্লা কেটে পড়ে যাচ্ছে অথচ কোন মুসলমান যোদ্ধাকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না। হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর বাহনের নাম ছিল "হাইযূম"। বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম আওয়াজ শুনেছেন উক্‌দুম হাইযূম উক্‌দুম হাইযূম (অর্থাৎ, হাইযূম আগে বাড়, হাইযূম আগে বাড়।) এভাবে সাহাবায়ে কেরাম বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের উপস্থিতির বিভিন্নভাবে প্রমাণ পেয়েছেন, কেউ কেউ দেখেছেনও। সীরাত ও মাগাযী-র কিতাবে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রয়েছে।
- উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়াও সাহাবীসহ বুযুর্গানে দ্বীনের অনেকের থেকেও ফেরেশতাদের দেখার আরও বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। নিম্নে এরূপ কয়েকটা ঘটনা বর্ণনা করছি।

ফেরেশতা দেখার আরও কয়েকটা ঘটনা

পূর্বে ফেরেশতাদের দেখার কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হল।

- আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া গ্রন্থের টীকায় সনদ সহকারে সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) একবার তায়েফে একজন লোক থেকে একটা গাধা এই শর্তে ভাড়া নিলেন যে, তিনি যেখানে চান গাধাওয়ালা সেখানে তাকে পৌঁছে দিবেন। গাধাওয়ালা গাধাটাকে হাঁকাতে হাঁকাতে একটা নির্জন স্থানে নিয়ে গেল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) দেখলেন সেখানে প্রচুর মৃতদেহ পড়ে আছে। সেখানে পৌঁছে গাধাওয়ালা হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)কে হত্যা করতে উদ্যত হল। তখন হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) তাকে বললেন, আমাকে দুই রাকআত নামায পড়ার সুযোগ দাও। সে বলল, ঠিক আছে দুই রাকআত নামায পড়ে নাও। এই যাদের মৃতদেহ পড়ে আছে দেখছ, তারাও সবাই নামায পড়েছিল, কিন্তু নামায তাদের কিছুই উপকারে আসেনি। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) বলেন, আমি দুই রাকআত নামায পড়লাম। তারপর

লোকটা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। তখন আমি বললাম, ইয়া আরহামার রাহিমীন! (অর্থাৎ, হে সবচেয়ে বড় দয়ালু!) তখন অদৃশ্য থেকে একজন কেউ চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, "লা তাক্‌তুলহু" (অর্থাৎ, তাকে হত্যা করো না।) আওয়াজ শুনে লোকটা ভয় পেয়ে গেল এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। তখন আমি আবার বললাম, ইয়া আরহামার রাহিমীন! তখন আবার সে ঐ আওয়াজ শুনতে পেল "লা তাক্‌তুলহু" (অর্থাৎ, তাকে হত্যা করো না।) সে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। আমি বললাম, ইয়া আরহামার রাহিমীন! তখন আমি দেখতে পেলাম একজন ঘোড়সওয়ার তার ঘোড়ার উপর আরোহিত অবস্থায় উপস্থিত। তার হাতে আছে একটা বল্লম, যার মাথায় আগুনের শিখা। সে ঐ বল্লম দিয়ে লোকটাকে আঘাত করল। বল্লম লোকটার শরীর ভেদ করে পার হয়ে গেল। লোকটা মরে লুটিয়ে পড়ল। (এ ছিল একজন ফেরেশতা।) তখন সে বলল, তুমি যখন প্রথমবার (ইয়া আরহামার রাহিমীন বলে) ডেকেছ তখন আমি সপ্তম আসমানে ছিলাম। যখন দ্বিতীয়বার ডেকেছ তখন আমি প্রথম আসমানে ছিলাম। আর যখন তৃতীয়বার ডেকেছ তখন আমি তোমার নিকট এসে পৌঁছেছি।

- মানুষ কর্তৃক ফেরেশতা দেখার আর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (হাদীছ নং ১৯৯৪৮) ও বাইহাকী কৃত শুআবুল ঈমান (হাদীছ নং ১০৪৫৩)য়ে। ঘটনাটি হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) তার "আল-হাবাইক ফী আখ্‌বারিল মালাইক" কিতাবেও বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ: হযরত ইকরমা ইবনে খালেদ (রহ.) বর্ণনা করেন- একজন আবেদ (বড় ইবাদতগোযার) ব্যক্তি ছিলেন। তাকে ধ্বংস করার জন্য এক শয়তান তার কাছে এল। কিন্তু তিনি আরও বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হলেন। তখন শয়তান তার কাছে একজন মানুষের রূপ ধরে এল এবং বলল, আমি আপনার সুহবতে থাকতে চাই। আবেদ লোকটি তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। উক্ত শয়তান এভাবে তার কাছে অবস্থান করতে থাকল, তাকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ খুঁজতে থাকল, তার আশেপাশে ঘুরাঘুরি করতে থাকল। তখন আল্লাহ তাআলা (ঐ আবেদকে) হেফাজত করার জন্য তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ

www.maktabatulabrar.com

করলেন, যাকে শয়তান তো চিনতে পেরেছিল কিন্তু ঐ আবেদ চিনতে পারেননি। তারপর সন্ধাবেলায় যখন শয়তান তাকে ছিল, উক্ত ফেরেশতা তখন তার দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে হত্যা করে দিল। তখন আবেদ (ঐ ফেরেশতাকে) বললেন, এরূপ ঘটনা আমি জীবনে দেখিনি, তুমি তাকে হত্যা করে দিলে? (নিহত) লোকটি তো এই এই অবস্থায় ছিল। তারপর তারা (ফেরেশতা ও আবেদ) উভয়ে একদিকে রওয়ানা দিল। একটা বস্তীতে তারা উপনীত হল। বস্তীর লোকেরা তাদেরকে স্থান দিল, তাদেরকে আপ্যায়ন করল। ফেরেশতা তাদের একটা রূপার পাত্র তুলে নিল এবং সেখান থেকে তারা রওয়ানা দিয়ে আর একটা বস্তীতে পৌঁছাল। এই বস্তীর লোকেরা তাদেরকে বসার জায়গাও দিল না, আপ্যায়নও করল না। তখন ফেরেশতা উক্ত রূপার পাত্রটি তাদের দিয়ে দিল। তখন আবেদ লোকটি তাকে বললেন, যারা আমাদের মেহমানদারী করল তাদের পাত্র নিয়ে নিলে আর যারা আমাদের মেহমানদারী করল না তাদেরকে সেই পাত্র দিয়ে দিলে? তুমি মোটেই আমার সাহচর্যে থাকতে পারবে না। তখন উক্ত ফেরেশতা বলল, ঐই যাকে আমি হত্যা করেছি ও ছিল এক শয়তান (শয়তানের বাহিনীর একজন), ও তোমাকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। আর যাদের পাত্র নিয়ে নিয়েছি তারা হল নেককার লোক, তাদের জন্য রূপা (–এর পাত্র রাখা ও ব্যবহার করা) জায়েয ছিল না। পক্ষান্তরে এরা (যাদেরকে ঐ পাত্রটা দিয়েছি তারা) ফাসেক লোক। এরাই ঐ পাত্রের বেশি হকদার। বর্ণনাকারী হযরত ইকরামা ইবনে খালেদ (রহ.) বলেন, তারপর ঐ ফেরেশতা আসমানের দিকে উঠে গেল আর আবেদ লোকটি তা দেখতে থাকলেন। (তখন ঐ আবেদ লোকটি বুঝতে পারলেন এ ছিল আল্লাহ তাআলার প্রেরিত একজন ফেরেশতা, আমাকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহ তাআলা যাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।)

● এবার একটি ঘটনা শুনুন, যে ঘটনায় মানুষ ফেরেশতার আওয়াজ শুনেছে। মুসনাদে আহমদে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা হাইছামী “মাজমাউয যাওয়াইদ” গ্রন্থে বলেছেন, রেওয়ায়েতটির একজন বর্ণনাকারীর নাম জানা যায় না, বাকি সকলেই ছেকা তথা গ্রহণযোগ্য। ঘটনাটি এরূপ: একদিন হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন,

www.maktabatulabrar.com

ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি নামায পড়ছিলাম, তখন (অদৃশ্য থেকে) একজন লোককে নিম্নোক্ত দুআ পড়তে শুনলাম–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ ، إِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ، فَأَهْلٌ أَنْ تُحْمَدَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جَمِيْعَ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِيْ ، وَاعْصِمْنِي فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِيْ، وَارْزُقْنِيْ عَمَلًا زَاكِيًا تَرْضَى بِهِ عَنِّيْ.

তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন একজন ফেরেশতা, যিনি তোমাদেরকে প্রতিপালকের প্রশংসা শেখানোর জন্য এসেছিলেন।

ওয়াছওয়াছা: বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতারা এসে থাকলে এই যুগে অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতারা আসে না কেন?

উত্তর: বদরের যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছে এই যুগেও তা ঘটতে হবে এমন তো কোন আবশ্যকতা নেই। যুদ্ধের অঙ্গনে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার শর্তাবলী পূরণ হলে আল্লাহ সাহায্য করবেন, তা সেই সাহায্য ফেরেশতা পাঠানোর মাধ্যমেও হতে পারে, ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াও হতে পারে। আল্লাহর তো সাহায্যের জন্য ফেরেশতার মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। তিনি তো যেকোনো কিছুর উদ্দেশে ‘হয়ে যা’ বললেই তা হয়ে যায়। রয়ে গেল বদর যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের বিষয়, তা বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, তদুপরি নিরস্ত্র একদল মুসলমানের সশস্ত্র তিনগুণ কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তখন মানুষের ঈমান মজবূত করার জন্য এবং জাহিরী আসবাব দেখলে যেহেতু মনের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় তাই ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদের মনের প্রশান্তির আয়োজন করা হয়েছিল। এখনকার পেক্ষাপটে এ প্রয়োজন নেই। তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে এই যুগেও তিনি ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু তাকে ফেরেশতা পাঠিয়েই আমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে তার জন্য তিনি কোনোভাবেই ঠেকা নন।

জিনদের অস্তিত্ব নিয়ে ওয়াছওয়াছা

এতক্ষণ ফেরেশতা আছে তার প্রমাণাদি পেশ করা হল। ফেরেশতাদের যেমন না দেখে আমরা বিশ্বাস করি, তদ্রূপ জিন জাতিকেও আমরা না দেখে বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে অনেক সময় আমাদের ওয়াছওয়াছা জাগে, আসলে জিন আছে কি? জিন আছে তার প্রমাণ কি?

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা হল– কুরআন হাদীছে জিনদের কথা আছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। রয়ে গেল আমরা যে দেখিনি? এই সন্দেহের নিরসন হল আমরা সকলে না দেখলেও কেউই দেখেনি তা তো নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছেন, অনেক সাহাবী দেখেছেন, বহু মনীষীও দেখেছেন। এবার জিন দেখার কিছু কাহিনী শুনুন।

জিন দেখার কয়েকটা ঘটনা

● জিনদের সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুবার সাক্ষাত হয়েছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ একটা ঘটনা নিম্নরূপ। ঘটনাটা তাবারানী কাবীরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অন্য অনেক হাদীছের কিতাবে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হিজরতের পূর্বের কথা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মক্কার এক প্রান্তে বের হয়েছিলেন। আমি সঙ্গে ছিলাম। মক্কার উঁচু এলাকায় আমরা পৌছলাম। সেখানে তিনি একটা জায়গায় কদম মুবারক দিয়ে দাগ টেনে আমাকে তার মধ্যে থাকতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত এখান থেকে বের হবে না, কোন কিছু দেখে ভীত হবে না। এই বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুদূর সামনে গিয়ে বসে পড়লেন। তখন দেখলাম হাবশীদের মত কাল গোছের বহু লোক পাহাড়ের চূড়া থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নেমে আসছে। আমার ইচ্ছা হয়েছিল আমি গিয়ে সাধ্যমত তাদেরকে প্রতিহত করি। তলোয়ার উঁচু করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্ধার করার নিয়ত করলাম। কিন্তু পরক্ষণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করে থেমে গেলাম। কিছুক্ষণ পর লোকগুলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমি তাদেরকে বলতে শুনলাম,

www.maktabatulabrar.com

ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি, আমরা চলে যাচ্ছি, আমাদেরকে খাদ্য-পাথেয় দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যত হাড়ের কাছে যাবে তার উপর গোসত পাবে, আর যত গোবরের কাছে যাবে সেগুলো তোমাদের জন্য খেজুরে পরিণত হবে।[১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তাদের চলে যাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এলেন, ফজরের নামাযে ইমামত করলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নির্দেশমত সেভাবে ছিলে তো? আমি বললাম, আপনি না আসা পর্যন্ত এক মাস হয়ে গেলেও সেভাবেই থাকতাম। তারপর আমি যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম তা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনালাম। তখন তিনি বললেন, তুমি ঐ জায়গা থেকে বের হয়ে গেলে কেয়ামত পর্যন্ত তোমার আমার মধ্যে আর সাক্ষাত ঘটত না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওরা কারা? তিনি বললেন, ওরা নসীবাইন[২] এলাকার জিন।

● আল্লামা বদরুদ্দীন শিব্লী জিনবিষয়ক সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ "আকামুল মারজান"য়ে সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে মানুষের সঙ্গেও লড়াই করেছি, জিনের সঙ্গেও লড়াই করেছি। জিজ্ঞাসা করা হল কীভাবে আপনি মানুষ ও জিনের সঙ্গে লড়াই করলেন? তিনি বললেন, আমরা এক সফরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে এক স্থানে অবস্থান নেয়া হল। আমি পানির মশক ও বালতি নিয়ে পানি সংগ্রহে বের হব এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাবধান পানি সংগ্রহে তোমাকে একজন বাধা দিবে! তারপর যখন কুয়ার কাছে গিয়েছি, একজন কাল কুচকুচে লোক এসে বলল, আল্লাহর কসম এক বালতি পানিও তোমাকে নিতে দিব না।

১। অন্য আরও কিছু রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে মুহাদ্দিছীনে কেরামের অনেকে বলেছেন, হাড়ের উপর তারা মাংস পায়, আর এটা হয় তাদের (জিনদের) নিজেদের জন্য খাবার। পক্ষান্তরে গোবর পেলে সেটা হয় তাদের প্রাণীদের জন্য খাবার। যেমন এক রেওয়ায়েতে এসেছে– كل بعرة علف لدوابكم অর্থাৎ, সব লেদা হচ্ছে তোমাদের প্রাণীদের খাবার।

২। "নসীবাইন" দাজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী জাযীরা নামক বৃহৎ এলাকার অন্তর্গত একটি জনপদ।

তখন সেও আমাকে ধরল আমিও তাকে ধরলাম। আমি তাকে আছড়ে ফেলে দিলাম। তারপর একটা পাথর নিয়ে তার মুখ ও নাক ভেঙ্গে দিলাম। তারপর মশক ভরে পানি নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পানির নিকট কেউ তোমার কাছে এসেছিল? আমি বললাম, হাঁ। তারপর আমি ঘটনার বিবরণ শোনালাম। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ও ছিল এক জিন শয়তান।

● আল্লামা সুয়ূতী "লুক্বাতুল মারজান" গ্রন্থে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন– আবূ আইয়ূব ইয়াহইয়া ইবনে ছাবেত বলেন, আমি হাফ্স আত-তাইফীর সঙ্গে মিনায় ছিলাম। তখন সাদা চুল দাড়িওয়ালা একজন শায়খ বয়ান করছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে ফতওয়া দিচ্ছিলেন। তখন হাফ্স আমাকে বললেন, আবূ আইয়ূব! জান এই শায়খ কে? ও হচ্ছে একজন জিন। তারপর হাফ্স তার দিকে এগুলেন, আমিও এগোলাম। হাফ্সকে দেখেই সে তার জুতো তুলে নিয়ে ভাগতে শুরু করল। লোকজন তার পিছে পিছে দৌড়াচ্ছিল আর বলছিল, হে লোকেরা! তোমরা দেখ এই যে জিন।

● আল্লামা সুয়ূতী উক্ত গ্রন্থে আরও একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন এরূপ– ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা বলেন, তার গোত্রের একটা লোক ইশার নামায পড়তে বের হন তারপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তার স্ত্রী হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা জানালে তিনি তাকে চার বছর পর্যন্ত স্বামীর অপেক্ষায় থাকতে বলেন। মহিলাটি চার বছর পর্যন্ত স্বামীর অপেক্ষায় থাকল। তারপরও স্বামীর কোন খোঁজ না পাওয়ায় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাকে অন্যত্র বিয়ে বসার অনুমতি দিলেন। তারপর তার সাবেক স্বামী ফিরে এল। লোকেরা তাকে হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেল। তখন হযরত ওমর (রা.) তাকে বললেন, এত দীর্ঘ সময় কেউ তার পরিবার থেকে এমন লা-পাত্তা থাকে যে, তার পরিবার জানতে না পারে সে আদৌ বেঁচে আছে কি না? লোকটি বলল, হযরত! আমার যে ওজর আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কী ওজর? সে বলল, আমি ইশার

www.maktabatulabrar.com

নামায পড়তে বের হয়েছিলাম, এক জিন আমাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। আমি তাদের মধ্যে বহুদিন অবস্থান করতে থাকি। তারপর একদল মুমিন জিনদের সাথে ঐ জিনদের লড়াই বাঁধে। মুমিন জিনরা ওদের উপর বিজয়ী হয়ে ওদের অনেককে বন্দী করে নিয়ে যায়। সেই বন্দীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার ধর্ম কী? আমি বলি, আমি মুসলমান। তখন তারা বলে, তুমি আমাদের ধর্মের লোক, তোমাকে বন্দী রাখা তো আমাদের জন্য বৈধ নয়। তারা আমাকে স্বাধীনতা দেয় হয় তাদের মধ্যে থাকব কিংবা ফিরে আসব। আমি ফিরে আসাকে নির্বাচন করি। তারপর তারা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। ...।

● আমাদের নিকট অতীতের বুযুর্গানে দ্বীনেরও জিন দেখার বহু ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) তার মুরব্বী ও শায়খ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)–এর জিন দেখার একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, সাহারানপুরে একটা বাড়ি ছিল, ভয়াবহ এক জিনের কারণে সে বাড়িতে কেউ বাস করার সাহস পেত না। বাড়িটা বিরাণ হয়ে পড়েছিল। একবার হযরত হাজী সাহেব সাহারানপুরে গেলে সেই বাড়ির মালিক হযরত হাজী সাহেবকে দাওয়াত দিয়ে সেই বাড়িতে থাকতে দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল হাজী সাহেবের ওছীলায় হয়তো বাড়িটা জিনমুক্ত হয়ে যাবে। হাজী সাহেব সেই বাড়িতে রাত্র যাপন করছিলেন। তাহাজ্জুদের জন্য তিনি উঠেছেন তখন একজন লোক সামনে এসে হযরত হাজী সাহেবকে সালাম দিল। হযরত হাজী সাহেব সালামের জবাব দিলেন এবং ভাবলেন এই ঘরে তো আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না, দরোজার খিলও যথারীতি লাগানো ছিল, তাহলে এই লোকটা কে? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? সে জওয়াব দিল, আমি সেই জিন যার কারণে এই বাড়িটা জনশূন্য হয়ে আছে। হযরত! আমি দীর্ঘদিন যাবত আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছি। হযরত হাজী সাহেব বললেন, আমাকে মহব্বত করার দাবি আবার মানুষকে কষ্ট দেয়া! তুমি তাওবা কর। সে তাওবা করতে রাজি হল। হযরত তাকে তাওবা করালেন। তারপর তাকে বললেন, সামনে হাফেজ সাহেব (হাফেজ জামেন সাহেব) আছেন তার সঙ্গেও সাক্ষাত করেছ কি? জিনটা তখন জওবাব দিল হযরত! উনি খুব

কঠোর মেজাযের মানুষ, তাই উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সাহস পাই না। (সূত্রঃ পছন্দীদাহ ওয়াক্বিয়াত)

জিন টের পাওয়ার কয়েকটা ঘটনা

বিশ্বস্ত সূত্রে জিন দেখার যেমন বহু ঘটনা বর্ণিত আছে, তেমনি বিশ্বস্ত সূত্রে জিনদের আওয়াজ শোনা, জিনদের উপস্থিতি অনুভব করা ইত্যাদিরও বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যা দ্বারা জিন আছে বলে টের পাওয়া যায়। এরূপ কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা গেল।

• নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ উসদুল গাবা, আল-বিদায়া ওয়ান্নিহা, আল-ইস্তীআব, আল-মুনতাজাম ফী তারিখিল মুলূকি ওয়াল উমাম প্রভৃতি কিতাবে মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) এর মৃত্যু পরবর্তী জিনদের আওয়াজ শোনার একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) শামে যেয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তার মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যু কীভাবে ঘটে তা বাহ্যিকভাবে কেউ উপলব্ধি করেনি। ঐতিহাসিক ইবনে আব্দুল বার্‌ প্রমুখ বলেছেন, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, তাকে গোসলখানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার শরীর সবুজ হয়ে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর শহরে অদৃশ্য থেকে লোকেরা আওয়াজ শুনতে পায়–

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده + رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده

অর্থাৎ, খাযরাজ-নেতা সা'দ ইবনে উবাদাকে আমরা হত্যা করেছি। তার প্রতি এক তীর নিক্ষেপ করেছি, যা তার কলিজা ভেদ করতে ভুল করেনি।

সবাই বুঝতে পারে এটা ছিল জিনদের আওয়াজ। জিনরাই তাকে হত্যা করে।[১]

১। অনুমান করা হয় হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)কে হত্যা করার কারণ ছিল তিনি গোসলখানায় কোন গর্তে পেশাব করেছিলেন যাতে জিন বাস করত, কিংবা গোসলখানায় দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন (ওজরবশত এরূপ করা যেতে পারে) যে পেশাব জিনদের গায়ে লেগেছিল, এরই ফলে আক্রোশে তারা তাকে হত্যা করে। উসদুল গাবা ও আল-মুনতাজাম–এর বর্ণনা থেকে এরূপ অনুমান সম্বন্ধে জানা যায়।

www.maktabatulabrar.com

• আল্লামা সুয়ূতী "লুকাতুল মারজান" গ্রন্থে একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন এরূপ– বায়হাকী আবূ মা'ন আনসারীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আবূ মা'ন আনসারী বলেন, আমরা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সঙ্গে মক্কায় যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে জনশূন্য এক প্রান্তরে উপনীত হলাম। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয একটা মৃত সাপ দেখতে পেয়ে বললেন, মাটি খোড়ার কোন যন্ত্র দাও তো। সবাই বলল, হযরত আপনার কিছু করতে হবে না, আমরাই দেখছি। তিনি বললেন, না আমিই করছি। তিনি মাটি খোড়ার যন্ত্র নিয়ে নিজেই মাটি খুড়লেন। তারপর সাপটিকে এক খণ্ড কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করলেন। তখন অদৃশ্য থেকে কেউ একজন –যাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না– বলল, হে সুররাক! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অবশ্যই আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "হে সুররাক! তুমি এক জনশূন্য প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করবে আর তোমাকে দাফন করবে আমার উম্মতের এক উত্তম ব্যক্তি।" তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) ঐ অদৃশ্যের লোকটিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন –আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন– তুমি কে? সে বলল, আমি হলাম একজন জিন, আর এই মৃত হল সুররাক। সে আর আমি ব্যতীত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর হাতে বায়আত করেছিল এমন কেউ আর বাকি নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অবশ্যই আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "হে সুররাক! তুমি এক জনশূন্য প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করবে আর তোমাকে দাফন করবে আমার উম্মতের এক উত্তম ব্যক্তি।"

তাকদীর প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

তাকদীর নিয়ে অনেক ওয়াছওয়াছাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তাকদীরের অনেক দিক নিয়েই মনের মধ্যে ওয়াছওয়াছা জাগ্রত হয়ে থাকে। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা ওয়াছওয়াছা ও তার জওয়াব নিম্নে প্রদান করা গেল।

ওয়াছওয়াছাঃ তাকদীরের বিশ্বাস এক অন্ধ বিশ্বাস, এটা যুক্তিহীন। তাকদীর বলে কিছু নেই। মানুষই নিজেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে।

জবাবঃ সব বিশ্বাসই অন্ধ বিশ্বাস। চাক্ষুস বিশ্বাস আবার কিসের বিশ্বাস?

বিশ্বাস তো না দেখেই হয়, আর না দেখে যা বিশ্বাস তা-ই তো অন্ধ-বিশ্বাস। অতএব সব বিশ্বাসই অন্ধ বিশ্বাস। রয়ে গেল তাকদীরে বিশ্বাস যুক্তিহীন বিশ্বাস কি না। তাহলে শুনুন যে বিষয়টা হাতে নাতে পরীক্ষিত তার আবার যুক্তির কী প্রয়োজন? তাকদীরের বিষয়টা তো এমন যে, প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্ত আমরা হাতে নাতে তার প্রমাণ পাই। অতএব তাকদীরে বিশ্বাসের জন্য যুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। যার যুক্তির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তার পশ্চাতে কোন যুক্তি থাকে না সে ক্ষেত্রে যুক্তিহীন শব্দটা প্রযোজ্য হয়। কিন্তু হাতে নাতে প্রমাণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কেউ যুক্তিহীন কথাটার প্রয়োগ করে না। খাদ্য-খাবার খেলে পেট ভরে তা হাতে নাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে কেউ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ দিতে যায় না যে, খাদ্য-খাবার খেলে পেট ভরে– তার যুক্তি এই ...। যাহোক এখন শুনুন কীভাবে আমরা হাতে নাতে তাকদীরের প্রমাণ পাই তার ব্যাখ্যা। এক্ষেত্রে আমি পাঁচটা বিষয় তুলে ধরব যা দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, প্রতিনিয়তই আমরা তাকদীরের বাস্তবতা হাতে নাতে উপলব্ধি করি। সেই সাথে এটাও প্রমাণিত হবে যে, তাকদীর তথা ভাগ্য আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। বিষয়গুলো হচ্ছে–

১. অনেকেই তো কোটি কোটি টাকার মালিক হতে চায়, গাড়ি বাড়ির মালিক হতে চায়। তার মধ্যে যে লেখাপড়া বা চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা কিংবা যে পথ অবলম্বন করা দ্বারা কেউ কেউ কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে, গাড়ি বাড়ির মালিক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক একই লেখাপড়া ও চেষ্টা-চরিত্র করেও, একই পথ অবলম্বন করেও তো অন্য অনেকে তা হতে পারছে না। কেন পারছে না। এতে স্পষ্ট হয় যে, শুধু লেখাপড়া ও চেষ্টা-চরিত্র দ্বারাই হয় না, তাকদীরের তথা ভাগ্যেরও একটা বিষয় রয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়তই আমরা তাকদীরের বাস্তবতা উপলব্ধি করে যাচ্ছি এবং প্রতিনিয়তই আমরা প্রমাণ পাচ্ছি তাকদীর তথা ভাগ্য আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়।

২. একাধিক ব্যক্তি একই আবহাওয়ায় একই ধরনের রোগজীবাণুর সমান বিস্তারময়তায় জীবন কাটাচ্ছে, সকলের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও সমান। তারপরও কেউ সেই আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায়

www.maktabatulabrar.com

রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, কেউ রোগজীবাণুর কবলে আক্রান্ত হচ্ছে কেউ হচ্ছে না। হয়তো দেখা যাবে যার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি সে-ই আক্রান্ত হয়ে পড়ছে, পক্ষান্তরে যার শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম সে দিব্যি সুস্থ চলাচল করছে। তাহলে এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, যার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কম সে আক্রান্ত হচ্ছে। বুঝা গেল শুধু বাহ্যিক কার্যকারণের ভিত্তিতেই সবকিছু হয় না। বরং পশ্চাতে তাকদীর তথা ভাগ্যেরও একটা বিষয় রয়েছে। এভাবেও আমরা প্রতিনিয়ত তাকদীর তথা ভাগ্যের বাস্তবতা উপলব্ধি করে যাচ্ছি এবং প্রতিনিয়তই আমরা প্রমাণ পাচ্ছি তাকদীর তথা ভাগ্য আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়।

৩. আবার দেখুন একাধিক ব্যক্তি একই রোগের জন্য একই ওষুধ সেবন করছে, একই কোম্পানীর একই ব্যাচের ওষুধ সেবন করছে, (যাতে একেক জনের ওষুধ একেক মানের হওয়ার প্রশ্ন না ওঠে।) তারপরও কারও রোগ ভাল হচ্ছে কারও রোগ ভাল হচ্ছে না। বুঝা গেল ওষুধেই সবকিছু হয় না, এর পেছনে তাকদীর তথা ভাগ্যেরও একটা বিষয় রয়েছে। এভাবেও প্রতিনিয়ত আমরা তাকদীরের বাস্তবতা উপলব্ধি করে যাচ্ছি এবং প্রতিনিয়তই আমরা প্রমাণ পাচ্ছি তাকদীর তথা ভাগ্য আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়।

৪. দেখা যায় একই পথ ধরে একজন মানুষ সুখী হয়ে উঠতে পারছে, কিন্তু আরও অনেকে হুবহু সেপথ ধরেও সুখী হতে পারছে না। বুঝা গেল তাকদীর তথা ভাগ্য বলেও একটা বিষয় রয়েছে। যদি মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তাহলে কেউ অসুখী থাকত না, সবাই তো সুখী হতে চায়, অসুখী তো কেউই হতে চায় না। কিন্তু সবাই সুখী হতে চেয়েও যখন তা হতে পারছে না, তখন স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে মানুষের ভাগ্য তার নিয়ন্ত্রণে নয়।

৫. যদি মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তাহলে আর কিছু না হোক অন্তত মরত না কেউই। কারণ মৃত্যুকে কেউই পারতপক্ষে বেছে নেয় না। তা সত্ত্বেও যখন সকলকে মরতেই হয়, তখন প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষ নিজে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

ওয়াছওয়াছা: তাকদীর তথা ভাগ্যে যখন সবকিছু লেখা আছে তখন আমল করার জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজন কী? ভাগ্যে লেখা থাকলে তো চেষ্টাও আমার দ্বারা হবেই। আর ভাগ্যে লেখা না থাকলে তো চেষ্টাও হবে না, যদি মেনে নিলাম চেষ্টা হবে তাহলে সেই চেষ্টা দ্বারা আমল হবে না, কারণ সে আমল যে আমার ভাগ্যে লেখা নেই।

জবাব: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবুন দেখবেন এ প্রশ্নের কত সুন্দর ও সার্বিক উত্তর তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

«اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.» (البخاري ٤٩٤٩، ومسلم ٢٦٤٦)

অর্থাৎ, তোমরা আমল করতে থাক, যে উদ্দেশ্যে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অনুকূল কাজের তাওফীক তাকে দেয়া হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই এর মধ্যে বিশেষ চারটা মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। যথা:

১. ভাগ্যে কী লেখা আছে না আছে সেই চিন্তাকে আমলের জন্য অন্তরায় মনে না করা বরং যা-ই লেখা থাকুক সে চিন্তা বাদ দিয়ে আমল করে যেতে থাকা।

২. ভাগ্যের লেখার সাথে আমলের কোন সংঘর্ষ থাকে না। যদি সংঘর্ষই থাকত তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমল করে যেতে বলতেন না। আমল করে যেতে থাকার নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমল করা যাবে। যদি এমনই হত যে, লেখার কারণে সে আমল করতে পারবে না, তাহলে তাকে আমলের নির্দেশ দেয়া হত না। কেননা তাহলে অসাধ্য বিষয়ে নির্দেশ হয়ে যায়। আর কুরআনে কারীমের ভাষ্যমতে ধর্মে সাধ্যের বাইরে বিধান দেয়ার কোন নীতি নেই। বুঝা গেল বান্দার আমলের চেষ্টার সাথে তাকদীরের লেখার এমন একটা সমন্বয় থাকে যে, সেই লেখা ও আমল–এই দুটোর মধ্যে কোন সংঘর্ষ বাঁধে না। বান্দার আমল করতে চাওয়া না চাওয়া আর আল্লাহর লিখে রাখা– এদুটোর মধ্যে অসমন্বয় নয় বরং সমন্বয় থাকে। কীভাবে আল্লাহ এমন সমন্বয় ঘটান তা তিনিই জানেন। আমাদের

www.maktabatulabrar.com

সেটা বুঝার প্রয়োজনও নেই। আমাদের শুধু এতটুকু বুঝলেই হয় যে, আমরা যা আমল করতে চাইব তা করতে পারব, তাকদীরের লেখা তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না। অতএব আমরা আমল করতে না চাইলে এবং তার ফলে আমল করা না হয়ে উঠলে আমরা দায়ী হব।

৩. তাকদীরে ঈমান হল একটা বিশ্বাসগত বিষয়, আর আমল হল একটা কর্মগত বিষয়। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বিশ্বাসগত বিষয়ের ভিত্তিতে কর্মগত বিষয় পরিত্যাগ করা যাবে কি না, তখন তিনি উত্তরে বলেছেন, না বরং আমল করে যেতে থাক। এভাবে তিনি বুঝিয়েছেন বিশ্বাসগত বিষয়কে কর্মগত বিষয়ের পক্ষে অন্তরায় মনে করা যাবে না। বিশ্বাসগত বিষয়কে বিশ্বাসগত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, কর্মগত বিষয়ের ক্ষেত্রে সেটাকে বাধা হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না।

৪. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে উদ্দেশ্যে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অনুকূল কাজের তাওফীক তাকে দেয়া হবে।" এভাবে বলেননি যে, যে যা করতে চাইবে তার অনুকূল কাজের তাওফীক তাকে দেয়া হবে। বোঝানো হয়েছে যে, চূড়ান্তভাবে কে কি চাইবে আর কী হবে তা যেহেতু অনাদিকাল থেকেই আল্লাহর জানা আছে এবং সেটাকে সামনে রেখেই প্রত্যেককে সৃষ্টি করা হয়েছে, অতএব বলা যায় যে উদ্দেশ্যে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অনুকূল কাজের তাওফীক তাকে দেয়া হবে। এভাবে বলে মূলত বোঝানো হয়েছে, অনাদিকাল থেকেই আল্লাহর সবকিছু জানা। যদি এভাবে না বলে বলা হত, যে যা করতে চাইবে তার অনুকূল কাজের তাওফীক তাকে দেয়া হবে, তাহলে অর্থ এই দাঁড়াত যে, আল্লাহ অনাদিকাল থেকে সবকিছু জানেন না। কেননা যদি অনাদিকাল থেকেই জানবেন তাহলে তো সেই জানা মোতাবেকই তাকে সৃষ্টি করা হত, তাহলে তো এভাবেই বলার কথা ছিল যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার তাওফীক তার হবে। সেভাবে না বলে "যে যা করতে চাইবে তার অনুকূল কাজের তাওফীক তাকে দেয়া হবে" কেন বলা হল? অতএব আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে, আমরা যে আমলের জন্য চেষ্টা করব, যে আমল করব সেটাই বোঝাবে কোন্ লক্ষ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

একটা প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে এই যে, এতক্ষণ যে বলা হল আমরা যা করতে চাইব তার তাওফীক আমাদেরকে দেয়া হবে, তা আল্লাহর চাওয়া ছাড়া তো আমরা কিছু চাইতেও পারব না। আমরা তো চাওয়ার ব্যাপারেই স্বাধীন নই। যেমন কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, ﴿وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ (অর্থাৎ, আল্লাহ যা চাইবেন তা তাছাড়া তোমরা কিছু চাইতেও পারবে না।) তাহলে তো দেখা গেল আমরা চাওয়া বা ইচ্ছার ব্যাপারেও স্বাধীন নই, আল্লাহ না চাইলে আমরা তো কোন কিছুর ইচ্ছাও করতে পারব না, এভাবে যে আমরা চরম অক্ষম সাব্যস্ত হচ্ছি।

এ প্রশ্নের উত্তর হল– ইচ্ছার ব্যাপারে আমাদের মোটেই স্বাধীনতা নেই এ কথা বোধ হয় আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। তার দুটো কারণ। যথা: (১) অন্যান্য অনেক আয়াতে বান্দার দিকে মাশিয়্যাত তথা ইরাদাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর যে ব্যাপারে কারও মোটেই ইখতিয়ার থাকে না সে ব্যাপারটা তার দিকে সম্পৃক্ত হয় না। অতএব বুঝা গেল মাশিয়্যাত তথা ইরাদার একটা স্তর হলেও বান্দার ইখতিয়ারে রয়েছে। (২) কোনোভাবেই যদি মাশিয়্যাত বা ইরাদার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার না থাকে তাহলে বান্দা মুকাল্লাফ হতে পারে না। অতএব আয়াত দ্বারা সম্ভবত উদ্দেশ্য দু'টো হতে পারে। (১) আল্লাহ না চাইলে তোমরা চাইতেও পারবে না অর্থাৎ, আল্লাহ না চাইলে কোন চাওয়াকে তোমরা চূড়ান্ত রূপ দিতে পারবে না। (২) তোমরা কিছু চাইতে গেলে আল্লাহও সে চাওয়ার ইখতিয়ার দিবেন। এক্ষেত্রে তোমাদের চাওয়া রূপ পাওয়ার পূর্বে যেহেতু আল্লাহর চাওয়া সংঘটিত হবে সে হিসেবে আল্লাহর চাওয়া পূর্বে সংঘটিত হওয়ায় বলা হয়েছে আল্লাহর চাওয়া ছাড়া তোমরা চাইতে পারবে না, অর্থাৎ, আল্লাহর চাওয়া তোমাদের চাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হবে। এ ব্যাখ্যায় বান্দার পূর্ণাঙ্গ মাজবূর বা অক্ষম হওয়া অবধারিত হয় না। আর আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হল বান্দা পূর্ণাঙ্গ মাজবূর

www.maktabatulabrar.com

বা অক্ষম নয় বরং বান্দা হচ্ছে মুখ্‌তারে[১] মাজবূর[২] অর্থাৎ, বান্দার ইখতিয়ারও আছে আবার মাজবূরীও আছে। ইখতিয়ার হল ইচ্ছার সূচনা করার আর মাজবূরী তথা অক্ষমতা হল ইচ্ছাকে নিজের থেকে চূড়ান্ত রূপ দিতে না পারার। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে তাকদীর সংক্রান্ত প্যাঁচ অনেকাংশে বোধগম্য হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। (والله أعلم /আল্লাহই ভাল অবগত আছেন।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তাকদীর সম্বন্ধে মনে ওয়াছওয়াছা জাগ্রত হলে এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল মনকে এতটুকু বুঝিয়েই ক্ষান্ত হবেন। এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলতে যাবেন না। কারণ তাকদীর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। তাকদীর হচ্ছে মহাবিশ্বের অনন্তকালের এক অনন্ত অসীম পরিকল্পনা। তাই আমাদের সীমিত ব্রেনে তাকদীর সম্পর্কিত যাবতীয় বুঝ এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ সামাই হওয়া সম্ভব নয়। অতএব এ সম্বন্ধে বেশি বুঝতে চেষ্টা করলে ব্রেন আউট হয়ে পাগল হয়ে যাওয়ার কিংবা সঠিক বুঝ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতীতেও অনেক লোক তাকদীর নিয়ে ঘাটাঘাটি করায় বিভ্রান্ত হয়েছে। কেউ হয়েছে কাদরিয়া[৩] কেউ হয়েছে জাবরিয়া[৪]। এ কারণে তাকদীর নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করা ঠিক নয়। এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)–এর কাছে তাকদীর সমন্ধে কয়েকবার প্রশ্ন করেছিল আর তিনি প্রত্যেকবার তাকে তাকদীর নিয়ে ঘাটাঘাটি না করার জন্য বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে কথা বলেছিলেন। হযরত আলী (রা.) তাকে যে কয়টা কথা বলেছিলেন তার কিয়দাংশ নিম্নরূপ:

طَرِيْقٌ مُظْلِمٌ لَا تَسْلُكْهُ، بَحْرٌ عَمِيْقٌ لَا تَلِجْهُ، سِرُّ اللهِ فَلَا تَكَلَّفْهُ. (الإبانة الكبرى لابن بطة)

১। মুখতার অর্থ যার ইখ্‌তিয়ার বা ইচ্ছাধিকার রয়েছে।

২। মাজবূর অর্থ বাধ্য বা অক্ষম।

৩। তাকদীরকে অস্বীকারকারী একটা ভ্রান্ত দল।

৪। একটা ভ্রান্ত দল যারা মনে করত মানুষের কোন ইচ্ছাধিকার নেই, মানুষ হচ্ছে সম্পূর্ণ মাজবূর বা অক্ষম।

অর্থাৎ, তাকদীর হচ্ছে এক অন্ধকার পথ, তুমি তাতে চল না। তাকদীর হচ্ছে এক গভীর সমুদ্র, তুমি তাতে ডুব দিও না। তাকদীর হচ্ছে আল্লাহর এক গোপন রহস্য, তুমি তা জানার প্রতি অনুরক্ত হয়ো না। (আল-ইবানাতুল কুবরা)

দ্বীন-ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ওয়াছাওয়াছা

ওয়াছওয়াছা: ইসলাম ধর্ম সঠিক হলে এ ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি হয় না কেন?

উত্তর: ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি নয় বলে ইসলাম সঠিক নয়– এই যুক্তি ভুল। যে জিনিসের পরিমাণ বেশি সেটা সঠিক– এই ধারণাই তো ভুল। দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে সততার চেয়ে অসততার পরিমাণ বেশি তাই বলে কি অসততাই সঠিক? পূণ্যের চেয়ে পাপের পরিমাণ বেশি তাই বলে কি পাপই সঠিক? খাঁটির চেয়ে ভেজালের পরিমাণ বেশি হলে কি ভেজালটা সঠিক হয়ে দাঁড়ায়? বস্তুত কোন কিছুর সংখ্যা বা পরিমাণ দিয়ে তার খাঁটিত্ব বা সঠিকতা নির্ণিত করা যায় না। বরং খাঁটিত্ব বা সঠিকতা নির্ণিত হয় তার অন্তর্নিহীত গুণাবলী দ্বারা। এ কথাটিকেই এ ভাষায় বলা যায়, কোয়ান্টিটি নয় বরং কোয়ালিটি দিয়েই বিচার করতে হয়। অতএব অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের খাঁটিত্ব ও সঠিকতা নির্ণিত করতে হলে ইসলামের নীতিমালা ও গুণাগুণ বিচার করে দেখতে হবে। আর একথা বিধর্মীরাও স্বীকার করে যে, নীতিমালা ও গুণাগুণের বিচারে ইসলামের তুলনা হয় না। বিধর্মীদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ তারা মূল ইসলামের সমালোচনা করে না, তারা সমালোচনা করে ইসলামের অনুসারী তথা মুসলমানদের কার্যকলাপের।

ওয়াছওয়াছা: ধর্ম-কর্ম সঠিক নয় বলেই নিম্ন মানের লোকেরাই ধর্ম-কর্ম করে। উন্নত মানের লোকেরা কেন ধর্মে আসে না?

উত্তর: আগে নিম্নমানের কারা আর উন্নতমানের কারা তা সঠিকভাবে বুঝে নিন। যারা ধর্ম-কর্ম করে না, ধর্ম মানে না, তারা ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতমানের লোক নয়। কুরআনের বর্ণনামতে তাদের অবস্থা হল–

﴿لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُولٰٓئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ﴾

[অর্থাৎ], "তাদের অন্তর থাকা সত্ত্বেও তারা (সঠিক জিনিস) উপলব্ধি করে না, চোখ থাকা সত্ত্বেও (ভাল জিনিস) দেখে না, কান থাকা সত্ত্বেও (ভাল জিনিস) শোনে না, তাই তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তার চেয়ে অধম।" অতএব তারা যেখানে পশুর কাতারের, মানুষের কাতারেরই নয়, সেখানে তারা মানুষের মধ্যেও আবার উন্নত মানের মানুষ কী করে হতে পারে?

যদি প্রশ্ন এভাবে করা হয় যে, উন্নত মানের লোকেরা কেন ইসলাম গ্রহণ করে না, তাহলে তার উত্তর এতক্ষণ শুনলেন। হাঁ যদি প্রশ্নের ভাষা পাল্টে এভাবে প্রশ্ন করা হয় যে, অর্থসম্পদশালীরা, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারীরা কেন ইসলাম গ্রহণ করে না, তাহলে তার উত্তর শুনুন। অর্থসম্পদের কারণে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকার কারণে তাদের মধ্যে অহংকার থাকে, আর অহংকারই সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায় ইসলামের মত সত্য গ্রহণের তাওফীক তাদের হয় না। তবে হাঁ অর্থসম্পদ থাকা সত্ত্বেও, প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও যাদের মধ্যে বিনয় থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েও থাকেন। তাই অর্থসম্পদ থাকা সত্ত্বেও, প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও অনেককে ইসলামের অনুসারী ও ধর্মপ্রাণ হতে দেখা যায়।

ওয়াছওয়াছা: বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল। ধর্ম যে যুগে চালু হয়েছিল তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি হয়নি, এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধিত হয়েছে, এখন ধর্ম চলবে না, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধিত হওয়ার পর এখন ধর্মের নামে পেছন দিকে ফিরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

উত্তর: এখানে মূলত ৩টা অভিযোগ রয়েছে। যথা: ১. বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল। ২. বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ রয়েছে, তাই বিজ্ঞান ও ধর্ম পাশাপাশি চলতে পারে না। ৩. ধর্ম অনুসরণের অর্থ হচ্ছে পেছন দিকে যাওয়া। বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে পেছন দিকে ফিরে যাওয়া চলবে না, এখন অতীতকে বাদ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ-ই হল অভিযোগত্রয়ের বর্ণনা। এবার শুনুন পৃথক পৃথকভাবে অভিযোগত্রয়ের জবাব।

www.maktabatulabrar.com

১. বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল নয় বরং আরও বেশি সচল হওয়ার কথা। কারণ, বিজ্ঞান তো দিনের পর দিন ধর্মীয় বিষয়গুলোর সত্যতাই প্রমাণ করে চলেছে। বিজ্ঞানই তো আজ এই মহাবিশ্বের একজন শ্রষ্ঠা থাকার অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে। শত শত বিজ্ঞানী একজন সৃষ্টিকর্তার কথা স্বীকারও করেছেন। বিজ্ঞানই তো উর্দ্ধ জগতে বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল থাকার কথা প্রমাণ করছে যা জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতির কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করছে, এই বিজ্ঞানই তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সশরীরে মেরাজে গমনের সম্ভাব্যতাকে প্রমাণ করেছে। এই বিজ্ঞান দেখিয়েছে আলো মাপা যায়, বাতাস মাপা যায়, অর্থাৎ, যার শরীর নেই তা-ও মাপা যায় অতএব মীযানে আমল –যার কোন শরীর নেই– মাপার সম্ভাব্যতাও প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে বিজ্ঞান ধর্মের বহু মৌলিক বিষয়সহ অনেক গৌণ বিষয়কেও সত্য বলে প্রমাণ করেছে, যা বর্ণনার জন্য একটা সতন্ত্র বিশাল গ্রন্থের প্রয়োজন। যাহোক যেহেতু বিজ্ঞান যত উন্নতি লাভ করছে ধর্ম তত বেশি সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, তাই ধর্মের অনুসরণও তত উৎসাহিত হচ্ছে। এ কারণেই বলছিলাম, বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল নয় বরং আরও বেশি সচল হওয়ার কথা।

২. বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই, বরং সমন্বয় রয়েছে। কারণ, ধর্ম তো সত্য তথা বাস্তবসম্মত বিষয়, আর বিজ্ঞানও যদি সত্য তথা বাস্তবসম্মত হয় তাহলে দুটোর মধ্যে সংঘাত নয় বরং সমন্বয়ই থাকবে। তাই বিজ্ঞানের সাথে সাথে ধর্মেরও অনুসরণ করলে দুই সত্যের সমন্বিত শক্তির ফলে জীবনের সবকিছু আরও গতিশীল, আরও সচল হবে। সুতরাং বিজ্ঞানের উন্নতি হলে ধর্মের অনুসরণ আরও বেশি করা চাই, যাতে বিজ্ঞানের অনুসরণের মাধ্যমে ইহকালীন সফলতা আর ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে পরকালীন সফলতা লাভ হয়। আর এভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মকে পাশাপাশি রেখে উভয় জগতের সফলতা অর্জিত হয়।

৩. ধর্ম অনুসরণের অর্থ হচ্ছে পেছন দিকে যাওয়া– এ কথা বলে বোঝানো হয় যে, যারা বিজ্ঞান মানে তারা ধর্ম মানতে পারে না, কারণ ধর্ম পেছনের দিকে নিয়ে যায় আর বিজ্ঞান চায় পেছনকে বাদ দিয়ে সামনের দিকে যেতে। এ কথাটা একটা অবুঝ মানুষের কথা, এটা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অন্ধ অনুকরণে কথিত একটা কথা। বিজ্ঞান কি অতীতকে বাদ

www.maktabatulabrar.com

দিয়ে সামনের দিকে চলে? বিজ্ঞান কি অতীতের চন্দ্র-সূর্য, অতীতের গ্রহ-নক্ষত্র, অতীতের আকাশ-পৃথিবী, অতীতের আলো-বাতাস, অতীতের মাটি, পানি, ধাতু, পদার্থ এই সবকিছুকে বাদ দিয়ে চলে? নিশ্চয় না। বরং অতীতের সবকিছুকে নিয়েই গবেষণা করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তদ্রূপ আমাদেরও অতীতে প্রবর্তিত ধর্মকে নিয়েই গবেষণা করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে, অতীতের ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়।

ওয়াছওয়াছা: বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধে মুসলমানরা এত মার খায়, আল্লাহ সাহায্য করেন কৈ?

উত্তর: মার খাওয়ার কাজ করলে তো মার খাবেই। মার খাওয়ার কাজ করলে আল্লাহ মার থেকে বাঁচাবেন না, তখন আল্লাহ সাহায্য করবেন না– এটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কিংবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অমুসলিমদের সঙ্গে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ বিরোধী যেসব গোপন আঁতাত চালিয়ে যায় আর আমরা সেই নেতৃবৃন্দ ও কর্ণধারদের যেভাবে অন্ধ সমর্থন দিয়ে যাই তাতে আল্লাহ না করুন আমাদের আরও মার খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আল্লাহ মেহেরবান বলেই আমাদের অনেক মার থেকে বাঁচান।

যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য যে শর্তাবলী পূরণ করতে হয় তা কি এখনকার মুসলমানদের দ্বারা পূরণ হচ্ছে? না হলে আল্লাহ সাহায্য করবেন না সেটাই তো স্বাভাবিক। তারপরও আল্লাহ তাআলা অতি মেহেরবান হেতু মুসলমানদের সাহায্য করে যাচ্ছেন। দুনিয়ার তাবত কুফরী শক্তি মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছে, একযোগে ষড়যন্ত্র এঁটে যাচ্ছে, একযোগে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, তারপরও কিন্তু তারা মুসলামনদের নির্মূল করতে পারছে না। বরং পরিসংখানে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের অগ্রযাত্রাই বেড়ে চলেছে। তাহলে কি বুঝা যায় না, হাজার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্য করে যাচ্ছেন। রয়ে গেল এর মধ্যে যদি কিছু নিরাপরাধ মুসলমান মার খায় তাহলে সে কারণে তাদের পাপ মোচন হবে, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা বুলন্দ হবে, অতএব সেই মার খাওয়াতে তাদের ঠকা নেই। সাময়িক দুনিয়ার বিচারে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মনে হলেও

পরকালের বিচারে তারা লাভবান হচ্ছে। আর পরকালের বিচারে যারা লাভবান, তারাই তো বড় লাভবান!

ওয়াছওয়াছা: যুদ্ধে সাহায্যের জন্য এখন ফেরেশতারা আসেন না কেন?

উত্তর: এখানে কয়েকটি কথা আছে। যথা:

১. প্রথমত কথা হল এখন যে ফেরেশতারা আসেন না তা-ই বা নিশ্চিত করে কীভাবে বলা যায়। এখন ফেরেশতারা আসেন কি না তা তো কোন নবী থাকলেই তার মাধ্যমে জানা যেত। নবী যখন নেই তখন তা জানার উপায়ও নেই।

২. দ্বিতীয়ত সাহায্যের জন্য ফেরেশতা আসতেই হবে এমনও তো কোন কথা নেই। আল্লাহ কি কোথাও বলেছেন, সাহায্যের জন্য চিরকাল আমি ফেরেশতা প্রেরণ করব? সাহায্যকারী তো স্বয়ং আল্লাহ নিজে, তাঁর তো সাহায্যের জন্য ফেরেশতা পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে না। তিনি তো যেকোনো ব্যাপারে "হয়ে যা" বললেই তা হয়ে যায়। অতএব সাহায্যের জন্য তার ফেরেশতা কেন কোনো আসবাব উপকরণেরই দরকার পড়ে না। তবে ইসলামের শুরুর দিকে মানুষের ঈমানকে সুদৃঢ় করার বিশেষ উদ্দেশ্যে, আসবাব আছে জানলে মানুষের মনোবল বৃদ্ধি পায় এ হিসেবে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল। তা-ও সব যুদ্ধে পাঠানো হয়েছে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইসলামের শুরুর দিকে এভাবে ফেরেশতা পাঠিয়ে মানুষের ঈমানকে একবার যখন সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তারপর থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষের ঈমান সুদৃঢ় থাকার কথা। কখনও ঈমান দুর্বল হওয়ার উপক্রম হলে পূর্বের ইতিহাস স্মরণ করে ঈমানকে সুদৃঢ় করে নিবে। তাই পরবর্তীতে এভাবে ফেরেশতা পাঠানোর প্রয়োজন থাকেনি। মানুষের ঈমানকে সুদৃঢ় করার জন্য সবসময় ফেরেশতা পাঠাতে হবে আল্লাহর তো মানুষের ঈমানের জন্য এমন কোন ঠেকা নেই।

ওয়াছওয়াছা: ধর্মের নামে আলেমরা গরীবদেরকে শোষণ করে।

উত্তর: এটা একটা ভুয়া অভিযোগ। আলেমরা গরীবদেরকে কীভাবে শোষণ করে? গরীবদের শরীরে শিঙ্গা লাগিয়ে তাদের রক্ত চোষে, নাকি সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে তাদের রক্ত টেনে বের করে নেয়? উলামায়ে কেরাম

www.maktabatulabrar.com

মসজিদ মাদ্রাসার জন্য, দ্বীনের কাজের জন্য দান-সদকার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের থেকে দান-সদকা উসূল করে দ্বীনী কাজে লাগান– এটাই কি শোষণ? তা স্কুল কলেজের জন্যও তো চাঁদা কালেকশন করা হয়, সেটাও কি তাহলে শোষণ? উলামায়ে কেরাম তো উৎসাহিত করেন আর জনগণ স্বেচ্ছায় পরকালে প্রতিদান পাওয়ার আশায় খুশি খুশি দান-সদকা করেন, উলামায়ে কেরাম সেই অর্থ নিজেদের স্বার্থে নয় দ্বীনী কাজে ব্যয় করেন। অথচ স্কুল কলেজের জন্য চাপে ফেলেও, প্রভাব খাটিয়েও চাঁদা কালেকশন করা হয়, তাহলে কোনটাকে বেশি শোষণ আখ্যায়িত করা চাই? বস্তুত জনকল্যাণমূলক কাজে জনগণ থেকেই অর্থ নেয়া হয়ে থাকে, সেটা আদৌ শোষণ আখ্যায়িত হয় না। সরকার জনগণের কাজের জন্য জনগণ থেকেই বিভিন্ন রকম ট্যাক্সের নামে বহুভাবে অর্থ নিয়ে থাকে, সেটাকে কেউ শোষণ আখ্যায়িত করে না। শোষণ আখ্যায়িত হয় তখন, যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠি বিশেষ নিজেদের স্বার্থে কারও থেকে বলপূর্বক অর্থ গ্রহণ করে।

ওয়াছওয়াছা: ধর্মের নামে আলেমরা পোপতন্ত্র কায়েম করেছে।

উত্তর: যারা এই অভিযোগ করে তারা আলেম ও পোপ[১]– এই দু'টোর মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। আলেম ও পোপ– এ দুটোর মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করুন, তাহলে স্পষ্ট হবে পোপ আর আলেম এক ধরনের নয়। পোপরা যেমন ধর্মের নামে যাচ্ছে তাই করতে পারে আলেমদের সে সুযোগ নেই। অতএব ধর্মের নামে পোপরা পোপতন্ত্র কায়েম করতে পারে, স্বার্থতন্ত্র কায়েম করতে পারে, আলেমরা তা পারে না। এবার আলেম ও পোপ– এ দু'টোর মধ্যকার পার্থক্যগুলো দেখুন।

১. আলেম হতে বিশেষ ধরনের লেখাপড়ার প্রয়োজন পড়ে, পক্ষান্তরে পোপ হতে কোন বিশেষ ধরনের লেখাপড়ার প্রয়োজন পড়ে না। খৃস্টানদের কার্ডিনালরা[২] যাকে পোপ নিয়োগ দেয় সে-ই পোপ আখ্যায়িত হয়, যদিও তার লেখাপড়া কিছুই না থাকুক।

১। "পোপ" (pope) ক্যাথলিক খৃষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।

২। "কার্ডিনাল" খৃষ্টান জগতের একটা ধর্মীয় উপাধি। সারা বিশ্বে সর্বমোট ২৭০ জন কার্ডিনাল থাকে। তাদের মাধ্যমে পোপ নিয়োগ পান। কার্ডিনালগণ পোপের মন্ত্রণাসভার সভ্য হন।

২. আলেমকে আলেম হিসেবে কেউ নিয়োগ দেয় না। বিশেষ পর্যায়ের লেখাপড়ায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি এমনিতেই আলেম আখ্যায়িত হন। আলেম নিয়োগের কোন বিষয় নয়। এমন নয় যে, এক ব্যক্তিকে আলেম হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেই তিনি আলেম, আর নিয়োগ না দেয়া হলে তিনি আলেম নন। পক্ষান্তরে নিয়োগ প্রদান ছাড়া কেউ পোপ আখ্যায়িত হন না, তা তিনি যত লেখাপড়ায়ই উত্তীর্ণ হোন না কেন। সংক্ষেপে কথা হল, পোপ হওয়ার পেছনে একটা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া কার্যকর থাকে, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় তা নিষ্পন্ন হয়, পক্ষান্তরে আলেম হওয়ার পেছনে কোন সাংগঠনিক প্রক্রিয়া কার্যকর নয়।

৩. আলেম ব্যক্তি বিশেষ ধরনের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে থাকেন। লুচ্ছা, লম্পট, বদমাইশ, চোর-ডাকাত, প্রতারক, খুনী, লুটেরা, দস্যু, ব্যভিচারী ধরনের ব্যক্তিরা আলেম আখ্যায় ভূষিত হয় না। পক্ষান্তরে পোপ হওয়ার জন্য বিশেষ কোন ধরনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার দরকার পড়ে না। কার্ডিনালরা শুধু কাউকে শুধু নিয়োগ দিলেই তিনি পোপ আখ্যা লাভ করেন, তা চরিত্র তার যাই হোক না কেন। পোপ ত্রিশতম জন (ব্যক্তির নাম) ছিলেন একজন জলদস্যু।

৪. আলেমরা নিষ্পাপ আখ্যায়িত হন না, ইসলামের ধর্মীয় দর্শনে তাদেরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। ফলে তারা সমালোচনার উর্দ্ধে উঠে যান না। পক্ষান্তরে খৃস্টান জগতের ধর্মীয় দর্শন অনুসারে কেউ পোপ নিয়োজিত হওয়ার পরই তিনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে যান, ভুল-বিচ্যুতির উর্দ্ধে উঠে যান। ফলে তিনি সমালোচনার উর্দ্ধে উঠে যান। সমালোচনার উর্দ্ধে উঠে যাওয়ার ফলে পোপের যতটা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয় একজন আলেমের ক্ষেত্রে তেমন হয় না। কারণ কোন আলেম স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন না এই ভয়ে যে, পাছে তার সমালোচনা হবে, তার কর্মকাণ্ড মেনে নেয়া হবে না।

৫. পোপ যা বলেন তা-ই আইন হয়ে দাঁড়ায়। তার মুখের বাণী ধর্মীয় আইনের মর্যাদা পায়। এভাবে পোপকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে কোন আলেম যা-ই বলেন তা-ই আইন হয়ে দাঁড়ায় না। কোন আলেমের কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হয় না, যদি কুরআন সুন্নায়

তার কোন ভিত্তি না থাকে। কুরআন সুন্নায় ভিত্তি থাকলেই কেবল একজন আলেম তা অন্যকে বলতে পারেন।

৬. একজন পোপ তার নিজের স্বার্থেও আইন রচনা করতে পারেন, কেননা আইন রচনার ব্যাপারে তিনি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন। পক্ষান্তরে কোন আলেম নিজের স্বার্থে আইন রচনা করতে পারেন না।

www.maktabatulabrar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত-বন্দেগী বিষয়ক ওয়াছওয়াছা

www.maktabatulabrar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদত-বন্দেগী বিষয়ক ওয়াছওয়াছা

ইবাদত না করানোর জন্য বিভিন্ন রকম ওয়াছওয়াছা

মানুষ যেন ইবাদত করতে উদ্যোগী হতে না পারে এজন্য নফ্‌ছ ও শয়তান যেসব ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে এবং সেসব ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা কীভাবে করতে হয়, তার বিবরণ শুনুন। মনে করুন আব্দুল্লাহ নামক একজন লোক, সে যেন ইবাদতের জন্য উদ্যোগী হতে না পারে নফ্‌ছ ও শয়তান তাকে ওয়াছওয়াছা দিচ্ছে আর সে তার মোকাবেলা করে যাচ্ছে। শুনুন তাদের কথোপকথন।

আব্দুল্লাহ : তার মনে জাগল ইবাদত করা তো ফরয, অনেক আগেই তো বালেগ হয়ে গেছি, আর বালেগ হলেই তো নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ফরয হয়ে যায়। আর কতদিন ইবাদত থেকে দূরে থাকব। একদিন তো মরতে হবে! আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে। না, এখন থেকেই ইবাদত শুরু করতে হবে।

নফ্‌ছ ও শয়তান : এখন বয়স্কাল, এখনই কি ইবাদতের সময় হয়েছে? তুমি কি বৃদ্ধ হয়ে গেছ নাকি?

আব্দুল্লাহ : বৃদ্ধ হওয়ার আগে কি ইবাদত ফরয নয়? ইবাদত তো বালেগ হওয়ার পর থেকেই ফরয হয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

নফ্‌ছ ও শয়তান : হাঁ ইবাদত তো করতেই হবে। কিন্তু এখন বয়স্কাল, এখন একটু ফূর্তি-ফার্তি করো। ইবাদত করার তো সময় ঢের পড়ে আছে। শেষ বয়সে খুব ইবাদত করো। তখন তো ফূর্তি-ফার্তির বয়স থাকবে না, তখন আল্লাহ-বিল্লাহ ছাড়া আর কাজ কি? তখন সারাক্ষণ মসজিদে পড়ে থাকবে, আল্লাহর কাছে অতীতের জন্য কান্নাকাটি করে মাফ চাবে, আল্লাহ দয়ালু মাফ করে দিবেন।

অব্দুল্লাহ : আমার যে সময় আছে, তখন খুব ইবাদত করতে পারব– তার গ্যারান্টি দাও। আরও বয়স পাব তার গ্যারান্টি দাও।

নফ্‌ছ ও শয়তান : তোমার এখন কিইবা আর বয়স। স্বাভাবিকভাবেই তো অনেক মানুষ এর চেয়ে বেশি বয়স পায়। তুমিও পাবে।

আব্দুল্লাহ : আমার বয়সী অনেক লোকও তো মারা যায়। আমি যে মারা যাব না, আমি যে আরও বয়স পাব তার গ্যারান্টি দাও।

এবার শয়তান কোন জওয়াব না থাকায় পয়েন্ট আউট করবে। শয়তানের নিয়ম হল– কোন জওয়াব না থাকলে অর্থাৎ, হেরে যাওয়ার উপক্রম হলে পয়েন্ট আউট করে, মানে প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য কথা শুরু করে। সেমতে প্রসঙ্গ পাল্টে দিয়ে বলবে–

নফ্‌ছ ও শয়তান : ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্ম-কর্ম করতে গেলে জীবনে কোন রোমান্স থাকে না! জীবনটা একেবারে রসকষহীন হয়ে যায়, জীবনে কোন মজা থাকে না।

আব্দুল্লাহ : কে বলেছে, ইবাদত করলে জীবনে রোমান্স থাকে না? কে বলেছে ইবাদত করলে জীবনে স্বাদ বা মজা থাকে না। বুযুর্গানে দ্বীন তো বলেন, আমরা যে মজায় আছি তা যদি রাজা-বাদশারা টের পেত তাহলে আমাদের এই মজা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তারা আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হত।

নফ্‌ছ ও শয়তান : আরে ঐ রোমান্স না, মানে এখনই ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হয়ে হুজুর সেজে বসলে মেয়েদের সঙ্গে একটু ইয়ে সিয়ে সব রোমান্সই তো শেষ হয়ে যাবে। গান-বাদ্য, নাচ, রং ঢং কতকিছু থেকে বঞ্চিত হতে হবে!

আব্দুল্লাহ : মুরব্বীদের থেকে শুনেছি, তারা তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন, "বয়স্কালে মেয়েদের সঙ্গে অবৈধভাবে ইয়ে সিয়ে করলে,

গান-বাদ্য নাচ-ড্যান্সে লিপ্ত হয়ে মনকে অপবিত্র করলে সাময়িক মজা হয় বটে কিন্তু শেষ জীবনে এর জন্য এত অনুশোচনা জাগে, এত মানসিক কষ্ট হয় যে, তখন মনে হয় জীবনে এসব না করলেই বরং এখন খুব মানসিক শান্তিতে থাকতাম। পূত-পবিত্র অনুভূতিতে হৃদয়-মন ফুরফুর করত।" তাই আমি সাময়িক লাভের চিন্তায় ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করার মত অবুদ্ধিমত্তার কাজ করব না। আমি তোমার কথায় আমার ভবিষ্যতের পায়ে কুড়াল মারব না।

নফ্ছ ও শয়তান আবার পয়েন্ট আউট করবে।

নফ্ছ ও শয়তান : ধর্ম-কর্ম হল অন্ধ বিশ্বাস। আল্লাহকে দেখেছ কি? জান্নাত জাহান্নাম দেখেছ কি? এসব না দেখে বিশ্বাস করে তার জন্য ইবাদত করা– একেই তো বলে অন্ধ বিশ্বাস।

আব্দুল্লাহ : এগুলো সম্বন্ধে আগেও অনেক কথা হয়েছে। (পুস্তকের শুরুতে সংশ্লিষ্ট আলোচনা দ্রষ্টব্য।) আল্লাহ আছেন তারও যুক্তি আছে, জান্নাত জাহান্নাম আছে তারও যুক্তি আছে, এগুলো আমরা কেউ না দেখলেও আমাদের রসূল দেখেছেন। অর্থাৎ, এমন একজন দেখে এসে বলেছেন যার একার দেখাই একশ। এগুলো নিয়ে পূর্বে তোমার সঙ্গে অনেক বহাছ হয়েছে। আবার এগুলো নিয়ে আলোচনা করে সময় ক্ষেপন করতে চাই না। আমি ইবাদত শুরু করতে চাই। আমি তোমাকে তাড়ানোর জন্য পড়ছি– লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ইবাদতের পদ্ধতি নিয়ে ওয়াছওয়াছা

মানুষ যেন ইবাদত করতে উদ্যোগী হতে না পারে শুরুতে শয়তান সেই চেষ্টাই করে। এবং তার জন্য নানান রকম ওয়াছওয়াছা প্রদান করে, যার কিছু বিবরণ পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন মানুষ এসব ওয়াছওয়াছা উপেক্ষা করে ইবাদত শুরু করে দেয়ারই সংকল্প করে নেয়, তখন শয়তান মনের মধ্যে ইবাদতের স্বরূপ নিয়ে, ইবাদতের পদ্ধতি নিয়ে সংশয় ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, এসব ব্যাপারে মনের মধ্যে নানান বাজে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। যাতে ইবাদতের প্রতি মনের ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়, ইবাদতের প্রতি বিতশ্রদ্ধা জাগে এবং এভাবে সে ইবাদত থেকে সরে থাকে। এবার এরূপ কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর জেনে নিন।

www.maktabatulabrar.com

প্রশ্ন: এই যে নামায– একটু ওঠা-বসা করা, একটু কোমর বাঁকা করা, একটু মাটিতে কপাল ঠেকানো– নামাযের এই পদ্ধতির পেছনে কী যুক্তি আছে? এসব ওঠা-বসা, ঝোঁকা, মাথা ঠোকানো ইবাদত হতে যাবে কেন? ইবাদত তো বিরাট শানদার কিছু হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

উত্তর: যার জন্য ইবাদত করব তিনি যদি এইসব ওঠা-বসা ইত্যাদিতেই খুশি থাকেন, তাহলে আমার যুক্তি খোঁজার দরকার কী? আমার যুক্তিমত বিরাট কোন পদ্ধতি নির্ধারণ করে সেভাবে ইবাদত করলাম আর তিনি তাতে খুশি হলেন না তাহলে সেই বিরাট কিছু করে লাভ কী? যার ইবাদত করব তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, সেখানে তো আমার যুক্তি খোঁজার দরকার নেই। তিনি যে পদ্ধতিতে ইবাদত করলে সন্তুষ্ট হন আমার তো তা-ই করা চাই। আমি তো তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করি। আমার যুক্তিবোধকে সন্তুষ্ট করার জন্য তো ইবাদত করি না। কেউ যদি কাউকে বলে, ভাই তুমি আমার কাছে কিছুক্ষণ বসে থাক, তাতে আমার মনটা খুব ভাল লাগবে, সেখানে সে যদি চিন্তা করে আমি ওনার কাছে বসে থাকলে ওনার কী লাভ হবে, আমি বরং ওনার ক্ষেতটা কুপিয়ে দিয়ে আসি, তাতে ওনার ক্ষেতের ফসলটা ভাল হবে, তাহলে কি ওই ক্ষেত কোপানোটা ভাল হবে? এবং তাতে সে খুশি হবে? আদৌ না। বরং তার কথামত তার কাছে বসে থাকলেই তার মন খুশি হবে। বস্তুত কাউকে খুশি করার পদ্ধতি হল তিনি যাতে খুশি হন তা-ই করা, সেখানে নিজের যুক্তি চলে না। সেখানে নিজের যুক্তি চালানো ঠিক নয়। অতএব আল্লাহ তাআলা যদি এসব ওঠা-বসাতেই খুশি হয়ে যান, এই পদ্ধতিতে ইবাদত করলেই খুশি হন, ব্যস তাতেই আমরা খুশি, এখানে আমাদের যুক্তি খোঁজার দরকার নেই।

এ তো গেল ইবাদতের মধ্যে নামাযের রুকনসমূহের কোন যুক্তি না খুঁজে মেনে নেয়ার দিক। এবার শোন যুক্তি খোঁজার দিক। এসব পদ্ধতির পশ্চাতে পর্যাপ্ত যুক্তিও রয়েছে। নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঁচু করে মহান আল্লাহর সামনে সারেন্ডার বোঝানো হয়। হাত বেঁধে দাঁড়ানোর দ্বারা মুনিবের সামনে দাসত্ব জ্ঞাপন করা হয়। রুকুতে অল্প ঝুঁকে নতি স্বীকার বোঝানো হয়। সাজদাতে আরও ঝুঁকে আরও নতি স্বীকার বোঝানো হয়। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে নিজের সমস্ত আমিত্বকে বিলীন

করে দেয়ার অভিব্যক্তি ঘটানো হয়। এভাবে নামাযের প্রত্যেকটা রুকনের পদ্ধতির মাঝে অখণ্ডনীয় যুক্তি ও রহস্য রয়েছে।

প্রশ্ন: রোযায় কয়েক ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হয়, না খেয়ে থাকা ইবাদত হবে কেন? আমি না খেয়ে থাকলে আল্লাহর লাভ কী?

উত্তর: রোযায় পান, আহার ও যৌন চাহিদা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে প্রমাণ দেয়া হয় আমরা আল্লাহর জন্য আমাদের মৌলিক সব চাহিদাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। এভাবে আল্লাহ যখন আমাদের থেকে দেখতে পান আমরা তাঁর জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে পারি, তখন তিনি খুশি হয়ে যান। দুনিয়াতেও কোন মানুষ যখন কারও থেকে এর প্রমাণ পায় যে, সে তার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তখন সে তার প্রতি খুশি হয়ে যায়। কাজেই রোযায় না খেয়ে থাকার মাধ্যমে এটা ইবাদত হওয়ার মধ্যেও যুক্তি রয়েছে। ইবাদত বলাই তো হয় চরম দাসত্বের অভিব্যক্তি ঘটানো। একজন দাস যেমন তার মনিবের জন্য তার সব চাহিদা, চেতনা ও ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে বিসর্জন দিয়ে দেয়, আর একেই বলে দাসত্ব, তদ্রূপ বান্দাও তার মাওলা তথা মনিবের জন্য তার সব চাহিদা, চেতনা ও কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিবে, এটাই তো হবে ইবাদত। এ-ই তো ইবাদতের স্বরূপ।

তাছাড়া পূর্বেও বলেছি, কাউকে খুশি করার পদ্ধতি হল তিনি যাতে খুশি হন তা-ই করা, এখানে নিজের যুক্তি চলে না। এখানে নিজের যুক্তি চালানো ঠিক নয়। এখন আল্লাহ যদি তাঁর উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ না খেয়ে কষ্ট করলে খুশি হন তাতেই আমরাও খুশি, এখানেও আমাদের যুক্তি খোঁজার দরকার নেই।

প্রশ্ন: হজ্জে যা করা হয়, তারই বা যুক্তি কী? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বায়তুল্লাহর পাশে ঘোরা হয়। আল্লাহ কি ঔই ঘরের মধ্যে থাকেন যে, তাকে পাওয়ার জন্য ওখানে ঘুরতে হবে? হাজেরা (আ.) তার সন্তানের জন্য পানির খোঁজে ছোটাছুটি করেছিলেন, হজ্জে তার নকল করা হয়, হযরত ইব্রাহীম (আ.) শয়তানকে পাথর মেরেছিলেন, এখন তারই নকল করে হাওয়ার উপর পাথর ছোড়া হয়। এখন তো শয়তান সেখানে পাথর খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে না। তাহলে এখন ওখানে পাথর মেরে লাভ কী? এগুলোর পেছনে কোন যুক্তি নেই। এগুলো কেন ইবাদত হতে গেল?

www.maktabatulabrar.com

উত্তর: পূর্বেই তো বলেছি, ইবাদত হল আল্লাহকে খুশি করার জন্য। আর মা হাজেরা ও ইব্রাহীম (আ.) প্রমুখ আল্লাহর কতিপয় বান্দা-বান্দীর কিছু কাজে আল্লাহ খুশি হয়ে স্থির করেছেন, যারা আমার এই বান্দা-বান্দীদের এইসব কাজের নকল করবে তাদের প্রতিও আমি খুশি, তাহলে সেখানেও বা আমার যুক্তি খোঁজার দরকার কী? তিনি যা কিছুতে খুশি আমরাও সেই সবকিছুতেই খুশি। অতএব আমাদের যুক্তি খোঁজার দরকার নেই।

আর রয়ে গেল আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে ঘোরার বিষয়টা, তা এখানে আসল কথা হল প্রেমিক যেমন তার প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য তার আশপাশে ঘুরঘুর করে, আমরাও আমাদের প্রেমাস্পদ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তাঁর আশপাশে ঘুরঘুর করতে চাই। কিন্তু আল্লাহর সত্তা যেহেতু সৃষ্টির সবকিছুর চেয়ে বড়, তাঁর পক্ষে নির্দিষ্ট কোন স্থানে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, তাহলে আমরা তাঁর পাশে ঘুরঘুর করব কীকরে? কোথায় ঘুরঘুর করব? তাই আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহ তথা কা'বা শরীফকে তাঁর রহমত ও মনোযোগের কেন্দ্র নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছেন, তোমরা একে কেন্দ্র করেই ঘুরে দেখাও কে কে আমাকে পাওয়ার জন্য ঘুরঘুর করার মানসিকতা পোষণ কর। আমরা সেই মানসিকতা পোষণের প্রমাণ স্বরূপ প্রতীকীভাবে বাইতুল্লাহর চক্কর দিয়ে থাকি। আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহর মধ্যে রয়েছেন এই ভেবে আমরা বাইতুল্লাহর চক্কর দেই না। বরং এটা হল একটা প্রতীকী আমল, এই ঘোরা হল প্রতীকী ঘোরা। আর আল্লাহ এই দেখে উৎফুল্ল হন যে, ওরা আমাকে পাওয়ার জন্য প্রতীকী ঘুরঘুর পালন করছে, যদি প্রকৃতপক্ষেই ওরা আমাকে নির্দিষ্ট কোন স্থানে পেত তাহলে ওরা ঠিকই সেখানে ঘুরঘুর করত। ব্যস আল্লাহ এতেই তাওয়াফকারীদেরকে তার প্রেমিকদের মধ্যে গণ্য করে নেন।

প্রশ্ন: হজ্জ আর এমন কী ইবাদত? হজ্জ তো হচ্ছে একটা মেলা। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বাজারঘাট করা– এই তো হজ্জ। হজ্জ আর মেলার মধ্যে কী পার্থক্য?

উত্তর: পার্থক্য তো স্পষ্ট। মেলায় হয় মেলামেশা, আড্ডা আর বাজারঘাট করা, আর হজ্জ বলা হয় ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ সায়ী করা, উকূফে আরাফা করা ইত্যাদিকে। নারী পুরুষে অবাধ মেলামেশা আর বাজারঘাট

করা হজ্জের কোনোই অংশ নয়। হজ্জের নিয়মের মধ্যে তো কোথাও এমন কিছু লেখা হয়নি যে, নারী পুরুষে অবাধ মেলামেশা করতে হবে, বাজারঘাট করতে হবে। যদি কেউ হজ্জের মূল কাজ বাদ দিয়ে এগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে তাহলে সেটা তার ব্যক্তিগত ভুল। কিন্তু তাই বলে প্রকৃত হজ্জকে তো আর মেলা বলা যায় না।

প্রশ্ন: নারী পুরুষে মেলামেশা যদি হজ্জের মূল নিয়মের অন্তর্ভুক্ত না হবে, তাহলে একত্রে নারী পুরুষের তাওয়াফের ব্যবস্থা কেন? এখানেই তো নারী পুরুষে ঘষাঘষি ডলাডলি হয়ে যায়। অন্তত একজনের প্রতি আর একজনের নজর তো পড়েই। আর এভাবেই তো কামনা জাগ্রত হওয়ার পরিবেশ তৈরি হয়।

উত্তর: ভুল ব্যাখ্যা। তাওফাফের সময় তো আল্লাহকে পাওয়ার চিন্তায় বিভোর হয়ে চক্কর দেয়া হয়, আল্লাহর প্রেমে দিওয়ানা হওয়ার অভিব্যক্তি ঘটানো হয়। তাই একত্রে নারী পুরুষে তাওয়াফ করলে তখন পরীক্ষা হয়ে যায় কে আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক আর কে নকল প্রেমিক। যার নজর ও মন কোন নারীর প্রতি যায় তার ব্যাপারে প্রমাণ হয়ে যায় সে আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক নয়, সে আল্লাহকে পাওয়ার চিন্তায় বিভোর নয়। আল্লাহকে পাওয়ার চিন্তায়ই যদি বিভোর থাকবে তাহলে তার মন কোন নারীর প্রতি যায় কেন? এভাবে একত্রে নারী পুরুষের তাওয়াফ হওয়ার সময় পরীক্ষা নেয়া হয়। এই পরীক্ষার জন্যই এমনটি হয়ে থাকে। তাছাড়া নারীদের জন্য তো বলাও হয়েছে যথাসম্ভব পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে তারা তওয়াফ করার চেষ্টা করবে। এটাই তাদের জন্য উত্তম।

প্রশ্ন: হজ্জ উমরায় হজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া হয়। এটাও তো মূর্তি পূজার মতই। মূর্তিকে সম্মান করা আর হজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে হজরে আসওয়াদকে সম্মান করার মধ্যে কী পার্থক্য? দুটোই তো পাথরকে সম্মান প্রদান।

উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর তো সেই কোন্ যুগে হযরত ওমর (রা.) দিয়ে গেছেন। তিনি হজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

«أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ.» (صحيح البخاري حديث رقم ١٦٠٥)

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, জেনে রাখ, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে তুমি একটা পাথর, তোমার মধ্যে ক্ষতি করার বা উপকার করার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমাকে চুমু দিতাম না। (বোখারী: হাদীছ নং ১৬০৫)

হযরত ওমর (রা.)-এর এ কথায় ইসলামী আকীদা ব্যক্ত হয়েছে যে, আমরা হজরে আসওয়াদের মধ্যে নিজস্ব কোন ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস রাখি না। শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নকলে এটা করা হয়। আর পূর্বেই তো বলা হয়েছে, হজ্জের অনেক কিছুই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নকলে করা হয়, এই নকলেই আল্লাহ খুশি হন, তাই আমরা এটা করি। পক্ষান্তরে যারা মূর্তির পূজা করে তারা বিভিন্ন মূর্তিকে বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। তাই মূর্তির পূজা আর হজরে আসওয়াদে চুমু- এ দু'টোর মধ্যে মৌলিকভাবেই বিস্তর ফারাক রয়েছে। হে শয়তান! একটার সঙ্গে আরেকটার প্যাঁচ লাগিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা সফল হবে না।

প্রশ্ন: নামায পাঁচ ওয়াক্ত কেন?

উত্তর: আমি উল্টো প্রশ্ন করি- পাঁচ ওয়াক্ত হলে অসুবিধা কি? পাঁচ ওয়াক্ত না হয়ে কম বেশি কেন হতে যাবে? আসল কথা হল তুমি পাঁচ ওয়াক্ত থেকেও আর কম হলে কিংবা মোটেই নামায না থাকলে ভাল হত বলতে চাও, তাই নয় কি? তাহলে শোন, যদি আল্লাহ পাক ২৪ ঘণ্টাও নামাযে থাকতে বলতেন, তা-ই আমরা করতাম। আমাদেরকে সৃষ্টিই তো করা হয়েছে ইবাদতের জন্য। তিনি প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরয করে তারপর সহজ করতে করতে পাঁচ ওয়াক্তে এনে দাঁড়িয়েছেন। আর কত সহজ চাই? একেবারে এক ওয়াক্তও না থাকলে বুঝি খুশি হতে?

প্রশ্ন: মাগরিব, ইশা ও ফজরের কেরাত সশব্দে আর জোহর আসরের কেরাত আস্তে পড়া হয় কেন?

উত্তর: সব ওয়াক্তেই সশব্দে পড়ার কথা ছিল, যাতে মুক্তাদীরা শুনতে পায়। কিন্তু সেই যুগে কাফেররা দিনের বেলায় সশব্দে কেরাত পড়া হলে কেরাত শুনে কুরআন নিয়ে নানান রকম উপহাস করত। তাই দিনের বেলায় কেরাত আস্তে রেখে তাদের উপহাস করার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে মাগরিবের সময় তারা অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করত না

এবং ইশা ও ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকত বিধায় তখন কেরাত সশব্দেই রাখা হয়েছিল। আর এই নিয়ম সবসময়ের জন্যই বহাল রাখা হয়েছে, যাতে নবীর যুগের স্মৃতি সকলের স্মরণ হয়।

ইবাদতের ছওয়াব ও ফায়দা প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

শয়তান শুধু ইবাদতের পদ্ধতি ও স্বরূপ নিয়েই ওয়াছওয়াছা দেয় না, ইবাদতের ছওয়াব ও ফায়দা প্রসঙ্গেও ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে। যার ফলে মানুষের মধ্যে ইবাদত নিয়ে সংশয়-সন্দেহ জাগতে পারে। নিচে সম্ভাব্য সেরূপ ওয়াছওয়াছা ও তার উত্তরগুলো দেখুন।

ওয়াছওয়াছা: শুনেছি ইবাদতে মজা লাগে, কৈ পেলাম কৈ?

উত্তর: আমাদের ইবাদত যথাযথভাবে হয় না বলেই মজা পাই না। বুযুর্গানে দ্বীন –যারা সুন্দরভাবে ইবাদত করেন তারা তো– ঠিকই মজা পান।

ওয়াছওয়াছা: বুযুর্গানে দ্বীন মজা পান? ভুল কথা। নিজে উপলব্ধি না করলে বিশ্বাস করা যায় না।

উত্তর: কোন জিনিসের মজা নিজে উপলব্ধি না করতে পারলে সমূলে তার মজাকে অস্বীকার করা ভুল। কোন ব্যক্তি জীবনে রসগোল্লা খায়নি, রসগোল্লার মজা সে কোনোদিন উপলব্ধি করেনি, তাই বলে কি রসগোল্লার মজাকে সমূলে অস্বীকার করা ঠিক? আমরা হাদীছ থেকে জেনেছি এবং বুযুর্গানে দ্বীনের বাচনিক তার বাস্তবতার স্বীকৃতি পেয়েছি যে, ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায় তাই বিশ্বাস করি। হাদীছ শরীফে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِيْ النَّارِ.» (رواه البخاري حديث رقم ٢١)

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকে সে ঈমানের (ও ইবাদতের) স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে: আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল তার কাছে অন্য সকলের চেয়ে প্রিয় হবে। আল্লাহর

www.maktabatulabrar.com

ওয়াস্তেই মানুষের সঙ্গে তার ভালবাসা থাকবে। আর কুফ্‌রে ফিরে যাওয়া তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দের লাগবে। (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে এসেছে,

«ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا.»

(رواه مسلم حديث رقم ٣٤)

অর্থাৎ, যে আল্লাহর প্রতি রব হিসেবে, ইসলামের প্রতি ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রসূল হিসেবে সন্তুষ্ট সে ঈমানের (তথা ঈমান ও ঈমান সঞ্জাত আমলের) স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। (মুসলিম)

এসব হাদীছের বক্তব্য অনুসারে যারা এরূপ গুণের অধিকারী তারা তথা বুযুর্গানে দ্বীন ইবাদত থেকে মজা পেয়ে থাকেন। বুযুর্গানে দ্বীনের বাচনিকও আমরা শুনেছি তারা ইবাদতে মজা পান– তাই বিশ্বাস করি।

ওয়াছওয়াছা: বুযুর্গানে দ্বীন মিথ্যাও তো বলতে পারেন। তারা নিজেদের বুযুর্গী ফলানোর জন্য মিথ্যা বলতে পারেন।

উত্তর: বুযুর্গানে দ্বীন যদি মিথ্যা বলতে পারেন, তাহলে হে শয়তান! তুমি কি মিথ্যা বলতে পার না? তুমি কি মিথ্যা বোঝাতে পার না? তুমি তো শয়তান, বুযুর্গরা তো শয়তান নয়, তাঁরা অবশ্যই তোমার চেয়ে ভাল। আমি তোমাকে তাড়াতে চাই, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ওয়াছওয়াছা: কুরআন শরীফে আছে দান-সদকা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ইরশাদ হয়েছে, وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ অর্থাৎ, আল্লাহ দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। কিন্তু কৈ এত দান-সদকা করলাম সম্পদ তো বাড়ল না।

উত্তর: কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, দান-সদকা করলে বৃদ্ধি পাবে। সম্পদের পরিমাণই বৃদ্ধি পাবে এমন তো স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তাই হতে পারে কুরআনের বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য কখনও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কখনও সম্পদের পরিমাণ নয় বরং বরকত বৃদ্ধি পাবে। আবার কখনও উভয়ভাবেও বৃদ্ধি পেতে পারে। অতএব আমি যা দান-সদকা করেছি তার দ্বারা সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলেও হয়তো বরকত বৃদ্ধি পেয়েছে। বরকত বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ অল্প সম্পদে বেশি কাজ হওয়া, সম্পদ অকাজে নয় বরং কাজের কাজে লাগা। অল্প সম্পদেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাওয়া

ইত্যাদি। এই অর্থে আমার বরকত হয়নি তা কে বলল? হয়তো দান-সদকা না করলে আমার যা কাজ হয়েছে তাতে আরও বেশি অর্থ লাগত, কিংবা আমার সম্পদ আরও বেশি অকাজে লাগত, কিংবা আমার সম্পদ দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে তা হত না। এভাবেই আমার সম্পদে বরকত হয়েছে। তাছাড়া দান-সদকা দ্বারা সম্পদের পরিমাণও যে বাড়েনি তা-ই বা কে বলল? হয়তো এখন যা সম্পদ আছে দান-সদকা না করলে তার চেয়ে কম থাকত, দান-সদকার ওছীলায় সেই কমা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এটাও তো সম্পদের পরিমাণে এক রকম বৃদ্ধি ঘটা।

ওয়াছওয়াছা: অল্প আমলে ছওয়াব বেশি, এক একটা আমলে কমপক্ষে দশটি নেকী, বাড়তে বাড়তে সাতশ বা তার চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। তাহলে তো ভাল হওয়ার চেতনা সৃষ্টির সুযোগ হ্রাস পায়? এতে অল্প আমল করেই ক্ষান্ত হয়ে যাবে যে, অনেক ছওয়াবই তো হয়েছে, ব্যস আর দরকার নেই।

উত্তর: কথা তো উল্টো হয়ে গেল। অল্প পরিশ্রমে যদি বেশি পারিশ্রমিক পায় তাতে কি মানুষ অলস হয়ে যায়? তাতে বরং আরও বেশি কর্মোদ্যোগী হয় যে, মাশা আল্লাহ কত সুবিধা, অল্প পরিশ্রমেই বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে! কাজেই যত বেশি কামাই করে নেয়া যায়। আরে শয়তান, তুমি মানুষকে উল্টো বোঝাতে চেষ্টা কর। একেই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। আমি তোমার থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজীম!

ইবাদতের ইখ্‌লাস সম্বন্ধে ওয়াছওয়াছা

ইবাদতের ব্যাপারে শয়তানের প্রথম ওয়াছওয়াছা থাকে যেন কেউ ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধই না হয়। এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করে ইবাদত শুরু করেই দিলে তখন ওয়াছওয়াছা হয় যেন ইবাদতে ইখ্‌লাস না আসে। আর যদি ইখ্‌লাস এসে যায় তখন সেই ইখ্‌লাস নষ্ট করার জন্য ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে। যেমন কোন এক লোক ইবাদত শুরু করলে যেমন নামায শুরু করলে প্রথমে শয়তান তাকে এরূপ ওয়াছায়াছা দিয়ে থাকে যেন শুরু থেকেই নামাযে ইখ্‌লাস না আসতে পারে। এ পর্যায়ে মনে আসে– খুব সুন্দরভাবে নামায পড়লে মানুষে বলবে লোকটি কত সুন্দর

www.maktabatulabrar.com

নামায পড়ে। সুন্দরভাবে নামায পড়লে মানুষের কাছে সম্মান বাড়বে। এভাবে শুরু থেকেই শয়তান ইখলাস-বিরোধী চেতনা এনে দেয়ার চেষ্টা করে। এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করার জন্য যখন লোকটি চিন্তা করে যে, মানুষের কাছে সম্মান পাওয়ার চিন্তায় নামায পড়লে তো রিয়া হয়ে গেল। এভাবে যে নামাযের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে! যাদের চিন্তায় আমি আমার নামাযের ইখলাস নষ্ট করছি, কেয়ামতের দিন তারা আমার কোনোই কাজে আসবে না। সেদিন মানুষের কাছে ভাল হওয়া দ্বারা আমার কোনোই ফায়দা হবে না। তাই মানুষের কাছে ভাল হওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহকে খুশী করার চিন্তায় নামায পড়া চাই। এই চিন্তা করে লোকটি মনে মনে বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমার এই নামাযকে কবূল করে নাও, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। এভাবে রিয়ার চেতনা দূর হয়ে ইখলাস এসে গেলে তখন শয়তান সেই ইখলাসকে নষ্ট করার জন্য এই চিন্তা এনে দেয় যে, আল-হাম্‌দু লিল্লাহ আমার মধ্যে ইখলাস এসে গেছে। আমি তো মাশাআল্লাহ ইখলাসের অধিকারী হয়ে গেছি, আমি তো কামেল লোক হয়ে গেছি!

শুধু নামাযের ক্ষেত্রে নয়, যাকাত, দান-সদকা, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রথমে রিয়ার চেতনা তথা লোক দেখানোর চেতনা ও মানুষের কাছে সম্মান পাওয়ার চেতনা আসে। যখন সেই রিয়ার চেতনা দূর করে ইখলাসের চেতনায় ফিরে আসা হয়, তখন এই ওয়াছওয়াছা হয় যে, আল-হাম্‌দু লিল্লাহ আমার মধ্যে ইখলাস এসে গেছে। আমি তো মাশা আল্লাহ ইখলাসের অধিকারী হয়ে গেছি, আমি তো কামেল লোক হয়ে গেছি! দুআর মধ্যে প্রথমে মানুষের কাছে বুযুর্গ প্রতিপন্ন হওয়ার চিন্তায় কাঁদার চিন্তা আসে। সেই চেতনা দূর করে আল্লাহর ভয়ে যখন কান্না আসে তখন মনে হয় মাশা আল্লাহ আমি তো বুযুর্গ হয়ে গেছি! এভাবে সব ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেই ইখলাস এসে গেলে সেই ইখলাসকে নষ্ট করার জন্য শয়তান এরূপ ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে। এই ওয়াছওয়াছা দূর করার উপায় হল– ইখলাস এসেছে কি না তা নিয়েও চিন্তা না করা। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনোকিছু নিয়েই না ভাবা। আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তা ব্যতীত কোনো চিন্তাকে প্রশয় না দেয়া।

নামাযের মধ্যে শয়তানের সঙ্গে বাহাছ না করা চাই

এখানে একটা বিষয় মনে রাখা চাই। তা হল নামাযের মধ্যে যখন ইখলাস-বিরোধী চিন্তা জাগে বা ইখলাস এসে যাওয়ার চিন্তা জাগে, কিংবা এই নামায পড়ে কী হবে? এই নামায দ্বারা জান্নাত অর্জন হবে বলা হয় তা আসলেই জান্নাত বলে কিছু আছে কি না ইত্যাদি– এজাতীয় যে কোনো চিন্তা মনে এলেই তা নিয়ে মনে মনে শয়তানের সাথে বাহাছ শুরু করা যাবে না। মনে একটা চিন্তা জাগবে আর আপনি তার মোকাবেলার চিন্তায় লিপ্ত হবেন আর মনে মনে তৃপ্তি অর্জন করবেন যে, শয়তানের ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করছি তা করা যাবে না। কেননা এভাবে এগুলো নিয়ে চিন্তায় লিপ্ত হলেও তো আপনি নামাযের চিন্তা থেকে সরে গেলেন। শয়তানের এটাও কৌশল হতে পারে যে, এভাবেই আপনাকে নামাযের চিন্তা থেকে সরিয়ে দিবে। তাই নামাযের মধ্যে যেকোনো ওয়াছওয়াছা এলে তখন সেটা নিয়ে কোনো উত্তর-পশ্চিম না করে সোজা নামাযের চিন্তায় ফিরে যাবেন। শয়তানের এসব ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা ও তা নিয়ে বাহাছ চর্চা করতে হলে নামাযের বাইরে করবেন, নামাযের মধ্যে নয়।

দুআ বিষয়ক ওয়াছওয়াছা

দুআর মধ্যে কান্নাকাটির বিষয়ে ওয়াছওয়াছা

দুআর মধ্যে কান্নাকাটি একটি কাম্য বিষয়। কান্নাকাটি ও রোনাযারী করে দুআ করা শরীয়তে প্রশংসনীয় ও ফযীলতের বিষয়। এরূপ চোখের পানি জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দেয়, জাহান্নামের শাস্তিকে প্রতিহত করে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ.» (رواه الترمذي برقم ١٦٣٣ وقال : هذا حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে

www.maktabatulabrar.com

ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ দুধ তার থনে ফিরে না আসে। আর আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না। (তিরমিযী)

এ হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ দুধ তার থনে ফিরে না আসে। এখানে বোঝানো হয়েছে যে দুধ একবার দোহন করা হয় তার যেমন থনে ফিরে আসা সম্ভব নয়, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাও সম্ভব নয়।

তবে এই কান্নাকাটি, এই চোখের পানি অবশ্যই অকৃত্রিম হওয়া চাই অর্থাৎ, কান্না হওয়া চাই, চোখের পানি ঝরা চাই নিতান্তই আল্লাহর ভয়ে তথা কবর, হাশর ও জাহান্নামের ভয়ে। শুরুতেই যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কৃত্রিম কান্নাকাটি হয় তাহলে অবশ্যই সেটা হবে রিয়ার পর্যায়ভুক্ত, যা শরীয়তে নিন্দনীয়।

এই কান্নার ব্যাপারে শয়তান কয়েক রকম ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে। যথা:

- শুরুতে শয়তান এই ওয়াছওয়াছা দেয় যে, কান্নাকাটি করা একটা লজ্জার বিষয়। এই চিন্তায় কাঁদতে লজ্জা বোধ হয়। শয়তান এভাবে লজ্জার চেতনা উস্কে দিয়ে কান্নাকাটি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা লজ্জার বিষয় নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে লজ্জা হল কোন পাপ কাজে এই ভেবে মন সংকুচিত হওয়া যে, এই পাপ কাজ করলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আমি কীকরে মুখ দেখাব! তখন সমস্ত মানুষের সামনে আমার এই পাপ প্রকাশ করে দেয়া হলে তখন আমি কীকরে মুখ লুকাব! শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লজ্জা প্রশংসনীয়, এরূপ লজ্জা ঈমানের একটা বড় অঙ্গ। অতএব আল্লাহর কাছে কান্নাকাটির মত একটা ফযীলতপূর্ণ বিষয়ে লজ্জা বোধ হওয়া– এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে লজ্জা নয়, এটা হচ্ছে ভুয়া লজ্জার চেতনা।
- উপরোক্ত ভুয়া লজ্জার চেতনা ঠেলে ফেলে যখন কেউ দুআ মুনাজাতের মধ্যে কান্নাকাটি শুরুই করতে যায় তখন শয়তান এই ওয়াছওয়াছা দেয় যে, তোমার তো কান্না আসে না, তুমি তো জোর করে কাঁদতে চাও, এটা তো কৃত্রিম কান্না। এই কৃত্রিমত্তার কোন দাম নেই।

এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা করতে হবে মনকে এই বলে যে, কান্না না আসলে কান্নাকাটির ভাবও তো প্রশংসনীয়। আর এখন কৃত্রিমভাবে কান্নাকাটি শুরু করলেও এভাবে কান্নার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে অকৃত্রিমভাবেই কান্না হবে। অতএব এখনকার কান্না কৃত্রিম হলেও সেটা ভবিষ্যতের ভাল কান্নার ওছীলা হবে। এ হিসেবে এখনকার কান্নাও ভাল-এর ওছীলা হিসেবে ভাল।

- উপরোক্ত ওয়াছওয়াছাও উপেক্ষা করে যখন কেউ দুআ মুনাজাতের মধ্যে কান্নাকাটি শুরুই করতে যায়, তখন শয়তান এই ওয়াছওয়াছা দেয় যে, কান্নাকাটি করলে মানুষে বুযুর্গ বলবে, তাহলে সে কান্নাকাটি তো রিয়া হয়ে যাবে। তাই রিয়া থেকে বাঁচার জন্য কান্নাকাটি থেকে বিরত থাকা চাই। এভাবে শয়তান ওয়াছওয়াছা দিয়ে শুরুতেই কান্নাকাটি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে থাকে।

এই ওয়াছওয়াছার মোকাবেলা হল– এটা বুঝা যে, আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের আযাবের ভয় থেকে কান্নাকাটি এলে এবং মানুষের কাছে বুযুর্গ আখ্যায়িত হওয়ার চিন্তা থেকে না হলে তারপরও যদি মানুষে বুযুর্গ বলে তাহলে তা রিয়া নয়। রিয়া হয় তখনই, যখন শুরু থেকেই বুযুর্গ আখ্যায়িত হওয়ার নিয়তে কৃত্রিমভাবে কান্নাকাটি আরম্ভ করা হয়।

- উপরোক্ত ওয়াছওয়াছাও উপেক্ষা করে যখন সত্যিকার আল্লাহর ভয় ও আযাবের ভয়ে দুআ মুনাজাতে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়া হয়, তখন শয়তান এই ওয়াছওয়াছা দেয় যে, তুমি মাশা আল্লাহ আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছ। তোমার ইখলাসে কোন ঘাটতি নেই। তবে এই কান্নাকাটি মানুষের সামনেও বেশি বেশি হওয়া দরকার, যাতে মানুষ তোমার কান্না দেখে কাঁদতে শিখে। বুযুর্গদের আমল দেখেই তো মানুষ আমল করতে শিখে। শয়তান এ ওয়াছওয়াছা দেয় এই বদ-মতলবে যাতে তার ভবিষ্যতের কান্না মানুষকে শেখানোর উদ্দেশ্যে হয়, আল্লাহর ভয়ে না হয়। আর এভাবে তার কান্না যেন জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ফযীলত থেকে বঞ্চিত কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

এই ওয়াছওয়াছা মোকাবেলা করার পদ্ধতি হল আমার কান্না থেকে কে শিখবে না শিখবে, কে জানবে না জানবে– এসব চিন্তা মনের মধ্যে মন্থিত না করা, এসব ওয়াছওয়াছা মনের মধ্যে উস্কে উঠলে তা নিয়ে

www.maktabatulabrar.com

মোটেই নাড়াচাড়া না করা, বরং শুধুই আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা মনের মধ্যে জাগরুক করে কাঁদতে থাকা। শয়তানের কাজ ওয়াছওয়াছা দিতে থাকা, তা সে করে যাক, আপনার কাজ কাঁদতে থাকা তা আপনি করে যান।

দুআ কবূল না হওয়ার ওয়াছওয়াছা

অনেক সময় এই ওয়াছওয়াছা হয় যে, আমরা আল্লাহর কাছে কত দুআ করি, আলেম-উলামা বুযুর্গানে দ্বীনও দুআ করেন কিন্তু দুআ কবূল হয় কৈ? এই যে সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের উপর অমুসলিমদের জুলুম-নিপীড়ন চলছে, সবাই দুআ করছে কিন্তু মুসলমানদের উপর থেকে বিপদ তো হটছে না, কাফেররা তো দমন হচ্ছে না। তাহলে কি দুআ মুনাজাত সবই ভুয়া?

এই ওয়াছওয়াছার কয়েকটি উত্তর। যথা:

১. যে বিপদ-মুসীবত তাকদীরে মুআল্লাক[১]-এর পর্যায়ে তা সংশ্লিষ্ট দুআ-দুরূদের দ্বারা দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে যে বিপদ-মুসীবত তাকদীরে মুবরাম[২]-এর পর্যায়ে তা কোনো কিছু দ্বারাই দূরীভূত হয় না।

২. বিপদ-মুসীবত দ্বারা অনেক সময় পাপ মোচন হয়, কখনও কখনও মর্যাদা বুলন্দ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বান্দা বিপদ-মুসীবত দূর হওয়ার জন্য দুআ করলেও আল্লাহ সেই বিপদ-মুসীবত দূর না করে তা স্থায়ী রাখেন বান্দার পাপ মোচন বা মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য।

৩. বান্দার সব দুআই কবূল হয় যদি কবূল হওয়ার শর্তাবলী পূরণ হয়। তবে কখনও কখনও সরাসরি বান্দা যা যেভাবে চায় সেভাবেই কবূল করা হয়, কখনও কখনও বান্দা যা চায় আল্লাহ তা না দিয়ে অন্য কিছু

১। মানুষের জীবনের কিছু বিষয়ের তাকদীর এভাবে লেখা যে, বান্দা যদি অমুক কাজ করে বা অমুক আমল করে তাহলে এরকম হবে আর অমুক কাজ বা অমুক আমল না করলে এরূপ হবে। এ পর্যায়ের তাকদীরকে বলা হয় তাকদীরে মুআল্লাক তথা কোনকিছুর উপর ঝুলন্ত তাকদীর।

২। মানুষের জীবনের কিছু বিষয় তাকদীরে এমনভাবে লেখা আছে যা কোন কাজ বা কোন আমলের উপর ঝুলন্ত নয়, বরং তা যেমন নির্ধারিত তেমনই অকাট্যভাবে তা ঘটবে, কোন কিছুতে তার কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এ পর্যায়ের তাকদীরকে বলা হয় তাকদীরে মুবরাম তথা অপরিবর্তনীয় তাকদীর।

তাকে দেন। কারণ আল্লাহর বিবেচনায় সেটিই বান্দার জন্য বেশি দরকারী বা বেশি উপকারী। এ ক্ষেত্রে আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, অবশ্যই আমাদের বিবেচনার তুলনায় আল্লাহর বিবেচনা অধিকতর সঠিক এবং অধিকতর উপযোগী। বরং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা বেঠিক আর আল্লাহর বিবেচনা সব সময় এবং সবক্ষেত্রেই সঠিক।

৪. অনেক সময় বান্দা দুনিয়ার জন্য কিছু চায় কিন্তু আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় জন্য তা না দিয়ে আখেরাতে তার জন্য কিছু বরাদ্দ করেন। আর অবশ্যই দুনিয়ার প্রাপ্তির চেয়ে আখেরাতের প্রাপ্তি অনেক বড় প্রাপ্তি। আখেরাতে যখন মানুষ এরূপ প্রাপ্তি দেখতে পাবে তখন বলবে, হায় দুনিয়ার জন্য আল্লাহর কাছে যতকিছু চেয়েছিলাম তার কোনটা যদি দুনিয়াতে না দিয়ে সেগুলোর বদলে আখেরাতে দেয়া হত তাহলে আরও কত ভাল হত!

বিপদ-আপদ বিষয়ক দুআ দুরূদের ফায়দা নিয়ে ওয়াছ্‌ওয়াছা

মানুষ বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি বা নিরাপত্তা লাভের জন্য যেসব দুআ-দুরূদ পাঠ করে এ নিয়েও শয়তান ওয়াছ্‌ওয়াছা দিয়ে থাকে। যেমন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট দুআ পড়লে বাইরের সব রকম আপদ বালা থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা। গাড়িতে আরোহণের দুআ পড়লে এক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা। নৌযানে আরোহণের দুআ পড়লে নৌযান ডুবি থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা ইত্যাদি। এসব দুআ-দুরূদ পাঠ করার পরও যদি সংশ্লিষ্ট বিপদ-মুসীবত দেখা দেয় তখন শয়তানের পক্ষ থেকে এরূপ ওয়াছ্‌ওয়াছা আসে যে, কৈ দুআ পড়ার পরও তো বিপদ থেকে রক্ষা হল না, তাহলে কি এসব দুআ ইত্যাদি ভুয়া? এ ওয়াছ্‌ওয়াছার উত্তর হল– যে বিপদ-মুসীবত তাকদীরে মুআল্লাকের পর্যায়ে তা সংশ্লিষ্ট দুআ-দুরূদের দ্বারা দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে যে বিপদ-মুসীবত তাকদীরে মুবরামের পর্যায়ে তা কোনো কিছু দ্বারাই দূরীভূত হয় না। অতএব দুআ-দুরূদ পাঠ করার পরও যখন এই বিপদ-মুসীবত দেখা দিয়েছে তাহলে বুঝা গেল এটা তাকদীরে মুবরামের পর্যায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু কার্ জীবনের কোন্ বিপদ তাকদীরে মুআল্লাকের পর্যায়ভুক্ত আর কোন্টা

www.maktabatulabrar.com

তাকদীরে মুবরামের পর্যায়ভুক্ত তা যেহেতু জানা নেই, তাই সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্যই সংশ্লিষ্ট দুআ-দুরূদ, আল্লাহর কাছে মুক্তি কামনা ইত্যাদি করে যেতে হবে।

উল্লেখ্য, তাকদীরে মুআল্লাক ও তাকদীরে মুবরাম কাকে বলে সে সম্বন্ধে পূর্বের পরিচ্ছেদে টীকায় বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তাকদীর বিষয়ক আরও কিছু ওয়াছ্‌ওয়াছা ও তা মোকাবেলা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্বে "তাকদীর বিষয়ক ওয়াছ্‌ওয়াছা" শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

www.maktabatulabrar.com

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

দাড়ি, টুপি ও ইসলামী লেবাসের ব্যাপারে ওয়াছওয়াছা

যৌবনে দাড়ি রাখতে, টুপি পরতে, ইসলামী লেবাস গ্রহণ করতে অনেক যুবক কুণ্ঠিত হয়। এই কুণ্ঠার পেছনে থাকে শয়তানের নানান রকম ওয়াছওয়াছা। এসব ব্যাপারে শয়তানই তাদের মনে বিভিন্ন রকম ওয়াছওয়াছা দিয়ে কুণ্ঠা সৃষ্টি করে। নিম্নে সেই ওয়াছওয়াছাগুলো উত্তরসহ উল্লেখ করা হল। ওয়াছওয়াছাগুলো পড়লে অনেকে ভাবতে পারেন এগুলো তো শয়তানের ওয়াওয়াছা নয়, এগুলো তো সমাজের এক শ্রেণীর লোকের কথা। কিন্তু এগুলো মূলত শয়তানেরই ওয়াছওয়াছা প্রসূত কথা, শয়তানেরই শেখানো কথা। শয়তানই সমাজের এক শ্রেণীর লোককে ওয়াছওয়াছা দিয়ে এসব বলতে শিখিয়েছে। অতএব এসবের মূলে শয়তানেরই ওয়াছওয়াছা কার্যকর। আবার শয়তানই মনের মধ্যে এসব কথা জাগিয়ে তোলে। সে হিসেবেও এগুলোকে শয়তানের ওয়াছওয়াছা বলা হচ্ছে। যাহোক ওয়াছওয়াছাগুলো উত্তরসহ দেখুন।

www.maktabatulabrar.com

ওয়াছওয়াছা: দাড়ি রাখলে, টুপি পরলে, ইসলামী লেবাস-পোশাক পরিধান করলে মেয়েরা তাদের কাছে ঘেষবে না, জীবনের অনেক রোমাঞ্চ থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

উত্তর: পবিত্র জীবনের অধিকারী হতে ও থাকতে চাইলে এমন পদ্ধতিই তো গ্রহণ করা চাই যাতে মেয়েরা কাছে না ঘেষে। এভাবেই তো পবিত্র থাকা সহজতর হবে। মেয়েরা কাছে ঘেষলেই তো জীবন পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে।

ওয়াছওয়াছা: দাড়ি রাখলে বিবিরা পছন্দ করে না। বিবিদের থেকে ভালবাসা পাওয়া যায় না। এটা স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় ব্যাঘাত ঘটায়।

উত্তর: তাহলে তো বলতে হয়, আলেম উলামা ও দ্বীনদার শ্রেণীর লোকদের –যারা দাড়ি রাখে তাদের– স্ত্রীরা স্বামীদেরকে ভালবাসে না। অথচ ব্যাপারটা ভিন্ন। আলেম উলামা ও দ্বীনদার শ্রেণীর লোকদের স্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় তাদের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদেরকে অধিক ভালবাসে। কারণ তারা দাড়ি রাখে বিধায় অন্য মেয়েরা তাদের কাছে ঘেষে না। ফলে তাদের মনের প্রীতি, ভালবাসা, অনুরাগ কোনো কিছু অন্য কোথাও নিবেদিত না হয়ে সবটুকু তাদের স্ত্রীদের প্রতিই নিবেদিত হয়। তখন স্ত্রীরা তাদেরকে বেশিই ভলবাসে। পক্ষান্তরে যারা দাড়িহীন তারা সহজে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ও ইয়ে সিয়ে করতে পারে, তাদের রস-কষ অন্য স্থানে নিবেদিত হয়ে পড়ে। ফলে স্ত্রীরা তাদের থেকে প্রাপ্য যথাযথ পায় না। তখন তাদের প্রতি স্ত্রীদের ভালবাসায় চিড় ধরে।

ওয়াছওয়াছা: দাড়ি রাখলে, টুপি পরলে, ইসলামী লেবাস-পোশাক পরিধান করলে অনেকে হুজুর বলে টিটকারি দিবে।

উত্তর: হুজুর বলে টিটকারী দিলে কী এসে যায়? না-বুঝ লোকেরা তো কত কিছুই বলতে পারে এবং বলে থাকে। যারা ধর্মীয় জীবন-পদ্ধতির সমালোচনা করে তারা না-বুঝ, অজ্ঞ কিংবা সজ্ঞান পাপী। যারা ধর্মীয় বেশভূষা নিয়ে টিটকারি দেয় তারা না-বুঝ, অজ্ঞ কিংবা সজ্ঞান পাপী। এমন না-বুঝ, অজ্ঞ ও সজ্ঞান পাপীদের কথায় কি আমরা আমাদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে দিব? না-বুঝ ও অজ্ঞ লোকদের কথায় উঠাবসা করা কি বোকামী নয়? যেসব পিতা-মাতা বা গুরুজন যুবকদেরকে যৌবনকালে

দাড়ি, টুপি, ইসলামী লেবাস-পোশাক গ্রহণের বিরুদ্ধে বলে, তারাও না-বুঝ কিংবা অজ্ঞ। তারা গোনাহের কথা বলে। আর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গোনাহের বিষয়ে কোন মানুষের আনুগত্য করা চলে না, তা সেই গোনাহের নির্দেশদাতা পিতা-মাতা কিংবা অন্য যতবড় গুরুজনই হোন না কেন। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.» (رواه أحمد برقم ١٠٩٥ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাফরমানী হয় এমন কোনো কাজে কোনো মাখলূকের আনুগত্য করা চলবে না। (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে আবী শাইবা)

ওয়াছওয়াছা: দাড়ি রাখা তো আর ফরয ওয়াজেব নয়, এটা সুন্নাত। অতএব এটাকে এত গুরুত্ব দেয়ার কী দরকার? হুজুররা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে থাকে।

উত্তর: কে বলেছে, দাড়ি রাখা ওয়াজেব নয়? চার ইমামের সব ইমামের নিকটই দাড়ি রাখা ওয়াজেব। এটা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজেব। কোন হুজুর এ ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি করেন না। এটাকে সুন্নাত বলা হয় এ হিসেবে যে, এটা নবীজীর আদর্শ। নবীজীর সব আদর্শকেই সুন্নাত বলা হয়। এ হিসেবে দাড়ি রাখাকেও সুন্নাত বলা হয়। কিন্তু এই সুন্নাত অর্থ সেই সুন্নাত নয় যা ফরয ওয়াজেবের নিচের স্তর। বরং দাড়িকে সুন্নাত এই অর্থে বলা হয় যে, এটা নবীজীর আদর্শ। হুকুমগত দিক থেকে এটা ওয়াজিব।

ওয়াছওয়াছা: ইসলামী লেবাস-পোশাক তো আর ওয়াজেব নয়। এগুলো বেশির থেকে বেশি বুযুর্গানে দ্বীনের লেবাস। অতএব এটা বেশির থেকে বেশি উত্তম হতে পারে। তা কত উত্তম কাজই তো তোমার থেকে ছুটে যায়, অতএব এই একটা নিয়ে এত বেশি সিরিয়াস হওয়ার দরকার কী?

উত্তর: উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের এই যে লেবাস-পোশাক যাকে আমরা ইসলামী লেবাস বলছি, এটা ফেকাহর পরিভাষায় ওয়াজেব নয় সত্য, কিন্তু অন্য এক বিবেচনায় ওয়াজেবের চেয়ে কম গুরুত্বেরও নয়। কারণ এই লেবাস ছাড়লে যে লেবাস ধরা হবে তাতে বিধর্মীদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুসরণ হয়ে যাবে। আর বিধর্মীদের ধর্মীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা জরুরি। কেননা হাদীছে এসেছে–

www.maktabatulabrar.com

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه أبو داؤد في كتاب اللباس حديث رقم ٤٠٢٦)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির ধর্মীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। (আবূ দাউদ)

ওয়াছওয়াছা: এখনও এসব ধর্মকর্ম করার বয়স হয়নি, বয়স হলে এগুলো করবে।

উত্তর: বয়স হওয়া মানে কি বুড়ো হওয়া? বয়স তো হয়েছেই। বালেগ হওয়া মানেই তো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অতএব আমি যখন বালেগ হয়েছি তখন বয়স তো হয়েছেই।

ওয়াছওয়াছা: যা-ই বল দাড়ি, টুপি, ইসলামী লেবাসকে সমাজের বহু লোক পছন্দ করে না। অতএব দাড়ি, টুপি ইসলামী লেবাস ধরলে এগুলোর কারণে সমাজের সেই লোকদের কাছে অপছন্দীয় হয়ে উঠতে হয়।

উত্তর: আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের আদর্শ। যে যা-ই বলুক আমরা আমাদের আদর্শে অটল থাকব। এর বিরুদ্ধে আমরা কারও কোনো কথার পরোয়া করব না, কারও পছন্দ- অপছন্দের পরোয়া করব না, এ-ই তো হল ধর্মীয় অটলতা। আমরা আমাদের আদর্শে অটল থাকব। আমাদের আদর্শের ব্যাপারে আমরা কখনও হীনম্মন্যতার শিকার হব না। নিজেদের ধর্মীয় আদর্শে এমন অটল থাকতে পারলেই আমরা লাভ করতে পারব ফেরেশতাদের বাচনিক সুসংবাদ, জান্নাতের সুসংবাদ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর অটল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না। তোমরা ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ: ৩০)

পর্দার ব্যাপারে ওয়াছওয়াছা

দাড়ি, টুপি ও ইসলামী লেবাস-পোশাকের ন্যায় পর্দার ব্যাপারেও শয়তান নানান রকম ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষের মনে পর্দার

ব্যাপারে কুণ্ঠা জাগিয়ে তোলে। এরূপ কয়েকটা ওয়াছওয়াছা ও তার উত্তর নিম্নে প্রদান করা গেল।

ওয়াছওয়াছা: পর্দা প্রথা সেকেলে প্রথা, পর্দা ব্যবস্থা সেকেলে ব্যবস্থা। আধুনিক যুগে এটা চলতে পারে না।

উত্তর: এক শ্রেণীর লোক –যারা নারীদেরকে অবাধে ভোগ করতে চায়, তারাই– পর্দার বিপক্ষে অপপ্রচার চালিয়ে নারী সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। তারা বলছে, পর্দা প্রথা সেকেলে প্রথা, পর্দা ব্যবস্থা সেকেলে ব্যবস্থা, আধুনিক যুগে এটা চলতে পারে না। এভাবে পর্দার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে তারা নারী সমাজকে পর্দার বাইরে এনে যেনার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়। এভাবেই এই শ্রেণীর লোকেরা অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের বহু স্থানকে আজ যেনার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

পর্দা সেকেলে ব্যবস্থা হলে এই আধুনিক যুগে চলতে পারবে না কেন? সেকেলে চন্দ্র-সূর্য, সেকেলে গ্রহ-নক্ষত্র যদি আধুনিক যুগে চলতে পারে, সেকেলে আসমান যমিন, সেকেলে আলো বায়ু যদি আধুনিক যুগে চলতে পারে, তাহলে সেকেলে পর্দা এখন চলতে পারবে না কেন? আহার নিদ্রা, হাগা মোতা, হাঁটা চলা, বলা, দেখা, ইত্যাদি হাজার লক্ষ সেকেলে ব্যবস্থা যদি আধুনিক যুগে চলতে পারে তাহলে সেকেলে পর্দা ব্যবস্থা এখন চলতে পারবে না কেন?

ওয়াছওয়াছা: পর্দা ব্যবস্থা নারী সমাজকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

উত্তর: এটাও ঐ শ্রেণীর লোকদের কথা যারা নারীদেরকে অবাধে ভোগ করতে চায়, আর এভাবে পর্দার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে তারা নারী সমাজকে পর্দার বাইরে এনে যেনার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়।

তারা যে বলছে পর্দা ব্যবস্থা অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, এই অন্ধকার বলতে তারা কী বোঝাতে চায়? অন্ধকার যুগ বোঝাতে চায়? তাহলে তারা শুনে রাখুক ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগকে বলা হয় অন্ধকার যুগ। ইসলাম তো সেই জাহেলী যুগের অন্ধকারকে দূর করেছে। অতএব ইসলামের যুগ অন্ধকারের যুগ নয়, বরং অন্ধকার অপসারণ করে আলো ছড়ানোর যুগ। ইসলামের যুগ আলোর যুগ। আর পর্দা ব্যবস্থা ইসলামের প্রবর্তন, তাই পর্দা ব্যবস্থা অন্ধকারের দিকে নয় বরং আলোর দিকে নিয়ে

www.maktabatulabrar.com

যায়। জাহেলী যুগ ছিল পর্দাহীনতার যুগ। আর জাহেলী যুগ হচ্ছে অন্ধকারের যুগ। অতএব পর্দা নয় বরং পর্দাহীনতাই মানুষকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

ওয়াছওয়াছা: পর্দা প্রথা জাতিকে পিছিয়ে দেয়। পর্দা উন্নতির অন্তরায়। নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, নারী পুরুষের কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে যাওয়া- এসবের ফলেই পাশ্চাত্য সমাজ উন্নতি করেছে।

উত্তর: এটা ভুল ব্যাখ্যা। পর্দা না করার সাথে জাগতিক উন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই। জাগতিক উন্নতি তথা অর্থনৈতিক উন্নতির সম্পর্ক হচ্ছে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, নিরলস শ্রম ইত্যাদির সাথে। পক্ষান্তরে অসততা তথা কর্মে ফাঁকি, দায়িত্বে অবহেলা, অলসতা ইত্যাদি হচ্ছে উন্নতির অন্তরায়। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা দ্বারা আসলে কোনো উন্নতি হয় কি? এর দ্বারা কি অর্থনীতির উন্নতি হবে? এর দ্বারা কি অফিস- আদালতের অনিয়ম দূর হবে? এর দ্বারা কি দুর্নীতি দূর হবে? এর দ্বারা কি কর্মদক্ষতা বাড়বে? এর দ্বারা কি কাজের নিষ্ঠা বাড়বে? এর দ্বারা কি দায়িত্ববোধ বাড়বে? একজন নারীকে অফিস-আদালতে উলঙ্গ করে রাখলে তাতে কি পুরুষদের কর্মের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে না কুকর্মের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে? একটু বিবেক দিয়ে মুক্তমনে চিন্তা করে দেখলে খুব সহজেই বুঝা যায় আসলে উন্নতি হয় নিষ্ঠা, সততা, দায়িত্ববোধ এইসব গুণের কারণে। এইসব গুণের দ্বারাই উন্নতি আসে। এগুলো তো ইসলামের শিক্ষা দেয়া নীতি। পশ্চিমারা এই ইসলামী শিক্ষা ও নীতি গ্রহণ করেছে, ফলে তারা উন্নতি করেছে। অথচ আমরা ভাবছি তারা উন্নত হয়েছে পর্দা বর্জন করার কারণে, উলঙ্গপনার কারণে। বস্তুত যেগুলো ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক উন্নতির মূলনীতি, সেগুলো অবলম্বন করার ফলেই তারা উন্নতি করেছে। আমরা মুসলমান জাতি সেসব অবলম্বন করছি না বিধায় উন্নতি করতে পারছি না।

ওয়াছওয়াছা: পর্দা মেনে চলতে গেলে যে দম আঁটকে মরে যেতে হবে!

উত্তর: যারা পর্দা মেনে চলছে তারা কি দম আঁটকে মরে যাচ্ছে? আলেম উলামা, পীর বুযুর্গ, দ্বীনদার পরহেযগার মানুষ যাদের স্ত্রীরা পর্দা করে তাদের কেউ পর্দা করার কারণে দম আঁটকে মরে গেছে বলে কোন খবর কোনোদিন পাওয়া গেছে কি?

ওয়াছওয়াছা: পর্দা করা আসলে খুব কঠিন। পর্দা মেনে চলা সম্ভব নয়।

উত্তর: যারা পর্দা মেনে চলছে তাদের পক্ষে কীকরে সম্ভব হচ্ছে? বরং যারা মেনে চলছে তাদের পক্ষে পর্দা লংঘন করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পর্দা মেনে চলতেই তাদের ভাল লাগে, পর্দা লংঘন করতে তাদের কাছে খারাপ লাগে। বুঝা গেল অভ্যাস করলে পর্দা বিধান মেনে চলা কষ্টকর থাকে না। যেমন শরীয়তের অন্যান্য আমল শুরু করার পর কষ্টবোধ লাঘব হয়ে যায়। আসলে নিজেকে যেভাবে অভ্যস্ত করানো যায়, তা-ই সহজ হয়ে যায় এবং ভাল লাগে।

ওয়াছওয়াছা: পর্দা মেনে চলতে গেলে ইচ্ছেমত এখানে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইচ্ছেমত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না। ফলে জীবনের আনন্দ-ফূর্তি সব শেষ হয়ে যাবে।

উত্তর: যারা পর্দা মেনে চলছে তাদের জীবন কি আনন্দহীন? বরং পর্দা মেনে চললে তাদের পারিবারিক জীবনের আনন্দ অটুট থাকে। নারীরা পর্দা না মেনে পর পুরুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশা করলে অনেক সময় স্বামীদের মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং তার থেকে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে অশান্তি আসে। পর্দা পারিবারিক জীবনে সন্দেহ সৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করে দেয়। দাম্পত্য জীবনের আনন্দকে অটুট রাখে। পক্ষান্তরে পর্দা লংঘন দাম্পত্য জীবনের আনন্দে চিড় ধরায়।

ওয়াছওয়াছা: পর্দা মেনে চলতে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তারা মনে করে সে বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। কারণ সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করা যায় না।

উত্তর: কোনো আত্মীয়-স্বজনকে খুশি করা বড় কথা নয়, বড় কথা আল্লাহ্‌কে খুশি করা। আল্লাহ্‌র হুকুম মানার কারণে যদি কোনো আত্মীয় অখুশি হয়, তাহলে সেই অখুশির কোনো পরওয়া করা চাই না। তাছাড়া কোন পরিবারে যখন পর্দার নিয়ম স্থায়ী হয়ে যায় তখন আত্মীয়-স্বজনও সেটাকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়। প্রথম পর্যায়ে পর্দা অপছন্দকারী আত্মীয়-স্বজন একটু মেনে নিতে ইতস্তত করলেও পরবর্তীতে তারাও তা মেনে নেয়।

ওয়াছওয়াছা: পর্দা করলে লাভ কী?

উত্তর: কিছু লাভের বর্ণনা তো আগেই গেল। তা ছাড়াও পর্দা ব্যবস্থায় আরও বহু লাভ রয়েছে। যেমন:

www.maktabatulabrar.com

১. পর্দা ব্যবস্থা দ্বারা নারী ও পুরুষ নিজেদেরকে যিনা ও ব্যভিচার থেকে হেফাজত করতে পারে। কেননা অনেক সময় পর্দাহীনভাবে পর নারী পুরুষের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ, হাসি-তামাশা ও অবাধ মেলামেশার ফলে বাস্তবেই অবৈধ মেলামেশা পর্যন্ত হয়ে যায়। পর্দায় থাকলে এ সমস্ত অঘটন হতে পারে না। পর্দা হচ্ছে নারীর সতীত্ব রক্ষার সবচেয়ে বড় উপায়।

২. পর্দা রক্ষা করলে স্বামী স্ত্রীর জীবনে সন্দেহ আসতে পারে না, স্ত্রীর মন অন্য কোনো পুরুষের দিকে যেতে পারে না, স্বামীর দিকেই তার সব দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। স্বামীও শরীয়তসম্মতভাবে চললে এবং পরনারীর প্রতি দৃষ্টি না দিলে তার মনও অন্য নারীর দিকে ঝুঁকতে পারে না বরং স্ত্রীর দিকেই তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকে। এভাবে পর্দার বিধান রক্ষা করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দৃষ্টি নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং তাদের ভালবাসা অটুট থাকে, তাদের জীবনে সন্দেহ দেখা দেয় না, তাদের পারিবারিক জীবন শান্তিময় থাকে।

৩. পর্দা করলে পূত-পবিত্র মেয়ে ও মহিলাদের প্রতি বাজে নোংরা লোকদের কুদৃষ্টি পড়তে পারে না।

৪. পর্দা ব্যবস্থা থাকলে সম্ভ্রান্ত ও বংশীয় নারী পুরুষের বংশ তালিকায় কোনো কলঙ্করেখা অঙ্কিত হতে পারে না। কোনো বাজে লোক কোনো মহিলার সন্তান সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে না এবং সন্তানের পিতা নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথা বলতে পারে যে, এ আমারই সন্তান, অন্য কারও সন্তান নয়। বেপর্দা মহিলা –যার পর্দাহীনভাবে পর পুরুষের সঙ্গে উঠাবসা বিদ্যমান– তার সন্তানের বেলায় এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে, এটি তার স্বামীরই পক্ষ থেকে সন্তান।

৫. পর্দা ব্যবস্থা দ্বারা পুরুষ ও নারী প্রত্যেকের অন্তর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র থাকে। পর্দাহীন চলাফেরায় যখন পুরুষ ও নারী একে অপরের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে, তখন শয়তান তাদের অন্তরে কুকথা উদয়ের সুযোগ পায়।

৬. পর্দা রক্ষা করে চললে নারীর চরিত্র নিয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে কোনো নারী যখন পর পুরুষের সঙ্গে

বেপর্দা চলাফেরা, খোলামেলা সাক্ষাৎ, হাসাহাসি ও রঙ্গতামাশা করে, তখন তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

ওয়াছওয়াছা: পর্দা হল মনের ব্যাপার; মন ঠিক থাকলে সব ঠিক।

উত্তর: এগুলো এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত লোকের কথা। পর্দা হল মনের ব্যাপার; মন ঠিক থাকলে সব ঠিক– এ কথা বলে তারা বুঝাতে চায় যে, মন ঠিক হয়ে গেলে আর বাইরের পর্দার দরকার হয় না। এটা একটা বিভ্রান্তিকর কথা। এটা পর্দা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা। পর্দা চেহারা ও শরীরের বিষয়, মনের বিষয় নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিবি এবং কন্যাদেরকে পর্দা করতে বলতেন, তাহলে কি তাদের মন ঠিক হয়েছিল না? নাউযু বিল্লাহ! মহিলা সাহাবীগণ পর্দা করেছেন, তাদের কি মন ঠিক হয়েছিল না? বুযুর্গ নারীরা পর্দা করেছেন তাদের কি মন ঠিক হয়েছিল না? এসব বিভ্রান্তিকর কথা বলে মানুষকে হয়তো চুপ করানো যাবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে পার পাওয়া যাবে না। কুরআন-হাদীছে কোথাও এ কথা নেই যে, মন ঠিক হয়ে গেলে পর্দার দরকার হয় না, মন ঠিক হয়ে গেলে পর্দার হুকুম উঠে যায়। বস্তুত পর্দা মনের বিষয় নয়, পর্দা হল শরীরের বিষয়, চেহারার বিষয়। মনের বিষয় হল সবর, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, ইখলাস প্রভৃতি।

ওয়াছওয়াছা: পর্দার বিষয়টাকে আমাদের হুজুররাই বেশি কড়া করে ফেলেছে। এ ব্যাপারে আমাদের হুজুররা বাড়াবাড়ি করে।

উত্তর: পর্দার কড়া নির্দেশ কুরআন-হাদীছেই এসেছে। হুজুররা তথা আলেমরা এ ব্যাপারে মোটেই বাড়িয়ে কিছু বলেন না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে সূরা আহযাবে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ.﴾

অর্থাৎ, (হে নারীগণ!) তোমরা গৃহের মধ্যে অবস্থান করবে, অজ্ঞ যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। (সূরা আহযাব: ৩৩)

উক্ত সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ.﴾

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। (সূরা আহযাব: ৫৯)

রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হত এবং চেহারার উপর তা ঝুলিয়ে দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে দেয়া হত। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- এই চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হত এবং মাথার উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে দেয়া হত।

এ দুই আয়াতসহ আরও কয়েকটি আয়াত ও একাধিক হাদীছের ভিত্তিতে পর্দা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। উলামায়ে কেরাম তা-ই বলেন, আরা এ ব্যাপারে মোটেই অতিরিক্ত কোন কড়াকড়ি বাড়াবাড়ি করেন না।

www.maktabatulabrar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক-চরিত্র বিষয়ে ওয়াছওয়াছা

www.maktabatulabrar.com

পঞ্চম অধ্যায়
আখলাক-চরিত্র বিষয়ে ওয়াছওয়াছা

বদ নজর ও যেনা প্রসঙ্গে ওয়াছওয়াছা

আমি (লেখক: মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন) নাখালপাড়া বাইতুল আতীক জামে মসজিদে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর (১৯৮৭-২০০৯) ইমামত করেছি। এই ইমামতকালে সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর জানার সুযোগ ঘটেছে। এ সময় অনেক মুসল্লী অনেক প্রশ্ন নিয়েই আমার কাছে আসতেন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীর মাসলা-মাসায়েলসহ পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি বহু বিষয়ে তারা সমস্যার সমাধান জানতে চাইতেন। তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারতাম কত লোকের মনে কত রকম প্রশ্নের উদয় হয়। এ পর্যায়ে একদিন এক ভাই আমাকে বললেন, হুজূর! মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, নারীদের রূপ-সৌন্দর্য দেখা নিষিদ্ধ হল কেন? নারীদের রূপ-সৌন্দর্য দেখার সময় যদি চিন্তা এই থাকে যে, আল্লাহর সৃষ্টি কী সুন্দর! কী অপূর্ব!! এই নিয়তে দেখলে তো আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মত ছওয়াব হওয়ার কথা; সেখানে উল্টো গোনাহ হয় কেন? আমি বললাম, মনের মধ্যে এই প্রশ্ন এনে দেয় নফ্‌ছ ও শয়তান। মনের মধ্যে এ প্রশ্ন উঠলে নফ্‌ছ ও

www.maktabatulabrar.com

শয়তানকে বলবেন, আল্লাহর এই কুদরতের চিন্তায় ডুব দিলে পরে যে ইয়ের মধ্যে ডুব দিতে মনে চাইবে, তখন ছওয়াব যাবে কোথায়? বুঝা গেল এটা ভাল চিন্তা নয়। যে চিন্তার পরিণাম ভাল সে চিন্তা ভাল। আর যে চিন্তার পরিণাম খারাপ সে চিন্তা খারাপ। যেমন, মনে করুন পড়ন্ত বেলায় সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য দেখছেন আর আল্লাহর কুদরতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ছেন, এদিকে কিন্তু আপনার মাগরিবেরর নামাযের জামাত ছুটে যাচ্ছে। আর খুব বেশি মগ্ন হলে তো শুধু জামাত নয় সমূলে নামাযই ছুটে যাবে। তাহলে এই চিন্তা আপাত দৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা বিধায় ভাল মনে হলেও পরিণাম কিন্তু ভাল হচ্ছে না। তাই এরূপ মুহূর্তে এমন চিন্তায় এভাবে মগ্ন হওয়া ঠিক হবে না। কিংবা মনে করুন নামাযের জন্য মানুষকে ডাকা ছওয়াবের কাজ। এই ছওয়াবের চিন্তায় এমনভাবে আপনি মগ্ন হলেন যে, মানুষকে ডাকতে ডাকতে আপনার জামাতই ছুটে গেল। তাহলে নামাযের জন্য মানুষকে ডাকার মত একটি ভাল চিন্তাও এভাবে চর্চা করার কারণে খারাপ প্রতিপন্ন হবে। অনেক সময় শয়তানই মানুষকে কোন একটা ভাল চিন্তার মধ্যে এমনভাবে মগ্ন করে দেয় যে, তার পরিণাম কোন একটা খারাবীর দিকে নিয়ে যায়। শয়তানের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা চাই। একটি নেক কাজের চিন্তায় যেন আর একটা গোনাহের পথ অবলম্বন করা না হয়। অন্যথায় তা হবে পাগড়ী বাঁধার ফযীলতের কথা চিন্তা করে লুঙ্গি খুলে পাগড়ী বাঁধার মত। সারকথা- নারীর রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হওয়ার মধ্যে ডুব দিলে যদিও আল্লাহর কুদরত দেখছেন ভেবে কাজটা ভাল মনে হবে কিন্তু এ চিন্তা আপনাকে খারাপ দিকে নিয়ে যাবে বিধায় তা ভাল নয়। মুসল্লী আমাকে বললেন, হুজূর! আসলে তো তাই। নারীদের সাথে কথাবার্তা ও নারীদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিণতি তো যেনার চিন্তা উদ্রেক হওয়া। তিনি উপযাচক হয়ে এ সংক্রান্ত তার নিজের একটা ঘটনা আমাকে শোনালেন যে, হুজূর! একবার ব্যাংকক গিয়েছিলাম। একদিন বিকেলে একটা পার্কে গিয়েছি। ঘুরতে ঘুরতে একটু নির্জন জায়গায় যাওয়ার পর একটা নারী আমার কাছে এসে আমার নামধাম পরিচয় জিজ্ঞেস করল। এক পর্যায়ে সে আমাকে বলে বসল, মিষ্টার হক! তোমার কি আমাকে প্রয়োজন আছে? হুজূর! বিশ্বাস করবেন, তখন আমার মনে হয়েছিল একবার না হয় একটু ইয়ে করলাম, পরিচিত কেউ তো আর জানছে না।

কিন্তু কীভাবে বিরত হলেন জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, ভাবলাম– বয়স হয়েছে, কখন মৃত্যুর ডাক আসে, না; এ দিকে যাব না। তবে মনের মধ্যে কৌতুহল ছিল, মনে হচ্ছিল বিদেশীনী, একটু ভিন্ন মজা হতে পারে। আমি বললাম, এভাবেই মনের মধ্যে পরকালের আযাবের ভয় জাগ্রত করলে এরূপ মুহূর্তে নিজেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়। এ ছাড়া এরূপ কৌতুহল দূর করার আরও একটা মনস্তাত্বিক পদ্ধতি আছে।

এ পদ্ধতিটি শুধু ঐ রকম পার্কের ঘটনার ক্ষেত্রেই নয় বরং যে কোনো সময় রাস্তা-ঘাটে, ঘরে-বাইরে যে কোনো স্থানে কোন নারীর প্রতি নজর যাওয়ার ফলে বা মনের মধ্যে কোন নারীর চিন্তা মন্থন করার ফলে যদি এই চিন্তা জাগ্রত হয় যে, ওকে যদি ইয়ে করতে পারতাম, ওর মধ্যে কী যেন আছে! তখন এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করতে হয়, তাহলে মনের ঐ চিন্তা দূর হয়ে যায়। পদ্ধতিটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«فَإِذَا رَأى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ الذي مَعَها مِثْلُ الَّذِي مَعَها.» (الترمذى عن جابر برقم ١١٥٨– حديث صحيح حسن غريب)

অর্থাৎ, যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে দেখে তার প্রতি মুগ্ধতা বোধ হয় তখন সে যেন তার স্ত্রীর কাছে গমন করে। কেননা ঔই নারীর সঙ্গে যা আছে তার স্ত্রীর সঙ্গেও তা আছে। (তিরমিযী: হাদীছ নং ১১৫৮) দুনিয়ার যে দেশেরই নারী হোক, সব নারীর ইয়েই এক রকম। অতএব কোনটির মধ্যে ভিন্ন স্বাদের কিছু নেই। এটা হল এক ওয়াছওয়াছা যে, ওর মধ্যে নতুন কী যেন আছে!

যেনার ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের পন্থা

এতক্ষণ যেনার ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের দু'টো পন্থার কথা বলা হল। ১. মনে আখেরাতের ভয় জাগ্রত করা। ২. এ কথা চিন্তা করা যে, ঔই নারীর যা আছে আমার স্ত্রীরও তা আছে, অতএব তার সঙ্গে যেনায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কোন স্বাদ নেই বরং গোনাহই গোনাহ। এছাড়াও বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন-হাদীছের আলোকে বলেছেন, নিম্নোক্ত পন্থাগুলো গ্রহণও যেনার খাহেশ থেকে মুক্তি লাভ করার ক্ষেত্রে ফায়দা দিবে।

www.maktabatulabrar.com

১. যেনার উপসর্গ যেমন: প্রেমালাপ, গোপন যোগাযোগ, ফোনে বা মোবাইলে আলাপ, গায়র মাহরামের সঙ্গে নির্জন বাস, পর্দা লংঘন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।
২. যেনার কারণে জাহান্নামের যে কঠিন শাস্তি হবে তা স্মরণ করা।
৩. একথা স্মরণ করা যে, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন, আমার এ অবস্থাও তিনি দেখবেন এবং কোনো মানুষ এখন না দেখলেও কিয়ামতের ময়দানে সকলের সামনে এটা প্রকাশ করে দেয়া হবে। তখন শরমের অন্ত থাকবে না।
৪. বিয়ে না করে থাকলে বিয়ে করে নেয়া। না পারলে রোযা রাখা।
৫. যেনার খাহেশ প্রবল হলে নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পড়ে শরীরে ফুঁক দেয়া।

﴿يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.﴾

৬. যে নারীর সাথে যেনার কামনা জাগে বা যে পরিবেশে যেনার সুযোগ সৃষ্টি হয় সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।
৭. যে নারীর সাথে যেনার কামনা জাগে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা যে, সে অত্যন্ত কুৎসিত, বিশ্রী চেহারার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত ইত্যাদি। এতেও মন থেকে তার সংগে যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেতনা হ্রাস পাবে।
৮. যেসব কথা শুনলে, যেখানে গেলে বা যা দেখলে কিংবা যা পড়লে অথবা যা চিন্তা করলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বা যেনার মনোভাব জাগ্রত হয় তা থেকে বিরত থাকা।

বদ নজরের ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের পন্থা

এতক্ষণ যেনার ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের বিস্তারিত পন্থা নিয়ে আলোচনা পেশ করা হল। নিম্নে বদ নজরের ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের বিস্তারিত উপায় শুনুন। বদ নজর থেকে পরিত্রাণের বিস্তারিত উপায় হল:

১. এ চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমার মনের অবস্থা দেখছেন এবং কিয়ামতের দিন এ নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তখন সবার সামনে লজ্জিত হতে হবে এবং এই পাপের দরুন জাহান্নামের আযাব হবে।

২. এই চিন্তা করবে যে, আমার আপনজনকে কেউ এভাবে দেখলে তো আমার অপছন্দ লাগে, তাহলে আমার দেখাটা কি তাদের অপছন্দনীয় নয়?

৩. এরপরও তাকে সুন্দর মনে হলে এবং নজর দিতে মনে চাইলে তাকে কুৎসিত কল্পনা করবে।

৪. হিম্মত এবং এরাদা করবে যে, এ থেকে বিরত থাকব। আর হঠাৎ নজর পড়ে গেলে তার থেকে নজর ফিরিয়ে নিলে কলবে নূর পয়দা হয়– এই ফিকির রাখবে।

অবৈধ প্রেম করার ওয়াছওয়াছা

যৌবনে কোন নারীর সাথে প্রেম করার ওয়াছওয়াছায় আক্রান্ত হওয়া যুবকের সংখ্যা একেবারে কম নয়। অনেক যুবক সুন্দর বালকের সঙ্গে প্রেম করার ওয়াছওয়াছায়ও আক্রান্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় শয়তান বোঝায় বা শয়তানের শেখানো মোতাবেক শয়তানের দোসররা বোঝায় যে, প্রেম করা খারাপ হবে কেন, প্রেম তো একটা পবিত্র জিনিস! প্রেম তো হচ্ছে স্বর্গীয় জিনিস, এটাকে খারাপ বলা যায় না। কিন্তু এই পবিত্র (?) প্রেমের পরিণাম যে অপবিত্র কর্মকাণ্ডের দিকে গড়ায় তা কি অস্বীকার করা যাবে? তাহলে তা আর পবিত্র থাকল কৈ? আর প্রেমের স্বর্গীয় হওয়ার বক্তব্য হিন্দুরা দিতে পারে। কারণ তাদের স্বর্গে নাকি তাদের দেবতারা মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যাদের নিয়ে মনোরঞ্জন ও তাদের সঙ্গে ইয়ে সিয়ে করে। মুসলামরা এরূপ ধারণায় বিশ্বাসী নয়। অতএব মুসলমানরা এরূপ বলতে পারে না।

যাহোক কোন নারী বা সুন্দর বালকের অবৈধ প্রেমে পড়লে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যা যা করতে হবে তা হল–

১. প্রথমত বুঝতে হবে যে, সাহস, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা ব্যতীত কোনো সহজ কাজও হয় না। শরীরের সামান্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে গেলেও তিতা ওষুধ সেবন করতে হয়। জাহিরী রোগের যখন এই অবস্থা, তখন বাতিনী তথা অভ্যন্তরীণ রোগের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে।

২. যার প্রেমে পড়া গেছে তার সাথে কথা-বার্তা, দেখা-শোনা, আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। অন্য কেউ তার আলোচনা করলে তাকে

www.maktabatulabrar.com

বাধা দিতে হবে এবং লৌকিকভাবে হলেও যার প্রেমে পড়া গেছে পরিকল্পিতভাবে এক এক বাহানায় তার সমালোচনা করতে থাকবে।

৩. একটা নির্জন সময়ে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে আতর ও সুগন্ধি মেখে দুই রাকআত তওবার নামায (আহকামে যিন্দেগী দ্রষ্টব্য।) পড়বে এবং কেবলামুখী অবস্থায় বসে খুব তওবা-এস্তেগফার করে এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করবে এবং পাঁচশত থেকে এক হাজার বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এর যিকির করবে। লা-ইলাহা বলার সময় ঘাড় ডান দিকে ঘুরাবে এবং এই ধ্যান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকে অন্তর থেকে বের করে দিলাম। অতঃপর ইল্লাল্লাহ বলার সময় বাম স্তনের সামান্য নিচের দিকে খেয়াল করে মাথা সেদিকে স্বজোরে ঝুঁকাবে আর ধ্যান করবে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত অন্তরে গেঁথে দিলাম। এরূপ খেয়াল করা দ্বারা মনের উপর আছর পড়বে। মনের উপর গভীর খেয়ালের আছর হয়ে থাকে। উল্লেখ, এটা বুযুর্গানে দ্বীনের পরীক্ষিত আমল, কুরআন হাদীছে বর্ণিত কোন বিষয় নয়।

৪. দোযখের বর্ণনা এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কারণে আল্লাহ কিরূপ অসন্তুষ্ট হন– এ জাতীয় বর্ণনা যে কিতাবে আছে এমন কোন কিতাব বা হাদীছের গ্রন্থ পাঠ করবে।

৫. একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্জনে বসে এ চিন্তা করবে যে, আমি কিয়ামতের ময়দানের আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান রয়েছি আর আল্লাহ আমাকে ধমক দিয়ে বলছেন, "হে বেহায়া, বেশরম! তোমার লজ্জা হয় না, আমাকে ছেড়ে একটা মুরদার দিকে ঝুঁকে পড়লে? এর জন্য তোমাকে আমি পয়দা করেছিলাম? বেহায়া, আমার দেয়া চোখ আমার দেয়া অন্তরকে তুমি আমার নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করলে? তোমার শরম হয় না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বি. দ্র. এসব আমল করতে থাকবে, ফল পেতে দেরি হলেও পেরেশান হবে না। চেষ্টাতেও তো ছওয়াব পাওয়া যাবে।

হস্তমৈথুন করার ওয়াছওয়াছা

যেসব ছেলেরা আল্লাহর ভয়ের কারণে বা পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক ও পরিবেশগত বাধা কিংবা গুরুজনদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে যেনা করতে পারে না, বা শয়তান তাদেরকে যেনার প্রতি অগ্রসর করতে

পারে না, শয়তান তাদেরকে হস্তমৈথুনের প্রতি উৎসাহিত করে। অনেক সময় উত্তেজক খাদ্য-খাবার গ্রহণের কারণেও যৌন-চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আর স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সেই চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা না থাকায় হস্তমৈথুনকেই বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেয়া হয়। তাই যাদের বিয়ে হয়নি তাদের শারীরিক বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে উত্তেজক খাদ্য-খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া চাই। এরপরও যদি নফ্ছ ও শয়তানের পক্ষ থেকে কখনও হস্তমৈথুনের ওয়াছওয়াছা হয়, তাহলে মনকে এই বলে বোঝানো যে, এভাবে আমার যৌন-শক্তি অপচয় করলে ভবিষ্যতে বৈবাহিক জীবনে স্ত্রীর কাছে অপারগ হয়ে পড়তে পারি, তাহলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। মনকে আরও বোঝাতে হবে হস্তমৈথুন করলে লিঙ্গ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাঁকা হয়ে যেতে পারে, আকারে ছোট হয়ে যেতে পারে, নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে। আর একবার এরূপ কোন অসুবিধা দাঁড়িয়ে গেলে ডাক্তার হেকিম কবিরাজদের দারস্থ হলেও কোনো প্রতিকার হবে না। তাহলে এই হস্তমৈথুন ভবিষ্যতে বৈবাহিক জীবনে অপার আনন্দ থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে মনকে বোঝালে হস্তমৈথুনের চেতনা হ্রাস পাবে। তারপরও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে মাঝে মধ্যে নফল রোযা রাখবে, তাতেও উত্তেজনা হ্রাস পাবে। যেসমস্ত জিনিস দেখলে বা যা শুনলে বা যা পাঠ করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে তা থেকে বিরত থাকবে।

নেশার ওয়াছওয়াছা

শয়তান নেশায় অভ্যস্ত করানোর জন্যও ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে। সেই ওয়াছওয়াছা হয় এরূপ– একদিন সিগারেটে একটা টান দিয়ে দেখি না কেমন লাগে? একবার না হয় মদের এক চুমুক খেয়ে দেখি? গাঁজা, আফিম, মরফিন, হেরোইন ইত্যাদি কোন্টা কেমন তা একদিন পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? নফ্ছ বলে একবার পরীক্ষা করে দেখলেই কি তুমি অভ্যস্ত হয়ে উঠবে নাকি? অভ্যস্থ হতে তো দীর্ঘ চর্চার দরকার, তুমি দীর্ঘ চর্চায় যেয়ো না, একবার শুধু টেস্ট করে দেখ না? এভাবে নফ্ছ ও শয়তান মনের মধ্যে একবার পরীক্ষা করার কৌতুহল জাগিয়ে তোলে। তারপর এরূপ কৌতুহল বশত একবার নেশাদ্রব্য গ্রহণ করেই অনেকে স্থায়িত্বের দিকে চলে যায়। কিংবা একবারে স্থায়িত্বের দিকে না গেলে পরে

www.maktabatulabrar.com

মনের মধ্যে কৌতুহল জাগায় আরে একবারে কি কোনকিছুর স্বাদ পূর্ণ বুঝা যায়? কয়েকদিন খেলেই বুঝা যায় আসল স্বাদ। কয়েকদিন খেয়ে দেখি না আসলে ওটা কেমন? মনের মধ্যে এরূপ কৌতুহল জাগলে মনকে বলতে হবে, যেটা সকলেই খারাপ বলছে সেটা পরীক্ষা করার এমন কী প্রয়োজনটা দেখা দিল? আমি কি দুনিয়ার সবকিছু পরীক্ষা করার জন্য আমার মুখ ও পেটকে ল্যাবরেটরি বানিয়েছি? তাহলে তো একবার গু-ও খেয়ে দেখতে হয় তার স্বাদটা কেমন? রক্ত, পূজ, পেশাব, ড্রেনের পঁচা পানি সবকিছুই একবার খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কোন্টার স্বাদ কেমন! নাউযু বিল্লাহ!

কারও কারও ক্ষেত্রে এমন হয় যে, সে কোন মানসিক বিপর্যয়ে পড়েছে, কিংবা কোথাও মারাত্মক ধরনের মানসিক আঘাত পেয়েছে, কিংবা দুঃখ পেয়েছে আর শয়তান তাকে বোঝাল যে, নেশা করলে সব দুঃখ ভুলে যাবে। ব্যস সে দুঃখ ভুলে থাকার জন্য নেশা করতে আরম্ভ করল। কিন্তু ভেবে দেখল না নেশার ঘোর কাটার পর তো আবার দুঃখের কথা স্মরণ হবে। তাহলে নেশা দ্রব্যের মধ্যে দুঃখ ভোলানোর ক্ষমতা কৈ? বস্তুত নেশা দ্রব্যের মধ্যে দুঃখ ভোলানোর কোন ক্ষমতা নেই। নেশা করলে চেতনা লোপ পায় তাই তখন দুঃখ সুখ কোন চেতনাই থাকে না, ফলে মনে হয় নেশার মধ্যে দুঃখ-কষ্ট ভোলানোর ক্ষমতা আছে। অতএব দুঃখ কিছুক্ষণের জন্য ভুলতে না পারলে যদি জীবন যাওয়ারই উপক্রম হয়, তাহলে নেশা না করে ঘুমানোর পন্থা গ্রহণ করুন। এভাবেও আপনার চেতনা কিছুক্ষণের জন্য লোপ পাবে আর ততক্ষণের জন্য আপনি দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবেন। এর চেয়ে ভাল পন্থা হল যিকির শুরু করুন, কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকুন। এটাই হচ্ছে মানসিক দুঃখ-কষ্ট থেকে স্বস্তি লাভের ও মানসিক অশান্তি লাঘবের সবচেয়ে ভাল পন্থা। আত্মা হচ্ছে আল্লাহর খাস নির্দেশঘটিত একটা জিনিস, আল্লাহর স্মরণেই সে পরিতৃপ্তি বোধ করে। আল্লাহর স্মরণের আত্মিক খোরাক দিয়ে আত্মাকে শান্তি বোধ করানো যায়।

নেশার ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের পন্থা

কেউ মদ, গাজা, ভাং, আফিম, হেরোইন প্রভৃতি যেকোনো নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এমনিভাবে অশ্লীল উপন্যাস, কবিতা ও নভেল নাটক পাঠ, সিনেমা, বাইস্কোপ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন, বিড়ি সিগারেট প্রভৃতির নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়লে তা থেকে উদ্ধার লাভ করা বেশ

কঠিন। তবে নিম্নোক্ত পন্থাগুলো গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে উদ্ধার লাভ হবে ইনশা আল্লাহ।

১. প্রথমত যেসব নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়া গেছে সেগুলোর মন্দ ও ক্ষতিকর দিকগুলো মনে বদ্ধমূল করতে হবে এবং মনে সেগুলোর প্রতি ভয়, আতংক ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

২. যেকোনো নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাই ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে অল্প অল্প করে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৩. নিজের কাছ থেকে নেশার উপকরণ, পাত্র, তৈজসপত্র, গান-বাদ্যের উপকরণ, অশ্লীল বইপত্র ইত্যাদি দূরে সরিয়ে দিতে হবে বা এসব উপকরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, যতদিন মন থেকে নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে না যায়, ততদিন এরূপ করা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. সবচেয়ে বড় কথা মানুষ ইচ্ছা ও সাহস করলে অনেক কঠিন কিছুও করে ফেলতে পারে– মনে এরূপ ইচ্ছা ও সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে।

প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে ওয়াছওয়াছা

শয়তান মানুষকে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে ওয়াছওয়াছা দিয়ে তার দ্বারা অনেক বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে দিয়ে থাকে। এমনকি হত্যাকাণ্ডে পর্যন্ত জড়িয়ে দেয়। প্রতিশোধ স্পৃহা উস্কে দেয়ার জন্য মনের মধ্যে শয়তান সাধারণত যে চেতনাগুলো জাগ্রত করে দেয় তার মধ্যে রয়েছেঃ

- ওকে দেখিয়ে ছাড়ব, ও লোক চেনেনি!
- পথের কাটা সাফ করে ফেলতে হবে। ও আমার পথের কাটা, এই কাটা সাফ করেই ফেলব।
- অনেক সময় মানুষ দুঃখে ক্ষোভে বলে থাকে, "ও আমার কোনো কথা মানেনি, কোনো নিষেধ শোনেনি, ও গোল্লায় যাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।" এটাও কিন্তু এক ধরনের বদ-দুআ। এটাও কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের চেতনা থেকেই উৎসারিত। এটাও শয়তানেরই ওয়াছওয়াছা, শয়তানই মনের মধ্যে এরূপ চেতনা উস্কে দিয়ে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

- অনেক সময় কারও মধ্যে প্রতিপক্ষ থেকে শারীরিকভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি না থাকলে কিংবা ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে সেরূপ প্রতিশোধ নিতে না পারলে সে বলে থাকে, "ও আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, ওর জন্য আমি মুখে বদ-দুআ না করলেও আমার হাড়ে হাড়ে ওর জন্য বদ-দুআ করে।" একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে ধরা পড়বে এরূপ কথাও কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের চেতনা থেকেই উৎসারিত। মনে রাখতে হবে– ব্যক্তিগত কারণে কৃত সব বদ-দুআই প্রতিশোধ গ্রহণের চেতনা থেকে উৎসারিত।

প্রতিশোধ গ্রহণের চেতনাকে অন্য শব্দে বলা হয় রাগ বা গোস্বা। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে বলে রাগ বা গোস্বা। এই রাগ বা গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে না, তখন মুখ দিয়েও অনেক অন্যায় কথা বের হয়ে যায়। আবার রাগের মধ্যে অনেক অন্যায় কাজও ঘটে বসে, যার পরিণামে অনেক ক্ষতি ও লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। রাগ স্বভাবগত বিষয়, এর জন্য মানুষ দায়ী নয়। তবে রাগ চরিতার্থ করা না করা মানুষের ইচ্ছার অধীন, তাই এর জন্য সে দায়ী। নিম্নে রাগ দমনের জন্য বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যেসব পন্থা বলেছেন সেগুলো উল্লেখ করা হল।

রাগ দমনের পন্থাসমূহ

১. রাগ হলেই " আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম" পড়ে নেয়া।

২. "লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়া।

৩. যার উপর রাগ হয় তাকে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেয়া বা নিজে অন্যত্র সরে যাওয়া।

৪. তারপর এ চিন্তা করা যে, সে আমার নিকট যতটুকু অপরাধী, আমি আল্লাহ্র নিকট তার চেয়ে বেশি অপরাধী। আমি যেমন চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন আমারও তেমনি উচিত তাকে ক্ষমা করা।

৫. এতেও রাগ না গেলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে।

৬. তাতেও রাগ না গেলে ঠাণ্ডা পানি পান করবে বা উযূ কিংবা গোসল করে নিবে।

৭. এই চিন্তা করবে যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। অতএব আমি আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার কে?

৮. স্বভাবগতভাবে যিনি বেশি রাগী, তার রাগ দমনের পন্থা হল– যার উপর রাগ হয় রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর জনসমক্ষে তার হাত পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার জুতো সোজা করে দিবে। দু'একবার এরূপ করলেই রাগের হুশ ফিরে আসবে।

বি. দ্র.: রাগ সবস্থানেই নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েয বরং জরুরি হয়ে পড়ে। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে রাগ শক্তির ব্যবহার করা অনেক সময় ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। আর রাগ দমন করার গুণটি তথা সবর যখন স্বভাবে পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে তখন সেটাকে বলা হয় সহনশীলতা। আল্লাহ্র নিকট এই সবর ও সহনশীলতার গুণ অনেক পছন্দনীয়। সবরের পুরস্কার হল জান্নাত।

মানুষের সাহায্য বা উপকারে এগিয়ে না যাওয়ার ওয়াছওয়াছা

মানুষ যেন অন্যের সাহায্যে বা অন্যের উপকারে এগিয়ে না যায় সেজন্য শয়তান মনের মধ্যে কিছু চেতনা উদ্রেক করে দিয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে সে চেতনাগুলো যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো যুক্তিযুক্ত নয়। অধিকন্তু তা শয়তানের ওয়াছওয়াছা। কারণ সেই চেতনাগুলো উস্কে দিয়েই শয়তান মানুষকে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া বা অন্যের উপকারে এগিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। এ জাতীয় চেতনার মধ্যে রয়েছে:

● এই চেতনা যে, নিজে বাঁচলে পরে বাপের নাম। নিজেরটা আগে দেখতে হবে, পরের কী হল তা দেখার সময় নেই। এটা শয়তানের উস্কে দেয়া চেতনা। প্রত্যেকেই যদি নিজেরটাই দেখে অন্যেরটা না দেখে তাহলে তো দুনিয়া একটা অসামাজিক ও নিষ্ঠুর গারদখানায় পরিণত হবে। আপনি চিন্তা করে দেখুন তো আপনার বিষয়টা কেউ যদি উপেক্ষা করে তাহলে কি তা আপনার কাছে ভাল লাগবে? নিশ্চয় না। তদ্রূপ আপনি অন্যেরটা না দেখলে তার কাছেও খারাপ লাগবে। এভাবে সমাজের লোকদের মাঝে পরস্পরে দূরত্ব সৃষ্টি হবে, অসামাজিকতা সৃষ্টি হবে। অতএব নিজেরটা পূরোপুরি উসূল না হওয়া পর্যন্ত অন্যেরটার ব্যাপারে অহযোগী মনোভাব পোষণ করা আদৌ কাম্য নয়।

www.maktabatulabrar.com

● এই চেতনা যে, আমি কেন ওকে সাহায্য করব, ও আমাকে সাহায্য করেছিল? আমি কেন ওর উপকার করব, ও আমার উপকার করেছিল? এটাও শয়তানের উস্কে দেয়া চেতনা। একটু ভেবে দেখুন তো আপনি ওকে সাহায্য করলেন না বা উপকার করলেন না এই যুক্তিতে যে, সে আপনাকে সাহায্য করেনি বা সে আপনার উপকার করেনি। তাহলে সে যে আপনাকে সাহায্য করেনি বা উপকার করেনি তারও তো যুক্তি এই থাকতে পারে যে, আপনি তাকে সাহায্য করেননি বা তার উপকার করেননি। বস্তুত প্রত্যেকেই যদি আগে সাহায্য পেয়ে তারপর সাহায্য করতে চায়, আগে উপকার পেয়ে তারপর উপকার করতে চায়, তাহলে কেউই কাউকে সাহায্য করতে পারবে না, কেউই কারও উপকার করতে পারবে না। কারণ, কে প্রথম সাহায্য করবে? সে তো সাহায্য পায়নি। কে প্রথম উপকার করবে? সে তো উপকার পায়নি। অতএব আমি কেন ওকে সাহায্য করব, ও আমাকে সাহায্য করেছিল? আমি কেন ওর উপকার করব, ও আমার উপকার করেছিল? এগুলো শয়তানী ওয়াছওয়াছা তো আছেই অযৌক্তিকও বটে। মনে রাখতে হবে কেউ সাহায্য করলে তার ভিত্তিতে তার সাহায্য করা এটা মহানুভতা নয়, এটা হচ্ছে বদলা প্রদান। এমনিভাবে কেউ উপকার করলে তার ভিত্তিতে তার উপকার করা সেটাও মহানুভবতা নয় সেটাও হচ্ছে বদলা প্রদান। মহানুভবতা এবং উদারতা হচ্ছে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাহায্য করা, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপকার করা। বরং কেউ অপকার বা ক্ষতি করার পরও তার সাহায্য ও উপকার করা হচ্ছে অতি মহানুভবতা। যারা মহামানব তাদের চরিত্র এমনই হয়ে থাকে। এমন মহামানবীয় চরিত্রই শিক্ষা দেয়া হয়েছে হাদীছে। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরক কয়েকটি ইরশাদ করেছেন,

«صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ.»

(قال الهيثمي: رواه أحمد وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات.)

অর্থাৎ, যে তোমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে রাখ। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দাও। যে তোমার প্রতি জুলুম করে তুমি তার সঙ্গে জুলুম করা থেকে এড়িয়ে চল। (মুসনাদে আহমদ)

আখলাক-চরিত্র বিষয়ক আরও বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াছওয়াছা

শয়তান অখলাক-চরিত্র বিষয়ক যেসব ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে তার মধ্যে রয়েছে রিয়া, প্রশংসা ও যশ-প্রীতি, তাকাব্বুর বা অহংকার, উজ্‌ব বা আত্মগর্ব। এসব বিষয়ে পূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অধীনে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ক আরও কিছু ওয়াছওয়াছা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

বুখ্‌ল বা কৃপণতার ওয়াছওয়াছা

শরীআতের আলোকে যেখানে ব্যয় করা জরুরি বা মানবিক কারণে যেখানে ব্যয় করা জরুরি, সেখানে ব্যয় করতে সংকীর্ণতা করাকে বলা হয় বুখ্‌ল বা কার্পণ্য। প্রথম স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ আর শেষোক্ত স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ নয় তবে খেলাফে আওলা বা অনুত্তম। এই কৃপণতা এত খারাপ জিনিস যে, এর কারণে অনেক ফরয ওয়াজিব পর্যন্ত আদায় হয় না। যেমন: যাকাত দেয়া, কুরবানী করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা ইত্যাদি আদায় না হওয়া। এগুলো হল দ্বীনী ক্ষতি। আর কৃপণকে সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, এটা হল পার্থিব একটা বড় ক্ষতি। শয়তান মানুষকে দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় রকম ক্ষতির সম্মুখীন করার জন্য বুখল বা কৃপণতার ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে এই বলে যে, ব্যয় করলে সম্পদ কমে যাবে, ভবিষ্যতে সম্পদ অর্জিত হবে তার গ্যারান্টি নেই, অতএব সম্পদ ধরে রাখার জন্য ব্যয় সংকোচন করা চাই।

এ ওয়াছওয়াছার প্রতিকার হল:

১. সম্পদের প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ তাআলা। আমরা সম্পদের প্রকৃত মালিক নই। আমাদের মালিকানা হচ্ছে প্রতিনিধিত্বশীল মালিকানা। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মালের মালিক, মূল মালিক তিনি। অতএব মূল মালিক যেখানে ব্যয় করতে বলেছেন সেখানে ব্যয় করতে কুণ্ঠা বোধ করার প্রশ্ন উঠবে কেন? একজন কোম্পানীর মালিক যদি তার ক্যাশিয়ারকে অর্থ ব্যয় করতে বলে, তাহলে সেই ক্যাশিয়ার মালিকের হুকুম মোতাবেক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করতেও যেমন কুণ্ঠা বোধ করে না এই ভেবে যে, মূল মালিক যেখানে ব্যয় করতে বলেছেন সেখানে আমার কুণ্ঠা বোধ করার কী আছে? তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা আমাদের সম্পদের মূল

www.maktabatulabrar.com

মালিক, তিনি যেখানে ব্যয় করতে বলেছেন, সেখানে ব্যয় করতে কুণ্ঠা বোধ করা তথা বখীলী করার কী আছে?

২. মনে করতে হবে যে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন, তাঁর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করলে তিনি বঞ্চিত করবেন তা হতে পারে না। আর যদি একান্তই আমার সম্পদ কমে যাওয়া আল্লাহ ভাল মনে করেন, তাহলে তাতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

৩. প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মনে না চাইলেও মনের উপর জোর দিয়ে সেটা কাউকে দিয়ে দেয়া। কৃপণতা দূর না হওয়া পর্যন্ত এরূপ করতে থাকা।

এশ্‌রাফে নফ্ছের ওয়াছওয়াছা

কারও থেকে কিছু পাওয়ার আশায় এমনভাবে অপেক্ষায় থাকা যে, তা না পেলে মন খারাপ হয়ে যায় এবং যার থেকে পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল তার প্রতি রাগ জন্মে, এটাকে বলা হয় এশ্‌রাফে নফ্ছ। এ-ও এক প্রকারের হির্‌ছ বা লোভ। চরিত্র নষ্ট করার জন্য শয়তান মানুষের মনে এই এশরাফ জাগিয়ে তোলে। এটা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হওয়ার কারণে নিন্দনীয়। মনের মধ্যে তাওয়াক্কুলের চেতনা জাগ্রত করলে এশরাফে নফছ সংক্রান্ত ওয়াছওয়াছা দূরীভূত হবে। সম্পদের হিরছ বা লোভ দূরীভূত করলেও এশরাফে নফছ সংক্রান্ত ওয়াছওয়াছা দূরীভূত হবে।

তবে উল্লেখ্য যে, শুধু যদি পাওয়ার চিন্তা মনে উদয় হয় কিন্তু না পেলে মনে কষ্ট আসে না বা তার প্রতি রাগ জন্মে না, তাহলে এতটুকু গর্হিত নয়। (কেননা এতটুকু স্বভাবগত বিষয়।) এমনিভাবে কোন পেশাদার যে গ্রাহকের অপেক্ষায় থাকে তাও এশ্‌রাফে নফ্ছের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন: ডাক্তার রোগীর অপেক্ষায় থাকে ইত্যাদি।

বুগ্‌য (বিদ্বেষ/মনোমালিন্য) ও স্বভাব সংকোচনের ওয়াছওয়াছা

রাগ চরিতার্থ করতে না পারলে রাগ দমনের দ্বারা মনের মধ্যে ক্ষোভ, মনস্তাপ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং অন্যভাবে তার প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা ও অন্যভাবে তাকে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস জাগে। এই প্রয়াস বা মনোভাবকে বলা হয় বুগ্‌য বা কীনা। চরিত্র নষ্ট করার জন্য শয়তান মনের মধ্যে প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা ও অন্যভাবে তাকে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস

জাগিয়ে তোলে। তাকে ক্ষমা না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

বুগ্য বা কীনা রোগের প্রতিকার হল:

১. যার প্রতি বিদ্বেষ হয় তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

২. মনে না চাইলেও তার সাথে মেলামেশা অব্যাহত রাখা।

তবে উল্লেখ্য যে, যদি অন্যভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব জাগ্রত না হয় কিংবা সেরূপ উদ্যোগ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা না আসে বরং রাগের কারণে মনের মধ্যে শুধু একটা সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয় এবং যার উপর রাগ হয় তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে মন না চায়, তাহলে সেটাকে বলে ইন্‌কিবাযে তব্‌য়ী বা 'স্বভাব সংকোচন'। সেটা নিন্দনীয় নয়। কারণ সেটা স্বভাবগত বিষয়, যা ইচ্ছার অধীন নয়। তবে কারও ব্যাপারে স্বভাবের মধ্যে সংকোচন ভাব আসলে সেটা দূর করার জন্য কখনও কখনও এই ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে যে, তাকে বলে দিবে, আপনার এই কথা বা আচরণে আমার কষ্ট লেগেছে। এতে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, বিদ্বেষ ও শত্রুতা যদি পার্থিব কোন বিষয়ের কারণে হয় তবেই তা নিন্দনীয় ও গর্হিত। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান দ্বীনের কারণে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যদি কারও সাথে বিদ্বেষ বা শত্রুতা রাখে তবে তা নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম।

হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা)-এর ওয়াছওয়াছা

কারও জ্ঞান, বুদ্ধি, সম্পদ, মান-ইজ্জত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি ভাল কিছু দেখে মনে কষ্ট লাগা এবং আকাংখা হওয়া যে, সেটা না থাকুক বা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তা হলেই মনে আনন্দ লাগা– এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা)। সাধারণত তাকাব্বুর (নিজের বড়ত্ববোধ) বা শত্রুতা থেকে এই মনোভাব সৃষ্টি হয় কিংবা কারও মন যদি খবীছ হয়, তাহলেও এই মনোবৃত্তি জাগতে পারে। শয়তানই এরূপ মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। হাছাদের চেতনা দূর করার জন্য কয়েকটা জিনিস ভাবতে হবে। যথা:

১. হাছাদের কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হতে হয়।

www.maktabatulabrar.com

২. হিংসুক ব্যক্তি চিরকাল মনের কষ্টে কাল যাপন করতে থাকে, জীবনে কখনও মনে শান্তি পায় না।

৩. যার প্রতি হাছাদ বা হিংসা হয়, মনে না চাইলেও লোক সমাজে তার প্রশংসা করা।

৪. যার যে নেয়ামতের কারণে হাছাদ হয়, সেটা তার জন্য আরও বৃদ্ধি পাক আল্লাহ্‌র কাছে এই দু আ করতে থাকা।

৫. মনে না চাইলেও দেখা হলে তাকে সালাম করা, তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো এবং নম্র ব্যবহার করা।

৬. মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া প্রদান করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, কারও ভাল কিছু দেখে সেটা ধ্বংসের কামনা না করে শুধু নিজের জন্য অনুরূপ হয়ে যাওয়ার কামনা করা গর্হিত নয় বরং এরূপ কামনা করার ক্ষেত্রে মাসআলা হল সেটা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয় হলে এরূপ কামনা করা ওয়াজিব, মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে মোস্তাহাব আর মোবাহ পর্যায়ের হলে মোবাহ। এটাকে হাছাদ নয় বরং 'গেবতা' বলা হয়।

হাছাদ সংক্রান্ত ওয়াছওয়াছা দূরীভূত করার পদ্ধতি হল:

বি. দ্র.: কোন কাফের, মুরতাদ, ফাসেক ও বেদআতী লোকের কোন বিষয়-সম্পদ ও নেয়ামত অর্জিত হলে এবং সে তা দ্বারা ফেতনা ফাসাদ ও দ্বীনের ক্ষতি করতে থাকলে তার সে সম্পদ ও নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কামনা করা নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন অবস্থায় তা উত্তম ইবাদত বলে গণ্য হয়।

বদগোমানী বা কু-ধারণার ওয়াছওয়াছা

যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ ও নেককার বলে মনে হয়, তাদের সম্পর্কে কোনো দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কুধারণা পোষণ করা হারাম ও গোনাহে কবীরা। শয়তানই মানুষের মধ্যকার সু-সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য অন্যের প্রতি অহেতুক বদ-গোমানী সৃষ্টি করে থাকে। এক পর্যায়ে এই বদগোমানী রোগে পরিণত হয়।

বদগোমানী রোগের প্রতিকার হল:

১. নির্জনে বসে এই চিন্তা করা যে, দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারও প্রতি কু-ধারণা পোষণ করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন। এটা করলে

আল্লাহ্র আযাবের আশংকা রয়েছে। হে নফছ, তুমি কীভাবে আযাব বরদাশ্ত করবে! কুরআনের কথা স্মরণ রাখ–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয় কতক ধারণা পাপ। (সূরা হুজূরাত: ১২)

২. তওবা করবে।

৩. আল্লাহ্র নিকট অন্তর সাফ হয়ে যাওয়ার জন্য দুআ করবে।

৪. যার প্রতি কু-ধারণা হয়েছে তার উভয় জগতের কামিয়াবী ও সুখ-শান্তির জন্য দুআ করবে।

৫. কিছুদিন উপরোক্ত আমলসমূহ করার পরও যদি মন থেকে কু-ধারণা না যায়, তাহলে যার প্রতি কু-ধারণা হয়েছে তাকে যেয়ে বলবে, অহেতুক আপনার প্রতি আমার বদগোমানী হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য দুআ করুন যেন আমার মন থেকে এটা দূর হয়ে যায়।

অপব্যয়ের ওয়াছওয়াছা

শরীআতের আলোকে যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষেধ সে ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বলা হয় তাব্যীর বা অপব্যয়। অপব্যয় করা গোনাহে কবীরা। গোনাহে লিপ্ত করার জন্যই শয়তান অপব্যয়ের ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে। শয়তানই যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষেধ সে ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে খুব আকর্ষণীয় করে দেখায়। সেই আকর্ষণে মানুষ অপব্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। নিম্নের চিন্তাগুলো জাগ্রত করলেই অপব্যয়ের ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

১. কুরআনে কারীম অপব্যয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' বলে আখ্যায়িত করেছে। কাজেই আমি অপব্যয় করে শয়তানের ভাই হতে চাই না।

২. অপব্যয় করা গোনাহে কবীরা। আমি নিজের পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা অর্থ গোনাহে ব্যয় করে নিজের শাস্তি ডেকে আনার মত বোকামী আর কী হতে পারে?

অমিতব্যয়ের ওয়াছওয়াছা

যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা জায়েয সেসব ক্ষেত্রেও প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাকে বলা হয় এছরাফ বা অমিতব্যয়। এটা শরীআতে নিষিদ্ধ। এটাকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালংঘন বা অতিরিক্ত ব্যয় বলেও আখ্যায়িত করা যায়। সম্পদ দানকারী অনুগ্রহশীল আল্লাহর নাফরমান বান্দায় পরিণত করা এবং পাপী করে তোলার জন্যই শয়তান অমিতব্যয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

উল্লেখ্য, 'প্রয়োজন' বলতে বোঝায় এতটুকু পরিমাণ, যা না হলে কোন দ্বীনের কাজ বা দুনিয়ার কাজ করা সম্ভব হয় না বা অত্যন্ত কষ্ট ও পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় কল্পিত প্রয়োজনকে আমরা জরূরত বা প্রয়োজন মনে করে বসি; অথচ সেটা জরূরত বা প্রয়োজন নয় বরং তা হল খাহেশাত বা লোভ। প্রয়োজন ও খাহেশাতের মধ্যে পার্থক্য বোধ রাখতে হবে।

অমিতব্যয়ের চিন্তা থেকে ফিরে আসার জন্য যে চিন্তাগুলো মনে জাগ্রত করতে হবে তা হল:

১. আল্লাহ তাআলা আমাকে সম্পদ দান করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অতএব আমি সম্পদ গোনাহে ব্যয় করে সেই অনুগ্রহকারী আল্লাহর নাফরমান হতে চাই না।

২. অমিতব্যয় গোনাহে কবীরা। আমি নিজের পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা অর্থ গোনাহে ব্যয় করে নিজের শাস্তি ডেকে আনার মত বোকামী আর কী হতে পারে?

গীবত (অপরের দোষ চর্চা)–এর ওয়াছওয়াছা

কাউকে হেয় করে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে তার প্রকৃত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকে গীবত বলে। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে বলে বুহতান, যা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পোশাক-পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন, বংশ ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের দোষ বর্ণনাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। মুখে বলা দ্বারা যেরূপ গীবত হয়, তেমনি অঙ্গভঙ্গী এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও গীবত হয়। গীবত যেমন জীবিত মানুষের হয় তেমনি মৃত মানুষেরও হয়। ছোট-বড়, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দোষ চর্চাই গীবত।

গীবত করা হারাম, যেনার চেয়েও গুরুতর কবীরা গোনাহ। অবশ্য ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করতে গিয়ে বিচারকের নিকট প্রতিপক্ষের যে দোষ বর্ণনা করতে হয়, কিংবা কাউকে অপরের দ্বীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে

সাবধান করার উদ্দেশ্যে বা গুরুজনের নিকট অধীনস্থদেরকে শাসন করানোর জন্য যে দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হয় তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বেচ্ছায় এবং মনোযোগ সহকারে গীবত শ্রবণ করাতেও গীবতের গোনাহ হয়। কারও গীবত করে ফেললে নিজে ইস্তেগফার করা, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য ইস্তেগফার করা এবং সম্ভব হলে ও সংগত মনে করলে তার নিকট ওজরখাহী করা উচিত। এভাবেই গীবতের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দাও, না পারলে সে মজলিস ত্যাগ কর, না পারলে সে কথা থেকে মনোযোগ হটিয়ে মনে মনে অন্য কিছু ভাবতে বা পড়তে থাক।

গীবত শোনার পর যে কয়টা কাজ করা উচিত:

১. শোনা কথা অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।
২. যার দোষ শোনা হল তার দোষ খুঁজতে শুরু না করা।
৩. তার উপর বদগোমানী না করা।
৪. পারলে গীবতকারীকে এই গীবতের অভ্যাস পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া।
৫. প্রয়োজন মনে করলে আসল ব্যক্তির থেকে জেনে নেয়া যে, ব্যাপারটা কতদূর সত্য। অবশ্য এ ক্ষেত্রে গীবতকারীর নাম উল্লেখ করা উচিত নয়।

অন্যান্য গোনাহের ন্যায় গীবতও শয়তানের ওয়াছওয়াছাতেই হয়ে থাকে। তবে গীবত করতে করতে একসময় গীবত অভ্যাসে পরিণত হয়। এই অভ্যাস (বদ অভ্যাস) পরিত্যাগের জন্য করণীয় হল:

১. কারও গীবত করে ফেললে তার প্রশংসা করা।
২. তার জন্য দুআ ও ইস্তেগফার করা।
৩. তাকে এ বিষয়টা জানিয়ে দিয়ে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তবে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে জানাবে না।
৪. কারও সম্পর্কে কিছু বলতে মনে চাইলেও চিন্তা করে নেয়া যে, এটা গীবত হয়ে যাচ্ছে না তো? যদি গীবতের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে তা না বলা।
৫. গীবত হয়ে গেলে নিজে তওবা-ইস্তেগফার করা এবং ভবিষ্যতে আর গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করা।

www.maktabatulabrar.com

৬. গীবত কখনো ক্রোধ থেকে করা হয়, কখনও অহংকারের কারণে করা হয়, কখনও সম্মানের মোহ থেকে করা হয়, আবার কখনও হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য করা হয়ে থাকে। যে কারণে গীবত হয় সে কারণের চিকিৎসা করা দরকার।

চোগলখোরী (কোটনাগিরি)–এর ওয়াছওয়াছা

চোগলখোরী অর্থ কারও এমন কথা বা কাজ সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করে দেয়া, যা সে তার কাছে গোপন করতে ও গোপন রাখতে চায় এবং তার শ্রুতিগোচর হওয়াকে অপছন্দ করে। এটা কোন দোষের কথা বা দোষের কাজ হলে চোগলখোরীর সাথে সাথে গীবতও হয়ে যাবে, তাহলে তা একই সঙ্গে দু'টো পাপের হবে। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে বুহতান বা মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। শয়তান চোগলখোরীতে খুব মজা লাগায়, ফলে চোগলখোরী করতে মজা বোধ হয়। চোগলখোরী মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে ধ্বংস করে দেয় এবং সামাজিক ফ্যাসাদ ঘটায়। এই ফ্যাসাদ ঘটানোর জন্যই শয়তান চোগলখোরির ওয়াছওয়াছা দিয়ে থাকে।

এই ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের উপায় হল:

১. চোগলখোরীর চিন্তা মনে আসলেই এটা কবীরা গোনাহ– এ কথা মনে জাগ্রত করতে হবে।
২. এ কথা চিন্তা করতে হবে যে, যারা চোগলখোরী করে তারা ফ্যাসাদী। আমি ফ্যাসাদী হব কি না।
৩. এ কথা চিন্তা করতে হবে যে, যারা চোগলখোরী তথা কোটনাগিরী করে তারা নীচ প্রকৃতির লোক, আমি নীচ প্রকৃতির লোক আখ্যায়িত হতে চাই না।

তোষামোদ বা চাটুকারিতার ওয়াছওয়াছা

তোষামোদ বা চাটুকারিতা হল নিজের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে অন্যকে খুশী করার জন্য নিজের ধারণা ও বিশ্বাসের বিপরীতে তার প্রশংসা করা। এটা এক ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা। পক্ষান্তরে পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলের সাথে স্বচ্ছ ও খোলা মন নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে মনের কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করাকে বলা হয় বাস্তববাদিতা বা স্বচ্ছতা। তবে

স্বচ্ছতা বা বাস্তববাদিতার অর্থ আদৌ এই নয় যে, সব সত্য কথা সব স্থানে প্রকাশ করে দিতে হবে। বরং অনেক স্থানে বলার চেয়ে চুপ থাকাটাই শ্রেয় হতে পারে। বিনা প্রয়োজনে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হানবে বা অন্যকে বিব্রত করবে– এরূপ কথা বলাকে বাস্তববাদিতা আখ্যা দেয়া যাবে না। কিংবা বাস্তববাদিতার দোহাই দিয়ে নিজের কৃতিত্বের কথা গেয়ে বেড়ানো বা আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়াও সমীচীন নয়। বাস্তববাদিতার অর্থ হল– যতটুকু বলতে হবে তা যেন অবশ্যই বাস্তবানুগ হয় এবং তাতে কোনোরূপ কপটতা না থাকে ও তাতে কারও কষ্ট না হয়।

তোষামোদ বা চাটুকারিতার চিন্তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হল:

১. তোষামোদ বা চাটুকারিতা যে প্রতারণা, কপটতা– এই চেতনা মনে জাগ্রত করতে হবে। মনকে বলতে হবে, তুমি কি প্রতারক হতে চাও? তুমি কি কপট বা মুনাফেক হতে চাও?

২. তোষামোদ বা চাটুকারিতা যে পাপ– এই চিন্তা মনে জাগ্রত করতে হবে।

৩. এই চিন্তা মনে জাগ্রত করতে হবে যে, তোষামোদকারীদেরকে সবাই নীচ প্রকৃতির লোক মনে করে থাকে। আমি নীচ প্রকৃতির আখ্যায়িত হতে চাই না।

রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার ওয়াছওয়াছা

কারও চলা-ফেরা, উঠা-বসা, বলা, গঠন- আকৃতি ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের দোষ এমনভাবে প্রকাশ করা যে, মানুষের হাসির উদ্রেক করে, কিংবা কাউকে লোক সমক্ষে হেয় করা– একে বলা হয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। শরীআতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ এমন রসিকতাও শরীআতে নিষিদ্ধ যাতে কেউ মনে কষ্ট পায়। রসিকতা শরীআতে জায়েয, যদি রসিকতার মধ্যে অবাস্তব কিছু বলা না হয় এবং শ্রোতার মনে আঘাত না লাগে। যে রসিকতা দ্বারা শ্রোতার অন্তরে আঘাত লাগা নিশ্চিত, সেরূপ রসিকতা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তাই রসিকতাকে অভ্যাস বানানো ঠিক নয়, মাঝে মধ্যে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বনী আদমকে সম্মানিত করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ. الاية.﴾

অর্থাৎ, আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৭০) বনী আদম সম্মানিত, তাই বনী আদমের চির শত্রু শয়তান বনী আদমের অপমান দেখে আনন্দিত হয়। এ জন্যই সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বনী আদমকে অপমান করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তখন অন্যের অপমান দেখে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারীর ভাল লাগতে থাকে। শয়তানই এটা ভাল লাগায়।

কাউকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে অপমান করার ওয়াছওয়াছা মনে এলে সেই ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের উপায় হল:

১. এ কথা চিন্তা করা যে, কারও অন্তরে আঘাত লাগবে– এমন রসিকতা গোনাহ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করাও গোনাহ।

২. এ কথা চিন্তা করা যে, কাউকে অপমান করলে তার শাস্তি স্বরূপ আমারও অপমানিত হওয়ার পর্যায় আসতে পারে।

রুক্ষ কথা বলার ওয়াছওয়াছা

কথা নরমে এবং মিষ্টভাবে বলা শরীআতের কাম্য। এমনকি হক কথাও এমন রুক্ষভাবে বলা ঠিক নয় যাতে শ্রোতার মনে আঘাত লাগে। কারণ তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। অনেক সময় রুক্ষ কথা স্বভাবগত কারণে হয়ে থাকে, আবার বদ-অভ্যাসের কারণেও হয়। স্বভাবের তো পরিবর্তন হয় না, তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করলে অভ্যাসগত কারণে হয়ে থাকলে তার পরিবর্তন হবে এবং স্বভাবগত কারণে হয়ে থাকলেও কিছুটা মার্জিত হবে। শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকে হলেও ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

১. কথা বলার সময় এই অভ্যাসটা ক্ষতিকর– এই ভেবে লৌকিকতা করে হলে ও নরমে এবং মিষ্টভাবে বলার চেষ্টা করা।

২. হক কথা কারও কাছে তিক্তবোধ হলেও বলব– এই মনোভাব যখন আসবে, তখন সে হক কথা তখনই বলার একান্ত প্রয়োজন হলে নিজে না বলে অন্যের দ্বারা বলাবে, আর তখনই বলার আবশ্যকতা না থাকলে কিছুদিন সে নছীহত করা ও এরূপ কথা বলা বন্ধ রাখবে। এভাবে কিছু দিনের মধ্যে তবীয়তে ভারসাম্য বা ব্যালেন্স পয়দা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মিথ্যা বলার ওয়াছওয়াছা

যেটা বাস্তব নয় এরূপ কথা হল মিথ্যা। মিথ্যা বলা গোনাহে কবীরা। তাহকীক-তদন্ত ও যাচাই না করেই কোন কথা বর্ণনা করা বা তাহকীক ছাড়াই যেকোনো কথা শুনে তা বলে দেয়াও মিথ্যা বলার মত গোনাহ। তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে কোন কথা জানলে তা তাহকীক ছাড়াই বলা ও বর্ণনা করা যায়। হাদীছে মিথ্যাকে গোনাহের মাতা অর্থাৎ, বহু গোনাহের জন্মদাত্রী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

চারটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা হারাম ও গোনাহে কবীরা। যে চারটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বা অবাস্তব বলার অনুমতি রয়েছে, তা হল−

১. বিবদমান দুইজন বা দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ নিরসন ও মিল মহব্বত সৃষ্টি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে।
২. স্ত্রীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে।
৩. যুদ্ধের সময় যুদ্ধের কৌশল হিসাবে। তবে কেউ কেউ এ ক্ষেত্রেও সরাসরি মিথ্যা না বলে প্রকৃত সত্য উহ্য থাকে এমনভাবে কিছু ইংগিত করে দেয়ার কথা বলেছেন।
৪. নিজের হক উদ্ধার বা বড় ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য।

অন্যান্য গোনাহের ন্যায় মিথ্যাও শয়তানের ওয়াছওয়াছাতেই হয়ে থাকে। তবে মিথ্যা বলতে বলতে একসময় মিথ্যা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়। মিথ্যা বলার এই বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য একটা জিনিসেরই প্রয়োজন, আর তা হল "ইচ্ছা"। প্রত্যেকটা কথা বলার পূর্বে চিন্তা করা যে, এটা মিথ্যা নয়তো? হলে তা বর্জন করা। এভাবেই মিথ্যা বলার শয়তানী ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এবং এভাবেই মিথ্যা বর্জনের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

বেশি কথা বলার ওয়াছওয়াছা

দ্বীনী ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বেশি কথা বলাও একটা বদ অভ্যাস। প্রয়োজনীয় কথা হল: (এক) যা নেকী অর্জনের উদ্দেশ্যে বলা হয়। (দুই) যা গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়। (তিন) যা না বললে পার্থিব ক্ষতি হয়।

www.maktabatulabrar.com

বেশি কথা বলা দ্বারাও মানুষ শত শত গোনাহে লিপ্ত হয়। যেমন: মিথ্যা বলা, গীবত করা, নিজের বড়ায়ী বয়ান করা, কাউকে অভিশাপ দেয়া, কারও সাথে অহেতুক তর্ক জুড়ে দেয়া, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এর বিপরীত কম কথা বলার অভ্যাস থাকলে বহু পাপ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তাই কম কথা বলা ভাল। উল্লেখ্য, শয়তানের ওয়াছওয়াছাতেই বেশি বলা শুরু হয়, তারপর বেশি বলা রোগে পরিণত হয়।

বেশি বলার ওয়াছওয়াছা রোধ করার উপায় এবং বেশি বলা রোগে পরিণত হলে সেই রোগের চিকিৎসা হল−

১. কথা বলার পূর্বে চিন্তা করে নেয়া যে, ছওয়াবের বা দরকারী হলে বলা আর অনুরূপ না হলে বর্জন করা।
২. ভিতর থেকে নফ্ছ বলার জন্য খুব বেশি তাগাদা করলে তাকে এই বলে বোঝানো যে, এখন চুপ থাকতে যে কষ্ট, তার চেয়ে বেশি কষ্ট হবে দোযখের আযাবে। একান্তই না বলে থাকতে না পারলে অল্প বলে চুপ হয়ে যাবে। এভাবে কথা কম বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে।
৩. একান্ত জরুরত না হলে কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না।

গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলার ওয়াছওয়াছা

যেটা প্রকাশ করতে মানুষ শরম বোধ করে, এটাকেই খোলা ভাষায় ব্যক্ত করাকে বলা হয় গালি বা অশ্লীল কথা। আর যদি সেটা অবাস্তব হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। কাউকে গালি দেয়া হারাম, এমনকি কাফের বা জীবজন্তুকেও।

মিথ্যা ও বেশি কথা বলার ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণের যে উপায় গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলার ওয়াছওয়াছা থেকে পরিত্রাণেরও তা-ই উপায়।

পরিশিষ্ট

(ইবলীছ শয়তান ও তার বিশেষ কিছু প্রসঙ্গ)

স্বয়ং নিজের ব্যাপারে ইবলীছের ইবলীছী

ইবলীছ স্বয়ং তার নিজের ব্যাপারেও ইবলীছী করে থাকে। অর্থাৎ, এমন কিছু প্রশ্ন মনে ঢেলে দেয় যার ভিত্তিতে সন্দেহ হয় আদৌ শয়তান বলে কিছু আছে কি না, কিংবা শয়তানকে তৈরি করার অযৌক্তিতা বা শয়তানের নির্দোষ হওয়ার ধারণা জাগে। এরূপ কয়েকটা প্রশ্ন ও তার উত্তর শুনুন।

শয়তানের প্রশ্ন: অনেক সময় শয়তানের ওয়াছওয়াছায় মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগে যে, আসলে ইবলীছ শয়তান বলে কেউ আছে কি? ইবলীছ শয়তান আছে তার প্রমাণই বা কী?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর হল– মনে পাপের চিন্তা উদয় হয়, পাপের কাজ খুব আকর্ষণীয় বোধ হয় এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, ইবলীছ শয়তান আছে। নতুবা পাপ কাজ যেখানে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন, পাপের বহু শাস্তিও বর্ণিত হয়েছে, সেখানে তো পাপের প্রতি সব সময়ই ভয় থাকার কথা, পাপকাজ সবসময় আতংকের জিনিস ও ঘৃণিত জিনিস বোধ হওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও পাপ কাজ এত আকর্ষণীয় বোধ হয় কেন?

www.maktabatulabrar.com

মনের মধ্যে পাপ কাজের প্রতি এই আকর্ষণ কে তৈরি করে? নিশ্চয় এর পেছনে এক চেতনা উদ্রেককারী আছে। আর সে হল শয়তান। যেমন ভাল কাজের প্রতি চেতনা উদ্রেককারী হলেন ফেরেশতা। বস্তুত প্রত্যেকের সাথে ভাল চেতনা উদ্রেককারী ফেরেশতাও রয়েছে, খারাপ চেতনা উদ্রেককারী জিন শয়তানও রয়েছে। এক হাদীছে তাই বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.» (رواه مسلم حديث رقم ٢٨١٤، وأحمد حديث رقم ٣٦٤٨)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে নিযুক্ত রাখা হয়েছে তার সহযোগী জিন (তথা শয়তান) ও সহযোগী ফেরেশতা। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

ইবলীছ শয়তান যে পাপ কাজের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে মানুষকে পাপের প্রতি ধাবিত করে থাকে, বিভ্রান্ত করে থাকে– এ সম্বন্ধে কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে এরূপ তিনটি আয়াত উল্লেখ করা হল।

﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, তারা যা করে শয়তান তাদের সামনে তাকে সুশোভিত (আকর্ষণীয়) করে দেখিয়েছে। (সূরা আনআম: ৪৩)

﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে তাদের সামনে সুশোভিত করে দেখিয়ে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে হটিয়ে দিয়েছে, ফলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না। (সূরা নাম্ল: ২৪)

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلٰى لَهُمْ.﴾

অর্থাৎ, যাদের সামনে হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পরও তারা পেছনের দিকে ফিরে যায় শয়তানই তাদের কর্মকে তাদের সামনে শুশোভিত করে দেখায় এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখে। (সূরা মুহাম্মাদ: ২৫)

ইবলীছ শয়তানের যে অস্তিত্ব আছে তা তো দিবালোকের ন্যায় সত্য। নবী সাহাবী ও মনীষীদের অনেকের সাথে ইবলীছের সাক্ষাতও ঘটেছে। এমন কিছু ঘটনা শুনুন।

মানুষের সঙ্গে ইবলীছের সাক্ষাতের কয়েকটা ঘটনা

নবী সাহাবী ও মনীষীদের সঙ্গে ইবলীছ শয়তানের সাক্ষাতের ঘটনা রয়েছে প্রচুর। নিম্নে কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করা হল।

ঘটনা নং ১:

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে একবার ইবলীছ শয়তান আত্মপ্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনাটি তাবারানী কাবীরে (রেওয়ায়েত নং ১৯৩৯) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায আদায় করছিলেন। তিনি তাঁর সামনে থেকে কিছু একটা জিনিসকে তাড়া করছিলেন। যখন তিনি নামায থেকে ফারেগ হলেন, আমরা তাকে বিষয়টা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, ও ছিল শয়তান। আমাকে নামায থেকে বিচ্যুত করার জন্য আমার পায়ের উপর সে আগুনের অঙ্গার ঢেলে দিয়েছিল। তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

«قال وقد انتهرته ولو أخذته لنيط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة.» (الطبراني الكبير)

আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। ধরতে পারলে মসজিদের এক পিলারের সাথে ওকে বেঁধে রাখা হত, যাতে মদীনার বাচ্চারা ওকে নিয়ে ঘুরাতে পারে।

ঘটনা নং ২:

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সামনে শয়তানের আত্মপ্রকাশ এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক শয়তানকে কংকর নিক্ষেপের ঘটনা সকলেরই জানা। তাবারানী কাবীর ও মুসনাদে আহমদ কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা হাইছামী "মাজমাউয যাওয়াইদ" কিতাবে উক্ত রেওয়ায়েতের সব বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। উক্ত রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী যখন

www.maktabatulabrar.com

হযরত ইবরাহীম (আ.)কে হজ্জের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্থান সরেজমিনে চেনানোর জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)কে নিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা হন। হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন তাকে মিনায় জামারাত (হজ্জের সময় কংকর নিক্ষেপের স্থানসমূহ)-এর মধ্যে জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা)-এর কাছে নিয়ে যান, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সামনে শয়তান দৃশ্যমান হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) তখন শয়তানকে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। ফলে শয়তান অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর জামরাতুল উস্‌তা (মধ্যম জামরা)-এর কাছে আবার শয়তান দৃশ্যমান হলে তিনি তাকে আবারও ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর জামরাতুস সুগরা (ছোট জামরা)-এর কাছে আবার দৃশ্যমান হলে তিনি আবারও তাকে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর থেকে হজ্জের সময় প্রতীকীভাবে হাজীগণ এ স্থানসমূহে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে কংকর নিক্ষেপ করে থাকেন।

ঘটনা নং ৩:

হযরত নূহ (আ.)-এর সঙ্গে ইবলীছের সাক্ষাতের ঘটনা প্রসিদ্ধ। আল্লামা বদরুদ্দীন শিবলী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আকামুল মারজান ফী আজাইবি ওয়া গরাইবিল জান"য়ে সনদ সহকারে ঘটনাটা উল্লেখ করেছেন। হযরত নূহ (আ.)-এর সময় তুফানে যখন কাফেররা মারা গেল। নৌকা থেমে গেল। তখন হযরত নূহ (আ.) দেখলেন নৌকার গলুইয়ে শয়তান বসে আছে। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, তোমারই কারণে পৃথিবীর এত লোক ডুবে মারা গেল। তুমিই তাদেরকে ধ্বংস করেছ। তখন শয়তান তাকে জিজ্ঞাসা করল তাহলে আমি কী করতে পারি? হযরত নূহ (আ.) তাকে বললেন, তুমি তওবা করবে। সে বলল, তাহলে আপনার প্রতিপালকের কাছে জিজ্ঞাসা করুন আমার জন্য তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি না। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, তার জন্য তওবা হল সে আদমের কবরে সাজদা করবে। হযরত নূহ (আ.) তাকে জানালেন, তোমার জন্য তওবার ব্যবস্থা হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল কী সে ব্যবস্থা? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তুমি আদম (আ.)-এর কবরে গিয়ে সাজদা করবে। সে বলে উঠল,

জীবিত অবস্থায় তাকে সাজদা করিনি এখন মৃত অবস্থায় তাকে সাজদা করব? (সম্ভব নয়।)

ঘটনা নং ৪:

হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে ইবলীছের সাক্ষাতের ঘটনাও প্রসিদ্ধ। দেখুন সামনে "ইবলীছ কি ভাল হতে পারে না?" শিরোনামের অধীনে হযরত মূছা (আ.)-এর সঙ্গে ইবলীছের সাক্ষাতের সে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘটনা নং ৫:

বোখারী শরীফের ২৩১১ নং হাদীছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে শয়তানের সাক্ষাতের এক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি দীর্ঘ, আমি শুধু তার তর্জমা উল্লেখ করছি: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রমযানে উসূল হওয়া যাকাতের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। আমি (এক রাতে) উক্ত সম্পদ পাহারা দিচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে এক লোক এসে সেখান থেকে খাদ্য-খাবার কোষ ভরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, আল্লাহর কছম! অবশ্যই আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমি একজন ঠেকা লোক, আমার পরিবারও অনেক বড়, আমার প্রচণ্ড প্রয়োজন (তাই আমি এগুলো নিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দিন।)। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরে সকাল হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ হুরায়রা! গতরাতে তোমার বন্দীর কী খবর? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকটা প্রচণ্ড ঠেকা এবং পরিবারের কথা বলায় তার প্রতি আমার মায়া জাগল, তাই তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলাতে আমার নিশ্চিত জানা রইল যে, সে আবার ফিরে আসবে। তাই আমি তার আসার অপেক্ষায় তাক পেতে রইলাম। তারপর ঠিকই সে আসল। খাদ্য-খাবার কোষ ভরে নিতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, অবশ্যই আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ঠেকায়

www.maktabatulabrar.com

পড়েছি, আমার পরিবারও বড়, আর কখনও আসব না। (হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন,) তার প্রতি আমার মায়া জাগল, ফলে তাকে ছেড়ে দিলাম। পরে সকাল করলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ হুরায়রা! তোমার বন্দীর কী খবর? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকটা প্রচণ্ড ঠেকা এবং পরিবারের কথা বলায় তার প্রতি আমার মায়া জাগল, তাই তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, জেনে রাখ সে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে। আমি তৃতীয়বারের মত তার অপেক্ষায় তাক পেতে রইলাম। সে ঠিকই আবার আসল এবং খাদ্য-খাবার কোষ ভরে নিতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, অবশ্যই আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাব। এটা তিনবারের শেষ বার। প্রতিবারই তুমি বলছ আর আসবে না, কিন্তু ঠিকই আসছ। সে বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন কয়েকটা কথা শিক্ষা দিব যা পাঠ করলে তুমি লাভবান হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কথাগুলো কী? সে বলল, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরছী اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, তাহলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন তোমাকে হেফাজত করবে, আর শয়তান তোমার কাছে আসবে না।" এ কথা বলায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরে সকাল করলাম। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দীর কী খবর? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! তার ধারণা সে আমাকে কয়েকটা কথা শিক্ষা দিচ্ছে যা দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন সে কথাগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলেছে, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরছী اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ-এর শুরু থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, তাহলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন তোমাকে হেফাজত করবে, আর শয়তান তোমার কাছে আসবে না।" -সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন ভাল জিনিসের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী- তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জেনে রাখ সে তো (এটা) সত্য বলেছে যদিও সে

চরম মিথ্যুক। আবূ হুরায়রা! তুমি জান কি এই তিনরাত যাবত কার সঙ্গে তুমি কথা বলছ? তিনি জওয়াব দিলেন, না। তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে হচ্ছে শয়তান।

ঘটনা নং ৬:

দেখুন প্রথম অধ্যায়ে "শয়তান মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কীভাবে কেটে পড়ে" শিরোনামের অধীনে মানুষের সঙ্গে ইবলীছের সাক্ষাতের একটা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

শয়তানের প্রশ্ন: অনেক সময় ইবলীছ শয়তান মনের মধ্যে এই চিন্তা জাগিয়ে দেয় যে, আসলে যেসব জিনিসকে আমরা ইবলীছ শয়তানের ওয়াছওয়াছা বলি সেগুলো কি আসলেই ইবলীছের ওয়াছওয়াছা না মনের চিন্তা? যেমন আমরা বলে থাকি, আল্লাহ বলে আসলেই কেউ আছেন কি? জান্নাত জাহান্নাম আসলেই আছে কি- এসব চিন্তা শয়তানেরই ওয়াছওয়াছা। আসলেই কি এগুলো শয়তানের ওয়াছওয়াছা না সমাজের অনেক মানুষ এরকম বলে থাকে, মনের মধ্যে তা রয়েছে, আর মাঝে মধ্যেই মনের মধ্যে সেই কথা জেগে ওঠে আর আমরা মনে করি এটা শয়তানের ওয়াছওয়াছা। বাস্তবে তো মনে হয় এটা শয়তানের ওয়াছওয়াছা নয় বরং মনের মধ্যে থাকা চিন্তার জাগরণ।

উত্তর: এগুলো সমাজের অনেকের কথাও বটে। কিন্তু প্রথমে সমাজের সেইসব মানুষের মনে এসব কথা কে জাগিয়ে দিয়েছে? সে তো শয়তানই। তাহলে এসব ওয়াছওয়াছার মূলে যখন শয়তান তখন এগুলোর মূল হিসেবে শয়তানের দিকেই তো এগুলোকে সম্পৃক্ত করা হবে। তদুপরি শয়তানই মনের মধ্যে এই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে- এ হিসাবেও শয়তানের দিকে এটা সম্পৃক্ত হবে।

শয়তানের প্রশ্ন: অনেক সময় শয়তানের ওয়াছওয়াছায় মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগে যে, শয়তানকে বানানো হল কেন? তাকে বানানো না হলে পাপের ওয়াছওয়াছা দেয়ার কেউ থাকত না, তাহলে সকলেই নেককার পরহেযগার হতে পারত! শয়তানকে বানানোর ফলেই তো সব ঝামেলাটা লেগেছে।

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর হল- যদি খারাপ চেতনা উদ্রেক করে দেয়ার মত কেউ না থাকত আর খারাপ চেতনা তথা পাপের চেতনা সৃষ্টিই না হত,

www.maktabatulabrar.com

তাহলে তো আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানোরই প্রয়োজন ছিল না। পাপের চেতনা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আমরা পাপ থেকে বিরত থাকব, এভাবে আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব- এরূপ পরীক্ষার জন্যই তো আমাদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণ। নতুবা আমাদেরকে দুনিয়ায় প্রেরণের প্রয়োজন ছিল না। পাপের চেতনামুক্ত ইবাদতকারী তথা ফেরেশতাদেরকে তো আমাদের আগেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা তো আল্লাহর ইবাদত করেই যাচ্ছিল এবং এখনও করে যাচ্ছে। আমাদের সৃষ্টি করার প্রয়োজনই বা কি ছিল? এই পরীক্ষার জন্যই তো আমাদের সৃষ্টি করা।

ইবলীছের কী দোষ আল্লাহই তো তাকে এমন বানিয়েছেন

অনেক সময় শয়তানের ওয়াছওয়াছায় মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগে যে, শয়তানের কী দোষ? আল্লাহই তো পরিকল্পিতভাবে তাকে দাঁড় করেছেন। মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগলে মনকে বলতে হবে, শয়তানের কোন দোষ না থাকলে শয়তানই তা নিয়ে আল্লাহর সাথে বোঝাপড়া করুকগে, শয়তানের বিষয় নিয়ে চিন্তা করে আমার ঘুম নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। শয়তান আমার কোন খাতেরী লোক নয় যে, তাকে নিয়ে আমার ভাবতে হবে! তবুও সংক্ষেপে একটু উত্তর দেই। শয়তানের যদি কোনই দোষ না থাকবে তাহলে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার মত এরকম একটা বাজে কাজের বোঝা তার মাথায় পড়ল কেন? একটা ঘটনা বলি। পূরণো ঢাকার বড়কাটারা মাদ্রাসার ঘটনা। একবার কিছু মাস্তান ধরনের লোকজন বড়কাটারা মাদ্রাসায় ঢুকে ছাত্রদের সঙ্গে গণ্ডগোল বাঁধাল। মাস্তানরা মাদ্রাসার আঙিনায় দাঁড়িয়েই চিৎকার হৈ হল্লা করতে থাকল। মাদ্রাসা ভবনের ভিতরে ঢুকতে তারা সাহস পেল না। কারণ যারা মাদ্রাসা ভবনের ভেতরে ঢুকেছে তারা জানে প্রাচীন যুগের দূর্গের স্টাইলে নির্মিত এই ভবনের ভেতরে ঢুকলে নিতান্ত পরিচিত জন ছাড়া এত পাঁচগোছের সিড়ি বারান্দা ইত্যাদি চিনে নিচে ফিরে আসা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় কিংবা কোত্থেকে কে মার দিবে তা ঠাহর করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই মাস্তানরা বাইরেই থাকল। আর মাস্তানদের বিপরীতে ছাত্ররা নির্বিঘ্নে মাদ্রাসার উপর থেকে মাস্তানদের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকল। আল্লাহরই ইচ্ছা একটা বড় সাইজের ইটের টুকরো গিয়ে পড়ল প্রধান মাস্তানের মাথায়। অমনি পূরণো ঢাকাইয়াদের স্টাইলে উর্দূ বাংলা মিলিয়ে মাস্তানটা

চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, এত্ত বড় ছাহছ কার্, মেরে ছার পর ইটা? ইটা কিছ্ নে গিরায়া? কাহাঁ ছে গিরা? তখন আর এক ঢাকাইয়া বলে উঠল, জিছ নে ভি গিরায়া, জাহাঁ ছে ভি গিরা, তেরে ছার পর কেয়ূঁ গিরা, ইছ লিয়ে কে ছালা তু পাপী হায়!

ইবলীছ কি ভাল হতে পারে না?

অনেকে মনে করে ইবলীছ যদি ভাল হয়ে যেত তাহলে তো দুনিয়ার কেউ আর খারাপ পথে যেত না। সকলেই জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজেই অবলম্বন করতে পারত। কিন্তু ইবলীছের ভাল হতে হলে তাকে তওবা করতে হবে। সে তো তওবা করতে রাজি নয়। ইবলীছের তওবার উপায় কি তা বোঝার জন্য ইবলীছের পাপটা কি ছিল তা বুঝা দরকার। ইবলীছের পাপ ছিল অহংকার। তার অহংকারই ইবলীছকে ইবলীছে পরিণত করেছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর আদম ও বনী আদমেরর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার জন্য ফেরেশতা ও আযাযীল (যে বর্তমানে শয়তান) কে হুকুম দিয়েছিলেন আদমকে সাজদা করার জন্য। ফেরেশতারা তখন সাজদা করেছিল কিন্তু ইবলীছ সাজদা করেনি। অহংকার তাকে পেয়ে বসেছিল। সে বলেছিল, আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী। আগুনের স্বভাব উপরের দিকে থাকা। তাই আমি নিচের দিকে নত হয়ে আদমকে সাজদা করতে পারি না। এভাবে সে অহংকারবশত প্রত্যক্ষ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করায় ইবলীস শয়তানে পরিণত হল। অতএব এখন ইবলীছের ভাল হওয়ার উপায় হল অহংকার বর্জন করে তওবা করা। আর প্রত্যেক পাপের তওবার নিয়ম হল যে আমল বর্জন করে সে পাপী হয়েছে সেই আমল শুরু করা। তাহলে ইবলীছকে তওবা করতে হলে তাকে এখন আদম (আ.)-এর উদ্দেশে সাজদা করতে হবে। একটা ঘটনা শুনুন। বদরুদ্দীন শিবলী রচিত "আকামুল মারজান" ও ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী রচিত " তামবীহুল গাফিলীন' কিতাবে ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটা এরূপ- একবার ইবলীছের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর দেখা। হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তওবা কর। তুমি তওবা করে ভাল হয়ে গেলে দুনিয়ার সবাই ভাল হতে পারবে। সে বলল, আল্লাহ আমার তওবা কবূল করবেন না। হযরত মূসা (আ.)

www.maktabatulabrar.com

আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন ইবলীছ তওবা করলে তার তওবা যেন কবূল করা হয়। আল্লাহ তাআলা বললেন, ইবলীছ তওবা করবে না। হযরত মূসা (আ.) ইবলীছকে বললেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন, তুমি তওবা করবে না। ইবলীছ আবার বলল, আল্লাহ আমার তওবা কবূল করবেন না। তখন মূসা (আ.) আবার আল্লাহর কাছে আবেদন করলে আল্লাহ তাআলা বললেন, তার অপরাধ ছিল সে আদমকে সাজদা করেনি। অতএব তার তওবার পদ্ধতি হল এখন আদমকে সাজদা করা। কিন্তু আদম যেহেতু জীবিত নেই, তাই আদমের কবরের কাছে গিয়ে সাজদা করুক, তাহলেই তাকে ক্ষমা করা হবে। হযরত মূসা (আ.) মনে মনে খুব খুশি, এবার ইবলীছের ভাল হওয়ার পথ বের হয়ে এসেছে। তিনি ইবলীছকে জানালেন, আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি তোমার তওবা কবূল করবেন। তোমাকে তেমন কিছুই করতে হবে না, শুধু আদম (আ.)-এর কবরের কাছে গিয়ে একটা সাজদা দিলেই হবে। তখন ইবলীছ বলে উঠল, জীবিত আদমের কাছে মাথা নত করিনি, এখন মৃত আদমের কাছে মাথা নত করব? (অসম্ভব!)

বদরুদ্দীন শিবলী রচিত "আকামুল মারজান" গ্রন্থে হযরত নূহ (আ.)-এর সঙ্গেও ইবলীছের সাক্ষাৎ ও এরূপ কথোপকথোনের বর্ণনা রয়েছে।

মানুষের চাটুকারিতা করতে ইবলীছের অহংকারে লাগে না?

আশ্চর্য লাগে যে অহংকার ইবলীছের জন্য হযরত আদম (আ.) কে সাজদা করতে বাধা হয় দাঁড়াল, তার সেই অহংকার যায় কোথায় যখন সে একটা পাপের জন্য বারবার নির্লজ্জের মত সেই আদমের সন্তানদের কারও কাছে ধর্ণা দেয়, তার চাটুকারিতা করে, তার কাছে একই বিষয় নিয়ে বারবার ঘ্যানর ঘ্যানর করে। ফজরের নামাযে যেন যেতে না পারে তার জন্য তার হাত পা পর্যন্ত টিপে দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। এতে কি তার অহংকারে লাগে না? যে বনী আদমের শ্রেষ্ঠত্ব সে স্বীকার করে নিতে পারেনি বলে সাজদা থেকে বিরত রয়েছে, যার ফলে সে অভিশপ্ত হয়েছে, সেই বনী আদমের পা টিপে দিতে তার শরম লাগে না? স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সেই বনী আদমের চাটুকারিতা করতে, তার কাছে বারবার ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লজ্জা লাগে না? আসলে ইবলীছের হায়া-শরম নেই। যদি তার

হায়া-শরমই থাকত, তাহলে কোন মানুষ আউযু বিল্লাহ ... পড়ার পর পাদতে পাদতে তার কাছ থেকে ভেগে গিয়েও আবার তার কাছে আসতে পারত? সর্বোপরি কথা হল যদি তার হায়া-শরমই থাকত, তাহলে যে মুহসিনে আজীম মহান আল্লাহ দয়া করে, অনুগ্রহ করে তাকে ফেরেশতাদের মধ্যে থাকার মত সৌভাগ্য দান করলেন, সেই আল্লাহর মুখের সামনে তার কথাকে কীভাবে সে অস্বীকার করতে পারত?

ইবলীছের সিংহাসন সাগরে কেন?

হাদীছে এসেছে ইবলীসের সিংহাসন সাগরে। সেখান থেকে সে তার বাহিনী বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে থাকে। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُوْنَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً». (أخرجه مسلم برقم ٧٢٨٣)

অর্থাৎ, ইবলীছের সিংহাসন সাগরে। সেখান থেকে সে তার বাহিনী প্রেরণ করে থাকে, যারা মানুষকে ফিতনায় ফেলে থাকে। তাদের মধ্যে যে মানুষকে বেশি ফিতনায় লিপ্ত করতে পারে সে ইবলীছের কাছে বেশি সম্মানীত গণ্য হয়ে থাকে। (মুসলিম)

এখন কারও মনে কৌতুহল জাগতে পারে যে, ইবলীছের সিংহাসন সমুদ্রে কেন? সমুদ্রভাগ স্থলভাগের তুলনায় নিচ এলাকা। শয়তান নিচ অঞ্চলে তার সিংহাসন বানাতে গেল কেন? শয়তানের তো অহংকার হওয়ার কথা যে, বনী আদম থেকে আমি নিচে থাকব কেন? সে নিচ হতে পারবে না বলেই তো শেষতক হযরত আদম (আ.)কে সাজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং কাফের মালউনে পরিণত হয়েছে। তাহলে সে তার সিংহাসন সাগরে বানাল কেন? কোন উঁচু পর্বতের উপর তার সিংহাসন বানালে বরং সে কৃত্রিমভাবে এই মানসিক তৃপ্তি বোধ করতে পারত যে, সমস্ত বনী আদম আমার পায়ের তলে, আমি সমস্ত বনী আদমের চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত! হাম হ্যেয় সব ছে বড়া মিয়াঁ ! হেঁ হেঁ হেঁ। কিংবা উঁচু পাহাড়-পর্বতে সিংহাসন না গেড়ে কোন লোকালয় বা জনবসতির ধারে কাছে সিংহাসন বানালেও পারত। তাতে তার সময় সেভ হত। কাছে ধারে থেকে তার মিশনের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করতেও সুবিধে

www.maktabatulabrar.com

হত। এমন না করে সাগরে কেন তার সিংহাসন স্থাপন করতে গেল? ওকি বুশদের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের ভয়ে ওখানে আসর বানিয়েছে যে, বুশদের যদি কোন দিন সঠিক হুশ ফিরে আসে আর তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, প্রকৃত সন্ত্রাশী তো শয়তান ও তার দোসররা। সেমতে চালাও ওদের বিরুদ্ধে অভিযান! না কি মোল্লারা জানতে পারলে আযান দিয়ে ওদের আসর ভেঙ্গে দিবে এই ভয়ে? আযান হলে শয়তান ভেগে যায় তা সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। সেমতে শয়তান কোন্ স্থানে সিংহাসন গেড়ে সেখান থেকে সারা দুনিয়ার অভিযান প্রেরণ করছে– সে সন্ধান যদি তালিবে ইলমরা জানতে পারত, তাহলে তারা আযান দিয়ে সেখান থেকে শয়তানদেরকে ছত্রভঙ্গ না করে ক্ষান্ত হত কি? না কি শয়তান লোকালয় বা জনবসতিতে সিংহাসন স্থাপন করতে সাহস পায়নি এই ভয়ে যে, পাছে না আবার বনী ইসরাঈল বা বাংগালী ছেলেপুলেদের সাথে দেখা হয়ে গেলে তার দশা খারাপ হয়ে পড়ে। যেমন হয়েছিল সেই গাধাটার যা কতগুলো দুষ্ট ছেলের কবলে পড়েছিল। গাধাটার ঘটনা এরকম– কতগুলো ছেলে দুই দলে ভাগ হয়ে একটা দড়ি দু'দিক থেকে টানছিল। এটা ছিল আগেকার দিনে দড়িটানা খেলা। এক পর্যায়ে দড়িটা গেল ছিড়ে। ছেলেদের মন বিষণ্ন হয়ে পড়ল। তাদের খেলাটাই পণ্ড হয়ে গেল! তখন ছেলেগুলোর বিষণ্ন মন দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাধার ভারি মায়া জাগল। সে বলল, তোমরা মন খারাপ কর না, দড়ি ছিড়ে গেছে তাতে কী হয়েছে? আমার লম্বা কান দুটো ধরে দু'দিক থেকে টেনে তোমাদের খেলা চালিয়ে যেতে পার। ব্যস আর কী, অমনি শুরু হয়ে গেল দু' দিক থেকে কান টানার খেলা। কিন্তু শক্ত দড়ি যেখানে ফেল মেরেছে সেখানে গাধার কান আর কতদূর কুলোয়। কান দু'টো গোড়া থেকে উপড়ে গেল। এবার ছেলেরা কী করবে? গাধার কান্নায় কেউ কান দিল না। এবার শুরু হল একদিক থেকে লেজ আর অন্য দিক থেকে মাথা ধরে টানাটানি। লেজও গেল উপড়ে। অবশেষে ছেলেরা আর কোন উপায়ান্তর না দেখে গাধাটার পাছায় বাঁশ ঢুকিয়ে ঐ গাধাটাকে ঘাড়ে তুলে চালিয়ে গেল তাদের দুষ্টামি।

❰ সমাপ্ত ❱